প্রচার।

মাসিক পত্র।

দ্বিতীয় বৎসর।

১২৯২-৯৩।

কলিকাতা।

২ নং ভবানীচরণ দত্তের গলি হইতে

শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রকাশিত ও

৭৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট পিপেল্‌স প্রেসে

শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী।

বিষয় — পৃষ্ঠা

সংসার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গরিবের ঘরের দুটী মেয়ে।

বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যে সুন্দর পথ গিয়াছে, সেই পথের অনতিদূরে একটী বড় পুষ্করিণী আছে। অনুমান শত বৎসর পূর্ব্বে কোন ধনবান্ জমীদার প্রজাদিগের হিতার্থ এবং আপনার কীর্ত্তি স্থাপনের জন্য সেই সুন্দর পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন; সেকালে অনেক ধনবান লোকই এরূপ হিতকর কার্য্য করিতেন, তাহার নিদর্শন অদ্যাবধি বঙ্গদেশের সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্করিণীর চারিদিকে উচ্চ পাড় ঘন তাল গাছে বেষ্টিত, এত ঘন যে দিবাভাগেও পুষ্করিণীতে ছায়া পড়ে, সন্ধ্যার সময় পুষ্করিণী প্রায় অন্ধকারপূর্ণ হয়। নিকটে কোনও বড় নগর নাই, কেবল একটী সামান্য পল্লি আছে, তাহাতে কয়েক ঘর কায়স্থ, দুই চারি ঘর ব্রাহ্মণ ও দুই চারি ঘর কুমার, এক ঘর কামার ও কতকগুলি সদ্গোপ ও কৈবর্ত্ত বাস করে। একখানি মুদির দোকান আছে তাহাতে গ্রামের লোকের সামান্য খাদ্য দ্রব্যাদি যোগায়, এবং তথা হইতে এক ক্রোশ দূরে সপ্তাহে দুইবার করিয়া একটী হাট বসে, বস্ত্রাদি আবশ্যক হইলে গ্রামের লোকে সেই হাটে যায়। পুষ্করিণীর নাম "তালপুখুর", এবং সেই নাম হইতে গ্রামটীকেও লোকে তালপুখুর গ্রাম বলে।

এক দিন সন্ধ্যার সময় গ্রামের একজন নারী কলস লইয়া সেই পুখুরে গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুইটী কন্যাও গিয়াছিল।

রমণীর বয়স ৩৫ বৎসর হইবে, বড় কন্যাটীর বয়স ৯ বৎসর, ছোটটীর বয়স ৪ বৎসর হইবে।

সন্ধ্যার সময় সে পুষ্কর বিস্তর অন্ধকার হইয়াছে এবং সেই অন্ধকারে সেই ভীম বৃক্ষশ্রেণী আকাশে কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। অল্প অল্প বাতাস বহিতেছে ও সেই অন্ধকারময় তাল বৃক্ষগুলি সাঁই সাঁই করিয়া শব্দ করিতেছে, নির্জ্জনে সে শব্দ শুনিলে সহসা মন স্তম্ভিত হয়। পুখুরে আর কেহ নাই, রমণী ঘাটে নামিয়া কলসী নামাইলেন, মেয়ে দুটীও মার নিকট দাঁড়াইল।

কলস নামাইয়া নারী একবার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলেন, দিনের পরিশ্রমের পর একবার বিশ্রামসূচক দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করিলেন। আকাশের অল্প আলোক সেই শান্ত নয়নদ্বয়ে পতিত হইল, সন্ধ্যার বায়ু সেই পরিশ্রমে ক্লান্ত ঈষৎ স্বেদযুক্ত ললাট শীতল করিল এবং সেই চিন্তাঙ্কিত মুখ হইতে দুই একটী চুলের গুচ্ছ উড়াইয়া দিল। নারী দিনের পরিশ্রমের পর একবার আকাশের দিকে দেখিয়া, সেই শীতল বায়ু স্পৃষ্ট হইয়া একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পরে বলিলেন,

"মা বিন্দু, একবার সুধাকে ধর ত, আমি একটা ডুব দিয়ে নি।

বিন্দুবাসিনী। "মা আমি ডুব দেব।"

মাতা। 'না মা এত সন্ধ্যার সময় কি ডুব দেয়, অসুখ করিবে যে।"

বিন্দু। "না মা অসুখ করিবে না, আমি ডুব দেব।"

মাতা। "ছি মা তুমি সেয়ানা হয়েছ, অমন করে কি বায়না করে। তুমি জলে নামিলে আবার সুধা ডুব দিতে চাহিবে, ওর আবার অসুখ করিবে। সুধাকে একবার ধর, আমি এই এলুম বলে।"

মাতার কথা অনুসারে নবম বৎসরের বালিকা ছোট বোনটীকে কোলে করিয়া ঘাটে বসিল। সন্ধ্যাকালের অন্ধকার সেই ভগ্নী দুটীকে বেষ্টন করিল, সন্ধ্যার সমীরণ সেই অনাথা দরিদ্র বালিকা দুটীকে সযত্নে সেবা করিতে লাগিল। জগতে তাহাদের যত্ন করিবার বড় কেহ ছিল না, মুখ তুলিয়া তাহাদের পানে চায়, একটু মিষ্ট কথা বলিয়া একটু সান্ত্বনা করে, এরূপ লোক বড় কেহ ছিল না।

বিন্দুবাসিনীর মাতা কায়েতের মেয়ে, হরিদাস মল্লিক নামক একটী সামান্য অবস্থার লোকের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার ২০। ২৫ বিঘা জমী

ছিল কিন্তু কায়স্থ বলিয়া আপনি চাষ করিতে পারিতেন না, লোক দিয়া চাষ করাইতেন, লোকের মাহিনা দিয়া জমিদারের খাজনা দিয়া বড় কিছু থাকিত না, যাহা থাকিত তাহাতে ঘরের খরচের ভাতটা হইত মাত্র। অনেক কষ্ট করিয়া অন্য কিছু আয় করিয়া কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। তারিণীচরণ মল্লিক নামক তাঁহার একটী খুড়তুত ভাই বর্দ্ধমানে চাকরি করিত কিন্তু এক্ষণে খুড়তুত ভাইয়ের নিকট সহায়তা প্রত্যাশা করা বৃথা, আপনার ভাইয়ের নিকট কদাচ সহায়তা পাওয়া যায়। তবে বিপদ আপদের সময় তাঁহাকে অনেক ধরিয়া পড়িলে ৫।১০ টাকা কর্জ্জ পাইতেন, শোধ করিতে পারিলে তিনি ভাই বলিয়া সুদটা ছাড়িয়া দিতেন। বিবাহের প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পর তাঁহার একটী কন্যা হয়, এতদিনের পরের সন্তান বলিয়া বিন্দুবাসিনী পিতা মাতার বড আদরের মেয়ে হইল। কিন্তু আদরে পেট ভরে না, বিন্দু গরিবের ঘরের মেয়ে, আদর ও পিতামাতার ভালবাসা ভিন্ন আর কিছু পাইল না। বিন্দুর বড় জেঠা তারিণী বাবু যখন পূজার সময় বাড়ীতে আসিতেন তখন মেয়েদের জন্য কেমন ঢাকাই কাপড়, কেমন হাতের নূতন রকমের সোনার চুড়ী, কেমন কানের কানবালা আনিতেন, বিন্দুর বাপ মা অনেক কষ্টে মেয়ের জন্য দুগাছি অতি সরু সোনার বালা ও দুই পায়ে দুইগাছি রূপার মল গড়াইয়া দিলেন। বিন্দুর বাপের সেজন্য কিছু ধার হইল, অনেক কষ্টে সে ধার শোধ করিতে পারিলেন না একটী গরু বিক্রয় করিয়া তাহা পরিশোধ করিলেন। বিন্দু জেঠাইমার মেয়েদের সহিত সর্ব্বদা খেলা করিতে যাইত। বিন্দু ভাল মানুষ কখনও কাহাকে রাগ করিয়া কথা কহিত না, সুতরাং তাহারাও বিন্দুকে ভাল বাসিত, কখন কখন সন্দেশ খাইতে খাইতে একটু ভাঙ্গিয়া দিত, কখন মেলায় অনেক পুতুল কিনিলে একটী সোলার পুতুল দিত। বিন্দুর আনন্দের সীমা থাকিত না, বাড়ীতে আসিয়া কত হর্ষের সহিত মাকে দেখাইত, বিন্দুর মা বিন্দুকে চুম্বন করিতেন আর নিজের চক্ষের এক বিন্দু জল মোচন করিতেন।

বিন্দুর জন্মের পাঁচ বৎসর পর তাহার একটী ভগ্নী হইল। বড় মেয়েটী একটু কাল হইয়াছিল, ছোট মেয়ের রং পরীর মত, চক্ষু দুটী কাল২ ভ্রমরের ন্যায় সুন্দর ও চঞ্চল, মাথায় সুন্দর কাল চুল, লাল ঠোঁট দুটীতে সদাই

সুধার হাসি। গরিবেরএই অমূল্য ধনকে গরিব বাপ মা চুম্বন করিয়া তাহার সুধাহাসিনী নাম দিলেন। কিন্তু ভালবাসা ভিন্ন সুধার আর কিছু জুটিল না, বরং দুইটি মেয়ে হওয়াতে বাপ মার আরও কষ্ট বাড়িল। ছোট মেয়ের জন্য একটু দুধ চাই, এমন সুন্দর মেয়ের হাত দুখানি খালি রাখা যায় না, দুই এক খানা গয়না হইলে ভাল হয়, পাড়াপড়শীর বাড়ী লইয়া যাইবার সময় একখানি ঢাকাই কাপড় পরাইয়া লইয়া গেলে ভাল হয়। কিন্তু এ সব ইচ্ছা পুরণ হয় কোথা থেকে? বাপ মার মনে কত সাধ হয় কিন্তু উপায় কৈ? গরিব দুঃখীর আবার কিসের সাধ?

এইরূপে বিন্দুর পিতা অনেক কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, বিন্দুর মাতা কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য না করিয়া স্বামীর সেবা ও কন্যা দুটীকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া বাসন ধুইতেন, ঘর ঝাঁট দিতেন, উঠান পরিষ্কার করিতেন, কন্যা দুটীকে খাওয়াইতেন, স্বামীর জন্য রন্ধন করিতেন। স্বামীর ভোজনান্তে পুখুরে যাইয়া স্নান করিতেন ও জল আনিতেন। দ্বিপ্রহরের আহার করিয়া কন্যা দুইটীকে লইয়া সেই সুন্দর বৃক্ষের ছায়ায় ভূমিতে কাপড় পাতিয়া সুখে বিশ্রাম করিতেন। আবার বৈকাল বেলা পুনরায় রন্ধনাদি সংসার কার্য্য করিতেন। তথাপি এসংসারে বিন্দুর মাতা অপেক্ষা কয়জন সুখী? লক্ষ লক্ষ দরিদ্র গৃহস্থের মধ্যে বিন্দুর মাতা একজন, তাঁহার কষ্ট থাকিলেও তিনি সদাশিবের ন্যায় স্বামী পাইয়াছিলেন, হৃদয়ের মণির ন্যায় দুইটী কন্যা পাইয়াছিলেন, সমস্ত দিন পরিশ্রম ও কষ্ট করিতে হইলেও তিনি সেই শান্ত সংসারে কতকটা শান্তি ভোগ করিতেন, দরিদ্রা রমণী ইহা অপেক্ষা সুখ আশা করেন না।

কিন্তু তাঁহার এ সুখ ও শান্তি অধিক দিন রহিল না। দারুণ বিধির বিড়ম্বনা! সুধার জন্মের তিন বৎসর পর হরিদাসের কাল হইল। হত-ভাগিনী সুধার মাতা তখন ললাটে করাঘাত করিয়া হৃদয়বিদারক ক্রন্দন ধ্বনিতে সে ক্ষুদ্র পল্লি কাঁপাইয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। ভগবান্ কেন এ দরিদ্রের একটী ধন কাড়িয়া লইলেন,—কেন এ হতভাগিনীর একটী সুখ হরণ করিলেন, এ আঁধারের একটী দীপ নির্ব্বাণ করিলেন? বিধবার আর্ত্তনাদ

শুনিয়া গ্রামের লোক জড় হইল, চাষা মজুরগণ সেই পথ দিয়া যাইবার সময় একটু অশ্রুবর্ষণ করিয়া গেল।

তাহার পর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। হরিদাসের যে জমী ছিল তাহা তারিণী বাবু এখন চাষ করান, বৎসরের শেষ হাত তুলিয়া যাহা দেন বিন্দুর মাতা তাহাই পায়। তাহাতে উদরপূর্ত্তি হয় না মেয়ে দুটীকে মানুষ করা হয় না, ঘরের বেড়া দেওয়া হয় না, বৎসর বৎসর চাল ছাওয়া হয় না। বিন্দুর মাতা তখন সেই জীর্ণ কুটীর বিক্রয় করিয়া ভাসুরের ঘরে আশ্রয় লইলেন। সে বাড়ীর রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্য তাঁহাকেই করিতে হইত, বিন্দু ও সুধাকে ফেলিয়া বাড়ীর ছেলেদের কোলে করিয়া থাকিতেন, তাহাদের জল আনিতেন, বাসন মাজিতেন, ঘর ঝাঁট্ দিতেন। তাহা ভিন্ন আশ্রিত লোকের অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, কিন্তু বিন্দুর মাতা কটু কথার উত্তর দিতেন না, তিরস্কারে ক্ষুন্ন হইতেন না, কখন কখন তাঁহার মৃত স্বামীর নিন্দা করিলে বা পিতাকে নাম ধরিয়া গালি দিলে তিনি নীরবে পাক ঘরে আসিয়া চক্ষুর এক বিন্দু জল মুছিতেন। ভাবিতেন "আহা! আমার বিন্দু ও সুধা মানুষ হউক, হে বিধাতা, তুমি ওদের কপালে সুখ লিখিও, আমার শরীরে সব সয় আমি নিজের দুঃখ নিজের অপমান গ্রাহ্য করি না। আহা যেন বিন্দু ও সুধাকে বিবাহ দিয়া উহাদের সুখী দেখিয়া মরি, তাহা হইলেই আমার সুখ।"

* * * *

রমণী ডুব দিয়া উঠিয়া, এক কলস জল কাঁকে লইয়া বলিলেন "আয় মা বিন্দু ঘরে আয়, সুধাকে কোলে নে, আহা বাছার ননির শরীর এই টুকু এসে ক্লান্ত হয়েছে। আহা বাছা যে ছেলে মানুষ, হাঁটতে পারবে কেন? ওকি ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?"

বিন্দু। "হ্যা মা ঘুমিয়ে পড়েছে, এই আমি কোলে করে নিয়ে যাই।"

মাতা। "না না, ঘুমিয়ে ভারি হয়েছে, আমার কোলে দে, তুই মা আমার আঁচল ধরে পথ দেখে দেখে আয়। বড় অন্ধকার হয়েছে, একটু একটু মেঘও হয়েছে, রাত্রিতে বোধ হয় জল হবে।"

বিন্দু। "না মা আমিই কোলে নি,—সে দিন ঘোষেদের বাড়ী থেকে

রাত্রিতে সুধাকে কোল্কে করে এনেছিলুম, আর আজ এই ঘাট থেকে ঘরে নেযেতে পারবো না? ঐ ত রান্নাঘরের আলো দেখা যায়।"

মাতা। "তবে নে বাছা, কিন্তু দেখিস মা সাবধানে আনিস বড় অন্ধকার যেন প'ড়ে যাস্‌নি। ঐ সেদিন তোর জেঠাইমা'র মেয়ে উমাতারা রাত্রি বেলা মেলা থেকে আস্‌ছিল, পথে পড়ে গিযেছিল, আহা বাছার কপালটা এতখানি কেটে গিযেছে।"

বিন্দু। "মা উমাতারারা কোন মেলায গিয়েছিল? কেমন সুন্দর সুন্দর পুথুল এনেছিল, একটী কাঠের ঘোড়া এনেছিল, একটা মাটীর সিংহ এনেছিল আর একটা কেমন কল এনেছিল সেটা ঘোরে। সে সব কোথা থেকে এনেছিল মা?"

মাতা। "তা জানিস্‌নি? ঐ ওরা যে অগ্রদ্বীপের মেলায গিযেছিল, সেখানে বছরবছর ভারি মেলা হয কত হাজার হাজার লোক যায, কত বৈষ্ণব খাওয়ান হয়, কত গান বাজনা হয়, কত দেশের লোক সেখানে যায়।"

বিন্দু। "মা তুমি কখন সেখানে গিয়াছিলে?"

মাতা। "গিয়েছিলুম বাছা যখন আমি ছোট ছিলুম একবার আমার বাপ মা গিয়াছিলেন, আমরা বাড়ী সুদ্ধ গিয়াছিলুম, সেখানে তিন চারি দিন ছিলুম, একটা গাছ তলায বাসা করে ছিলুম।

বিন্দু। "কেন ঘর ছিল না? গাছ তলায় বাসা করে ছিলে কেন মা?"

মাতা। "সেখানে কত হাজার হাজার লোকে যায় ঘর কোথায়? সকলেই গাছতলায় বাসা করে। একটা ভারি আঁব বাগান আছে, তাহার নীচে মেলা হয, কত রাজ্যের দোকানি পসারি আসে, কত দেশের জিনিস বিক্রি হয়।'

বিন্দু। "মা আমি একবার যাব, আমার বড় দেখিতে ইচ্ছা হয়।"

মাতা। "আমার কি তেমন কপাল আছে মা যে তোকে নিয়ে যাব? কত টাকা খরচ হয।"

বিন্দু। "না মা আমি আর বৎসর যাব। উমাতারারা দেখেছে, আমি কেন যাব না?"

মাতা। "ছি মা তুমি সেযনা মেয়ে অমন করেকি বায়না করে? তোর জেঠাইমারা বড় মানুষ, তাঁহার ছেলেরা যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতে যায়।

তোরা মা গরিবের ঘরের মেয়ে তোদের কি বাছা কামনা করিলে সাজে? আহা ভগবান যদি তোদের কপালে সুখ লিখিত তাহা হইল কি আর অন্ন বস্ত্রের জন্য তোদের এমন লালায়িত হইতে হয়? তাহা হইলে কি আমার সোনার পুথলেরা যেন পথের কাঙ্গালীর মত দ্বারে দ্বারে ফেরে? হা ভগবান! তোমারই ইচ্ছা।"

চারি দিকে নিবিড় অন্ধকার হইয়াছে, পশ্চিম দিকে কালো মেঘ উঠিযাছে, আকাশ হইতে এক একবার বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে অন্ধকারময় বৃক্ষের পত্রের মধ্য দিয়া শব্দ করিয়া নিশার বায়ু বহিয়া যাইতেছে। গ্রাম প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে কেবল এক এক বার বৃক্ষের উপর হইতে পেচকের শব্দ শুনা যাইতেছে; অথবা দূর হইতে শৃগালের রব শুনা যাইতেছে। সমস্ত জগৎ অন্ধকার কেবল মেঘের ভিতর দিয়া দুই একটী হীনতেজ তারা এখনও দৃষ্ট হইতেছে, গ্রাম হইতে দুই একটী প্রদীপ বা চুলার আগুন দেখা যাইতেছে আর এক এক বার অল্প অল্প বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে। সেই অন্ধকারে সেই বৃক্ষের নীচে গ্রাম্য পথ দিয়া বিন্দু মার আঁচল ধরিয়া নিঃশব্দে যাইতেছিল, যদি সে অন্ধকারে বিন্দু কিছু দেখিতে পাইত, তবে সে দেখিত মাতার চক্ষু হইতে ধীরে ধীরে দুই একটী অশ্রুবিন্দু সেই শীর্ণ গণ্ডস্থল দিয়া বহিয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুই ভগিনী।

তালপুখুর গ্রামে একটী সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, গ্রামের চারি দিকে মাঠ গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে চাষাগণ চারিদিকের ক্ষেত্র চাষ দিয়াছে, গোরু ও লাঙ্গল লইয়া একে একে গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে, দুই এক জন বা শ্রান্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রমধ্যে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছে। তাহাদিগের গৃহিণী বা কন্যা বা ভগ্নী বা মাতা তাহাদের জন্য বাড়ী হইতে ভাত লইয়া যাই

তেছে। চারিদিকে রৌদ্রতপ্ত ক্ষেত্রের মধ্যে তালপুখুর গ্রাম বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং অপেক্ষাকৃত শীতল। চারিদিকে রাশি রাশি বাঁশ হইয়াছে এবং তাহার পাতাগুলি অল্প অল্প বাতাসে সুন্দর নড়িতেছে। গৃহে গৃহে আম কাঁঠাল তাল নারিকেল ও অন্যান্য ফলবৃক্ষ হইয়া ছায়া বিতরণ করিতেছে। কদলী বৃক্ষে কলা হইয়াছে, আর মাদার মোনসা প্রভৃতি কাটা গাছ ও জঙ্গলে গ্রাম্য পথ পুরিয়া রহিয়াছে। এক এক স্থানে বৃহৎ অশ্বত্থ বা বট গাছ ছায়া বিতরণ করিতেছে এবং কোন স্থানে বা প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষের বাগান ২০। ৩০ বিঘা ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও দিবাভাগে সেই স্থান অন্ধকারপূর্ণ করিতেছে। পত্রের ভিতর দিয়া স্থানে স্থানে সূর্য্যরশ্মি রেখাকারে ভূমিতে পড়িয়াছে, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ডালে ডালে পক্ষীগণ কুলায় নীরব হইয়া রহিয়াছে, কেবল কখন কখন দূর হইতে ঘুঘুর মিষ্ট স্বর সেই অম্রকাননে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর সমস্ত নিস্তব্ধ।

সেই তালপুখুর গ্রামে একটী সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। চারিদিকে বাঁশঝাড় ও আম কাঁঠাল প্রভৃতি দুই একটী ফলবৃক্ষ ছায়া করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে বসিবার একখানি ঘর, সেটী ছায়ায় শীতল এবং তাহার নিকটে ৫। ৬ টী নারিকেল বৃক্ষে ডাব হইয়াছে। সেই ঘরের পশ্চাতে ভিতর বাড়ীর উঠান, তথায় ও বৃক্ষের ছায়া পড়িয়াছে। উঠানের এক পার্শ্বে একটী মাচানের উপর লাউ গাছে লাউ হইয়াছে, অপর দিকে কাঁটা গাছ ও জঙ্গল। একখানি বড় শুইবার ঘর আছে তাহার উচ্চ রক সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে লেপা। পার্শ্বে একটী রান্নাঘর ও তাহার নিকট একটী গোয়ালঘরে একটী মাত্র গাভী রহিয়াছে। বাড়ীর লোকদের খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে উনুনে আগুন নিবিয়াছে, বেড়ায় দুই এক খানি কাপড় শুখাইতেছে, শুইবার ঘরের রকে একটী তক্তাপোশ ও দুই একটী চরকা রহিয়াছে। পশ্চাতে একটী ডোবায় কিছু জল আছে, তাহাতে কয়েকখানি পিতলের বাসন পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও মাজা হয় নাই। ডোবার পার্শ্বে দুই একটী কুল গাছ, কয়েকটী কলাগাছ, ও একটী আঁবগাছ, আর অনেক কাঁটা গাছ ও জঙ্গল। বাড়ীর চতুর্দ্দিকেই বৃক্ষ ও জঙ্গল। এই দ্বিপ্রহরের সময়ও বাড়ীটী ছায়াপূর্ণ ও শীতল।

শুইবার ঘরের বেড়া বন্ধ, ভিতরে অন্ধকার; সেই অন্ধকারে বাড়ীর গৃহিণী নিঃশব্দে পদচারণ করিতেছিলেন। তাঁহার একটী দুই বৎসরের কন্যা ভূমিতে মাদুরের উপর ঘুমাইয়া আছে, আর একটী ছয় মাসের পুত্রসন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া রমণী ধীরে ধীরে সেই ঘরে বেড়াইতেছেন। এক এক বার ছেলেকে চাপড়াইতেছেন, এক এক বার গুন্ গুন্ শব্দে ঘুম পাড়াইবার ছড়া গাইতেছেন, আবার নিঃশব্দে ধীরে ধীরে এদিকে ও দিকে বেড়াইতেছেন।

নারীর বয়স অষ্টাদশ বৎসর, শরীর ক্ষীণ, মুখখানি প্রশান্ত কিন্তু একটু শুখাইয়া গিয়াছে, চক্ষু দুটী বিশাল ও কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু ধীর ও চিন্তাশীল। অষ্টাদশ বৎসরের রমণীর যেরূপ বর্ণনা আমরা উপন্যাসে পাঠ করি তাহার কিছু ইঁহার নাই, সে প্রফুল্লতা সে উদ্বেগ সে উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য নাই। উপন্যাস বর্ণিত সুখ সকলের কপালে ঘটে না, উপন্যাস বর্ণিত সৌন্দর্য্য সকলের থাকে না। এই বিশাল সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, দুই একজন ঐশ্বর্য্যের সন্তানকে ছাড়িয়া দিয়া সহস্র সহস্র দরিদ্র গৃহস্থ ভদ্রলোকের সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, আমাদিগের দরিদ্র ভগ্নী বা কন্যা বা আত্মীয়াগণ কিরূপে সুখে, দুঃখে, কষ্টে, সহিষ্ণুতায়, সংসারযাত্রা করেন চাহিয়া দেখ, দেখিয়া বল ছার উপন্যাসের কাল্পনিক অলীক সুখ কয়জনের কপালে ঘটিয়াছে, রূপার ঝিনুক ও পরম দুগ্ধ মুখে করিয়া কয়জন এসংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ক্ষণেক বেড়াইতে বেড়াইতে শিশু নিদ্রিত হইল, মাতা নিদ্রিত শিশুকে সযত্নে মেজেতে মাদুরের উপর শোয়াইয়া আপনি নিকটে বসিয়া ক্ষণেক পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। সেই ঘরের স্তিমিত আলোক সেই প্রশান্ত ঈষৎ চিন্তাশীল ললাটের উপর পড়িয়াছে। স্থির প্রশান্ত অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ নয়ন দুইটী সেই শিশুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, নয়নে মাতার স্নেহ মাতার যত্ন বিরাজ করিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মাতার চিন্তা ও মাতার অসীম সহিষ্ণুতা লক্ষিত হইতেছে। শরীরখানি ক্ষীণ কিন্তু সুগঠিত। ক্ষীণ সুগঠিত বাহু দ্বারা নারী ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করিতেছিলেন, আর সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরে বসিয়া তাঁহার কত চিন্তা উদয় হইতেছিল। সংসারের চিন্তা, এই সুখ দুঃখ পূর্ণ জগতের চিন্তা, আর কখন কখন পূর্ব্বকালের চিন্তা ও স্মৃতি ধীরে সেই রমণীর হৃদয়ে উদয় হইতেছিল।

ছেলে বেশ ঘুমাইয়াছে, তখন মাতা পাখাখানি রাখিয়া আপন বাহুর উপর মস্তক স্থাপন করিয়া ছেলের পাশে মাটিতে শুইলেন, নয়ন দুইটী ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল, অচিরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। দ্বিপ্রহরের উত্তাপে সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, সে ঘরটীও নিস্তব্ধ, সেই নিস্তব্ধতায় সন্তান দুটীর পার্শ্বে স্নেহময়ী মাতা নিদ্রিত হইলেন। সংসারের অশেষ ভাবনা ক্ষণেক তাঁহার মন হইতে তিরোহিত হইল, সেই শান্ত সহিষ্ণু চিন্তাশীল মুখমণ্ডল ও ললাট হইতে চিন্তার দুই একটী রেখা অপনীত হইল।

রমণী দুই তিন দণ্ড এইরূপ নিদ্রিত রহিলেন। পরে একটু শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। যখন চক্ষু উন্মীলিত করিলেন তখন তাঁহার পার্শ্বে একটী প্রফুল্ল-নয়না হাস্য-বদনা সৌন্দর্য্য-বিভূষিতা বালিকা বসিয়া একটী বিড়াল শিশুর সঙ্গে খেলা করিতেছে, তাহারই শব্দ। বিড়াল শিশু লাফাইয়া লাফাইয়া বালিকার হস্তের খেলিবার দ্রব্য ধরিতে চেষ্টা করিতেছে, বালিকা হস্ত টানিয়া লইতেছে। সে সুন্দর গৌরবর্ণ চিন্তাশূন্য ললাটে গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণ চুল পড়িতেছে, সরিয়া যাইতেছে, আবার পড়িতেছে, সে প্রফুল্ল অতি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ নয়ন দুটী যেন উল্লাসে হাসিতেছে, সে বিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠ দুইটী হইতে যেন সুধা ক্ষরিয়া পড়িতেছে, সে সুগঠিত সুন্দর ললিত বাহুলতা বায়ু-সঞ্চালিত লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে। বালিকার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, কিন্তু তাহার প্রফুল্ল মুখখানিও হাস্য বিস্ফারিত নয়নদ্বয়, তাহার চিন্তা-শূন্য মন ও উদ্বেগশূন্য হৃদয় বালিকারই বটে, নারীর নহে।

রমণী অনেকক্ষণ সেই প্রেমের পুত্তলির দিকে চাহিয়া রহিলেন, সেই বালিকাও বিড়াল শিশুর খেলা ক্ষণেক দেখিতে লাগিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,

"সুধা, তুমি কতক্ষণ এসেছ?'

সুধা। "দিদি আমি অনেকক্ষণ এসেছি, তুমি ঘুমাইতেছিলে তাই জাগাই নাই। আর দেখ দিদি, এই বেরাল ছানাটা আমি যেখানে যাব সেইখানে যাবে, আমি রান্নাঘরে বন্ধ করিয়া বাসন মাজিতে গেলুম ও আমার সঙ্গে সঙ্গে গেল।"

বিন্দু। "বাসন মাজা হয়েছে? বাসনগুল সব ঘরে বন্ধ করিয়া রেখে এসেছ ত?

সুধা। "হাঁ সব মেজে রেখে এসেছি। আর তারপর বেরালকে গোয়াল ঘরে বন্ধ করে এলুম আবার সেখান থেকে বেড়া গ'লে এখানে এসেছে। ও আমার এই পুথুলটা নিতে চায়, তা আমি দিচ্ছি এই যে।"

বিন্দু। "তা ব'ন এতক্ষণ এসেছ একবার শোও না, গেল রাত্রিতে তোমার ভাল ঘুম হয় নি, একটু ঘুমও না।"

সুধা। "না দিদি আমার দিনে ঘুম হয় না, আমি রাত্রিতে বেশ ঘুমিয়েছিলুম। কেবল একবার খোকা যখন কেঁদেছিল তখন আমার ঘুম ভেঙ্গে ছিল। আজ খোকা কেমন আছে দিদি?"

বিন্দু। "এখন ত আছে ভাল, রাত্রি হইলেই গা তপ্ত হয়। তা আজ তিনি কাটোয়া থেকে একটা ঔষুধ আনবেন বলেছেন, তাতে একটু ঘুমও হবে, জ্বরও আস্‌বে না।"

সুধা। "হেমচন্দ্র কখন্ আস্‌বেন দিদি?"

বিন্দু। "বলেছেন ত সন্ধ্যার সময় আস্‌বেন, কেন?"

সুধা। "তিনি এলে একটা মজা করব, তা দিদি তোমাকে, বল্‌ব না, তিনি এলে দেখতে পাবে। যেমন আমার গায়ে সেদিন ফাগ দিয়েছিলেন।"

বিন্দু একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করিবে বল না"।

সুধা। "না দিদি তুমি বলে দেবে।"

বিন্দু। "না বলিব না।"

সুধা। "সত্য বলিবে না?"

বিন্দু। "সত্য বলিব না।"

তখন সুধা আপন আঁচলে বাঁধা একটা জিনিস বাহির করিল। জিনিসটা প্রায় এক হস্ত দীর্ঘ!

বিন্দু। "ও কি লো? ওটা কি?"

সুধা। "দেখতে পাচ্চো না?"

বিন্দু। "দেখছি ত, এ কি পাট?"

সুধা। "হাঁ পাট, কিন্তু কেমন কুসুম ফুল দিয়ে রং করেছি।"

বিন্দু। "কেন উহাতে কি হবে?"

সুধা। "বল দিকি কি হবে?"

বিন্দু। "কি জানি?"

সুধা। "এইটে ঠাওরাতে পারিলে না। যখন আজ রাত্রিতে হেমচন্দ্র একটু ঘুমবেন, আমি এইটা তাঁহার দাড়িতে বেঁধে দেব, তাহার পর উঠিলে তাঁহাকে জটাধারী সন্ন্যাসী বলে ঠাট্টা করিব। খুব মজা হবে।" এই বলিয়া বালিকা করতালি দিয়া হাস্য করিয়া উঠিল।

বিন্দু একটু হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না, সস্নেহে ভগ্নীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন "সুধা, তোর সুধার হাসিতে এ জগৎ মিষ্ট হয়। আহা বালিকা এখন তাহার ভাঙ্গা কপালে কি হইয়াছে জেনেও জানে না! নিদারুণ বিধি! কেমন করে এই কচি ছেলের কপালে এ ভীষণ যাতনা লিখিলে,—কেমন করে এ প্রফুল্ল সুধাপাত্রে গরল মিশাইলে?"

বলা অনাবশ্যক যে আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে যে সময়ের কথা বলিতে-ছিলাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাহার ৯ বৎসরের পরের কথা বলিতেছি। আমাদের গল্প এই সময় হইতে আরম্ভ। এই নয় বৎসরের ঘটনা গুলি কতক কতক উপরেই প্রকাশ হইয়াছে, আর দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

বিন্দুর মাতা আত্মীয়ের বাটীতে থাকিয়া কষ্টে ও শোকে দুইটী অনাথা কন্যাকে লালন পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর এ সংসারে তিনি আর কোনও সুখের আশা রাখেন নাই, কিন্তু তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল মরিবার পূর্ব্বে দুইটী মেয়েকে বিবাহ দিয়া যান। যে দিন তিনি দুইটী কন্যাকে লইয়া তালপুখুরে গিয়াছিলেন তখন বিন্দুর বয়সও ৯ বৎসর হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার মাতা বিবাহের পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু গরিবের ঘরের মেয়ের শীঘ্র বিবাহ হয় না। কলিকাতায় বরের পিতা যেরূপ রাশি রাশি অর্থ চাহেন, পল্লিগ্রামে এখনও সেরূপ হয় নাই, কিন্তু তথাপি বড় ঘরের সহিত কুটুম্বিতা করা সকলেরই সাধ, আত্মীয়ের বাড়ীতে কায কর্ম্ম করিয়া যিনি কন্যাকে লালনপালন করিতেছেন, তাহার মেয়ের সহিত বিবাহ দিতে সকলের সাধ যায় না। আত্মীয়েরাও এবিষয়ে

বড় মনোযোগ করিলেন না, কন্যাও গৌরবর্ণা ছিল না, তবে মুখে শ্রী ছিল, চক্ষু দুটী সুন্দর ছিল, শরীর সুগঠিত ছিল, কিন্তু ক্ষীণ। সম্বন্ধ আসিতে লাগিল ও একে একে ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। মেযের জেঠাইমা বকের উপর দুই পা মেলাইয়া বসিয়া বৈকাল বেলা কেশবিন্যাস করিতে করিতে সহাস্যে বিন্দুর মাকে বলিলেন (বিন্দুর মা চুলের দড়ী ধরিয়াছিলেন) "তা ভাবনা কি বন, আমাদের বাড়ীর মেযের বের জন্য ভাব্‌তে হয় না, আমাদের কুল, মান, বর্দ্ধমানে ভারি চাকরী এ কে না জানে বল কত তপিস্যে করলে তবে এমন বাড়ীর মেযে পায, তোমার আবার বিন্দুর বের ভাবনা? এই র'স না তিনি পূজার সময় বাড়ী আসুন, আমি বিন্দুর এমন সম্বন্ধ করিয়া দিব যে কুটুমের মত কুটুম হবে। এই আমার উমাতারার বয়স সাত বৎসর হয নি, এর মধ্যে কত গ্রামের লোক আমাকে কত সাধাসাধি করিতেছে, যে দিলেই এখনি মাথায় করিয়া লইয়া যায়, তা আমি গা করিনি। আমার উমাতারার এমন সম্বন্ধ করিব যে কুটুমের মত কুটুম হবে। তবে আমার উমাতারার বর্ণের জেল্লা আছে, তোমার মেয়ে একটু কালো, আর তোমাদের বন তেমন টাকা কড়ি নাই আমার দেওযর তেমন সেযনা ছিল না, কিছু রেখে যায নি, তাই যা বল। তা ভেবনা বোন, আমি যখন এবিষযে হাত দিযাছি তখন আর কোন ভাবনা নাই।" আশ্বাসবচন শুনিয়া ও সেই সুন্দর তাবিজ বিভূষিত বাহুর ঘন ঘন সঞ্চালন দেখিয়া বিন্দুর মা আশ্বস্ত হইলেন,—কিন্তু জেঠাইমার বাহু নাড়াতে বিন্দুর বিশেষ উপকার হইল না, বিন্দুর বিবাহ হইল না।

তার পর পূজার সময় তারিণীবাবু বাড়ী আসিলেন। তাঁহার গৃহিণীর জন্য পূজার কাপড়, পূজার গহনা, পূজার সামগ্রী কতই আসিল, গৃহিণীও আহ্লাদে আটখানা। ছেলেদের জন্য কত পোশাক, কাপড় জুতা, উমাতারার জন্য ঢাকাই কাপড়, মাথার ফুল ইত্যাদি। নাজির মশাই বাড়ী আসিয়াছেন গ্রামে ধুম পড়িয়া গেল, কত লোকে সাক্ষাৎ করিতে আসিল, কত খোসামোদ, কত সুখ্যাতি, কত আরাধনা। কাহারও পূজার সময দুই পাঁচ টাকা কর্জ্জ চাই, কাহারও বিপদে সৎপরামর্শ চাই, কাহারও ছেলের একটী চাকুরি চাই, আর কাহারও বিশেষ কিছু আপাততঃ চাই না কেবল বড়

লোকের খোসামোদটা অভ্যাস মাত্র, সেই অভ্যাসেই সুখ হয়। এত ধুমধামের মধ্যে বিন্দুর কথা কেই বা বলে কেই বা শোনে। ১৫ দিনের ছুটী ফুরাইয়া গেল, নাজির মশাই আবার বর্দ্ধমান চলিয়া গেলেন, বিন্দুর সম্বন্ধের কিছুই স্থির হইল না।

পড়সীর মেয়েদের সঙ্গে যখন বিন্দুর মা দেখা করিতে যাইতেন, বৃদ্ধা দিগকে কত স্তুতি করিয়া কন্যার একটী সম্বন্ধ করিয়া দিতে বলিতেন। তাঁহারাও আগ্রহচিত্তে বলিতেন "তা দিব বৈকি, তোমার দেব না ত কার দেব। তবে কি জান বাছা আজ কাল মেয়ের বে সহজ কথা নয়। আর তুমি ত কিছু দিতে থুতে পারবে না, বিন্দুর বাপ ত কিছু রেখে যায় নাই তেমন গোছান লোক হতো, ঐ তোমার ভাসুরের মত টাকা করিতে পারিত তবে আর কি ভাবনা থাকিত? সেই সময় আমি কত বলেছিলুম, তা তখন সে গা কর তা না, তোমরাও গা করিতে না, এখন টের পাচ্ছ; গরিবের কথাটা বাসি হইলেই ভাল লাগে। তা দেব বৈকি বাছা তোমার মেয়ের সম্বন্ধ করিয়া দিব এ বড় কথা?" অথবা অন্য একজন বৃদ্ধা বলিলেন 'তার ভাবনা কি? বিন্দুর বের আবার ভাবনা কি? তবে একটা কথা কি জান, বিন্দু দেখতে শুনতে একটু ভাল হত তবে এ কাযটা শীঘ্র শীঘ্র হইত। তা মেয়ের মুখের ছিরি আছে, ছিরি আছে, তবে রংটা বড় কালো আর চোক্ দুটা বড় ডেবডেবে আর মাথায় বড় চুল নাই। না তা মেয়ের ছিরি আছে, তবে একটু কাহিল, হাড় গুল যেন জির জির করচে, হাত পা গুল কেমন লম্বা লম্বা আর এর মধ্যে ঢেঙ্গা হয়ে উঠেছে তা হোক, তুমি ভেবো না, কাল মেয়ে কি আর বিকোয় না, তবে কি আটকে থাকে তা থাকবে না, যখন আমরা আছি তখন কিছু আটকাবে না।" এইরূপে বৃদ্ধা দিগের যথেষ্ট আশ্বাস বাক্যও তাহার সঙ্গে বিন্দুর বাপের নিন্দা, বিন্দুর মার নিন্দা ও বিন্দুর নিন্দা সম্বন্ধে প্রচুর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আশ্বস্ত ও আপ্যায়িত হইয়া বিন্দুর মা বাড়ী আসিতেন।

গ্রামের মধ্যে দুই একজন প্রাচীন লোক ছিলেন তাঁহারা অনেক লোক দেখিয়াছেন, অনেক গ্রামে যাতায়াত করেন, অনেক ঘর জানেন, অনেক মেয়ের সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিন্দুর মা কয়েক দিন

তাঁহাদের বাড়ী হাঁটাহাটি করিলেন, কোন দিন ছেলেদের জন্য দুই চারি পয়সার চিনির বাতাসা লইয়া গেলেন, কখন বা কিছু মিশ্রী বা মিষ্টান্ন লইয়া গিয়া গৃহিণীদিগের মনস্তুষ্টি করিলেন। গৃহিণীদিগকে অনেক স্তুতি মিনতি করিলেন, তাঁহারাও আশ্বাস বাক্য দিলেন, সন্ধান করিবেন, কর্ত্তাকে বলিবেন,এইরূপ অনেক মধুর বচন বলিলেন। অবশেষে বিন্দুর মা ঘোমটা দিয়া সেই কর্ত্তাদিগেরই মিনতি আরম্ভ করিতে লাগিলেন, পথে ঘাটে দেখা হইলে গরিবের কথাটী মনে রাখিবার জন্য মিনতি করিলেন। তাঁহারাও বলিলেন "তা এ কথা আমাদের এতদিন বল নি? এ সব কায কি আমাদের না বলিলে হয়, ঐ ও পাড়ার ঘোষেদের বাড়ীর কালীতারার বের জন্য কত হাঁটাহাঁটি করেছিল, শেষে বড় বৌ একদিন আমাকে ডেকে বলিলেন, অমনি কাযটা হইয়া গেল। কেমন বে দিয়ে দিয়েছি, রায়েদের বনিয়াদি ঘর, খাবার অভাব নাই,টাকার অভাব নাই,যেন কুবেরের ঘর, সেই ঘরের ছেলের সঙ্গে ঘোষেদের মেয়ের বের সম্বন্ধ করিয়া দিলাম। ছেলেটী দোজবরে বটে আর একটু কাহিল ও একটু বয়স নাকি হয়েছে, তা এখনও চল্লিশের বড় বেশি হয় নাই, আর কালীতারা ৮ বৎসরের হইলেও দেখতে বাড়ন্ত, গ্রাম শুদ্ধ এ সম্বন্ধের সুখ্যাত করিতেছে। ছেলেটী বর্দ্ধমানে থাকে, লেখাপড়া না জানুক তার মান কত, যশ কত, সাহেবরদের খানা দেয়, মজলিশ লোকে ভরা গাড়ী ঘোড়া লোক জন বাবুয়ানা দেখিলে লোকে বলে, হাঁ জমিদারের ঘরের ছেলে বটে। তা আমরা হাত না দিলে কি এমন সম্বন্ধ হয়? তুমি মা এতদিন কোথা হাঁটাহাঁটী কর্‌ছিলে, আমাদের একবার জিজ্ঞাসাও কর না, এখন যে যার আপন আপন প্রভু হয়েছে তাতে কি কাজ চলে? তা আজ আমাকে মনে পড়েছে তবু ভাল।" সজল নয়নে বিন্দুর মা আপনার দোষ স্বীকার করিলেন, এবং এমন লোকের নিকট পূর্ব্বে না আসা বড়ই নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছে ভাবিলেন। অশ্রুজল ও মিনতিতে তুষ্ট হইয়া গ্রামের মণ্ডল বলিলেন "তা ভেব না মা, এখন আমাকে যখন বলিলে তখন আর ভাবনা নাই, দুই চারি দিনের মধ্যে সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিতেছি।" বিন্দুর মা আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, অনেক আশা করিয়া খাওয়া

ঘুম ছাড়িয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই চারি দিন হইল, দুই চারি মাস অতীত হইল, বিন্দুর সম্বন্ধ হইল না, গরিবে তরিল না।

বিন্দুর মা দেখিলেন তালপুকুরের লোক অনেক সদ্গুণবিশিষ্ট নিঃস্বার্থ হইয়া পরের বাড়ী কি রান্না হইতেছে প্রত্যহ তাহার খবর র পরের বৌ ঝি কি করিতেছে তাহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান রাখেন ঘরে গ্রামে গ্রামে সে বৈজ্ঞানিক সংবাদ প্রচার করিবার জন্য নিঃস্ব করেন; কেহ বিপদে পড়িলে বা দায়ে ঠেকিলে তাহাকে পূর্ব্বে দোষে বিশেষরূপে নীতিগর্ভ তিরস্কার দেন, নৈতিক উপদেশ দেন, এবং নিঃস্বা তাহাকে আশ্বাস দিতে, পরামর্শ দিতে যত্ন বা বাক্য ব্যয়ে ত্রুটী করে তবে কাযের সময় সহায়তা করা,—সে স্বতন্ত্র কথা! বিন্দুর মাতাকে এ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কেহ হস্ত প্রসারণ করিলেন না, তাঁহার ব সেহ একটী কপর্দ্দক দিলেন না, তাঁহার উপকারার্থে কেহ বা কনিষ্ঠ অঙ্গুলি নাড়িলেন না। বিন্দুর মা যদি কখনও তালপুকুর হইতে যাইতেন তবে দেখিতেন এ সদ্গুণগুলি জগতের অন্যান্য স্থানেও হয়। তবে বিন্দুর মাতা নির্ব্বোধ, এক একবার তাঁহার মনে এরূ হইত যে এ প্রচুর আশ্বাস বাক্য ও সৎপরামর্শের পরিবর্ত্তে তাঁহা সামান্য দায় হইতে কেহ উদ্ধার করিয়া দিলে তাঁহার নৈতিক উন্ন হউক সাংসারিক সুখ কতক পরিমাণে হইত।

তালপুখুর গ্রামে হরিদাসের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। হেমচন্দ্র নামক একটী পুত্র ভিন্ন সংসারে আর কেহ ছিল না। দরিদ্র হইলেও পুত্রকে অনেক যত্নে লেখা পড়া শিখাইবার চেষ্টা ছিলেন, এবং হেমচন্দ্রও যত্ন সহকারে পাঠ করিয়া বর্দ্ধমানে প্রথম দিয়া কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মাসের পরই পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি পড়াশুনা বন্ধ করিয় পুখুরে ফিরিয়া আসিলেন এবং সামান্য পৈতৃক সম্পত্তিতে জীবন করিতে লাগিলেন।

[illegible]

বিষয় বুদ্ধি কিছু অল্প থাকা বশতঃই হউক অথবা বিশ্ববিদ্যালযের বিস্ময়কর বিদ্যা কয়েক মাসাবধি শিখিবাই হউক, অথবা কলিকাতার বাতাস পাইয়াই হউক, তিনি পিতার পরম বন্ধু হরিদাসের দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সমস্ত গ্রাম এ মূঢ়ের ন্যায় কার্য্যে চমকিত হইল, হেমচন্দ্রের বংশের পুরাতন বন্ধুগণ তাঁহাকে এরূপ কার্য্য করিয়া পিতার নাম ডুবাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ছেলেটী কিছু গোঁয়ার, তিনি বিন্দুর মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, (আমাদের লিখিতে লজ্জা করে) বিন্দুর শুষ্ক ম্লান মুখখানি ও দুই একবার গোপনে দেখিলেন, এবং তৎপর বিন্দুর মাতাকে ও জেঠাই মাকে সম্মত করাইয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক করিলেন। বিন্দুর জেঠাই মা মন্দ লোক ছিলেন না, তাঁহার মনটী সরল, কলহ বা তিরস্কার করা তাঁহার বড় অভ্যাস ছিল না, তিনি কাহারও অনিষ্ট করিতে চাহিতেন না। তবে বড় মানুষের মেয়ে, স্বামী অনেক রোজগার করে, তাহাতে যদি একটু বড়মানুষী রকম দর্প থাকে, একটু বড় কুটুম করিবার ইচ্ছা থাকে, দরিদ্রের সহিত যদি সহানুভূতি একটু কম থাকে তাহা মার্জ্জনীয়। দুই একটী দোষ অনুসন্ধান করিয়া আমরা যেন নিন্দাপরায়ণ না হই,—আমাদিগের মধ্যে কাহার সেরূপ দুই একটী দোষ নাই?

বিন্দুর সরলস্বভাব জেঠাই মা বিন্দুর বিবাহের জন্য বিশেষ যত্ন করেন নাই,—কাহারও জন্য বিশেষ যত্ন করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না,—কিন্তু বিন্দুর একটী সম্বন্ধ হওয়াতে তিনি প্রকৃতই আহ্লাদিত হইলেন। তিনি শুভ দিন দেখিয়া হেমচন্দ্রের সহিত বিন্দুর বিবাহ দিলেন, এবং পাড়া পড়শী মেয়েরা যখন বিবাহ বাটীতে আসিল, তখন সেই তাবিজ বিভূষিত বাহু সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "আহা আমার উমাতারাও যে বিন্দুও সে, আমি বিন্দুর বিবাহ না দিলে কে দেয় বল, বিন্দুর মার ত ঐ দশা, বাপও সিকি পয়সা রেখে যায় নাই, আমি না করিলে কে করে বল।" ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। পড়শীগণও "তুমি বলিয়া করিলে, নৈলে কি অন্যে এতটা করে" এইরূপ অনেক যশোগান ও নিঃস্বার্থতার প্রশংসা করিয়া ঘরে গেল।

তখন সুধার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র, কিন্তু সুধার মার বড় ইচ্ছা সুধারও

বে দিয়া যান। হেমচন্দ্র অনেক আপত্তি করিলেন, অনেক মিনতি করিলেন, সুধাকে আপন ঘরে রাখিয়া একটু বাঙ্গালা শিখাইয়া পরে ১০। ১২ বৎসরের সময় নিজ ব্যয়ে বিবাহ দিবার অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু সুধার মা কিছুতেই শুনিলেন না। তিনি বলিলেন "বাছা সুধার বিয়ে না দিয়া যদি মরি তবে আমার জীবনের সাধ মিটিবে না।" হেমচন্দ্র কি করেন, অগত্যা সম্মত হইয়া সুধাকে একটী সামান্য অবস্থার শিক্ষিত যুবার সহিত বিবাহ দিলেন।

বিন্দুর মাতা স্বামীর মৃত্যুর পর তখন প্রথমে আপনাকে একটু সুখী মনে করিলেন। দুই বিবাহিতা কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া আপনাকে জগতের মধ্যে ভাগ্যবতী মনে করিলেন। তিনি তখনও তারিণী বাবুর বাটীতে রহিলেন। সুধার বিবাহের কয়েক মাস পরই তিনি জীবনলীলা সম্বরণ করিলেন।

আর একটী কথা আমাদিগের বলিবার আছে। পঞ্চম বৎসরে সুধা বিবাহিতা স্ত্রী হইল, সপ্তম বৎসরে বিধবা হইল। সুধা স্ত্রী কাহাকে বলে জানে না, বিধবা কাহাকে বলে, তাহাও জানে না। জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বাটিতে আসিয়া সাত বৎসরের প্রফুল্লা বালিকা ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়া আনন্দে পুথুল খেলা করিতে লাগিল।

সীতারাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে কারারুদ্ধ বন্দীগণকে মুক্ত করিয়া বিদায় দিয়া সীতারাম দেখিতে আসিয়াছিলেন, যে আর কেহ কারাগার মধ্যে আছে কি না। আসিয়া দেখিয়াছিলেন যে শ্রী সেখানে পড়িয়া আছে। সীতারাম বলিলেন, "শ্রী— তুমি এখানে কেন?"

শ্রী। শিপাইতে ধরিয়া আনিয়াছে।

সীতা। হাঙ্গামায় ছিলে বলিয়া? তা, ইহাদের তেমন বোধ সোধ নাই।

অত্যাচার বেশী হইতেছে। যাই হউক, এখন ভগবানের কৃপায় আমরা মুক্ত হইয়াছি। এখন তুমি এখানে পড়িয়া কেন? আপনার স্থানে যাও।

শ্রী। আমার স্থান কোথায়?

সীতা। কেন তোমার মার বাড়ী?

শ্রী। সেখানে কে আছে? আমার উপর এখন রাজার দৌরাত্ম্য—এখন সেখানে আমাকে কে রক্ষা করিবে?

সীতা। তবে তুমি কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর?

শ্রী। কোথাও নয়।

সীতা। এই খানে থাকিবে? এ যে কারাগার, এখানে তোমার মঙ্গল নাই।

শ্রী। কেন, এখানে আমার কে কি করিবে?

সীতা। তুমি হাঙ্গামায় ছিলে—ফৌজদার তোমায় ফাঁসি দিতে পারে, মারিয়া ফেলিতে পারে, বা সেই রকম আর কোন সাজা দিতে পারে।

শ্রী। ভাল।

সীতা। আমি শ্যামাপুরে যাইতেছি। তোমার ভাইও সেই খানে যাইবে। সে খানে তাহার ঘর দ্বার হইবার সম্ভাবনা। তুমি সেই খানে যাও। যেখানে যেখানে তোমার অভিলাষ সেই খানে বাস করিও।

শ্রী। সেখানে কার সঙ্গে যাইব?

সীতা। আমি কোন লোক তোমার সঙ্গে দিব।

শ্রী। এমন লোক কাহাকে সঙ্গে দিবে, যে দুরন্ত সিপাহীদের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিবে?

সীতারাম কিছুক্ষণ ভাবিলেন; বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি।"

শ্রী সহসা উঠিয়া বসিল। উন্মুখী হইয়া, স্থিরনেত্রে সীতারামের মুখপানে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল,

"এত দিন পরে, এ কথা কেন?"

সীতা। সে কথা বুঝান বড় দায়। নাই বুঝিলে।

শ্রী। না বুঝিলে আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। যখন তুমি ত্যাগ করি-

যাছ, তখন আর আমি তোমার সঙ্গে যাইব কেন? যাইন বই কি? কিন্তু তুমি দয়া করিয়া, আমাকে কেবল প্রাণে বাঁচাইবার জন্য, যে এক দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে, আমি সে দয়া চাহি না। আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার স্নেহের অধিকারিণী, আমি তোমার সর্ব্বস্বের অধিকারিণী—আমি তোমার দয়া লইব কেন? যাহার আর কিছুতেই অধিকার নাই, সেই দয়া চায়। না প্রভু, তুমি যাও,—আমি যাইব না। এতকাল তোমা বিনা যদি আমার কাটিয়াছে, তবে আজও কাটিবে।

সীতা। এসো, কথাটা আমি বুঝাইয়া দিব।

শ্রী। কি বুঝাইবে? আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, সকলের আগে। নন্দা তোমার দ্বিতীয়া স্ত্রী, রমা তোমার তৃতীয়া স্ত্রী, আমি সহধর্ম্মিণী—আমি কুলটাও নই, দুশ্চরিত্রা ও নই, জাতিভ্রষ্টা ও নই। অথচ বিনাপরাধে বিবাহের কয় দিন পরে হইতে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ। কখন বল নাই যে কি অপরাধে ত্যাগ করিয়াছ। জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই। অনেক দিন মনে করিয়াছি, তোমার এই অপরাধে আমি প্রাণত্যাগ করিব; তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করিয়া তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিব। সে পরিচয় তোমার কাছে আজ না পাইলে, আমি এখান হইতে যাইব না।

সীতা। সে কথা সব বলিব। কিন্তু একটা কথা আমার কাছে আগে স্বীকার কর—কথা গুলি শুনিয়া তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবে না?

শ্রী। আমি তোমায় ত্যাগ করিব?

সীতা। স্বীকার কর, করিবে না।

শ্রী। এমন কি কথা? তবে, না শুনিয়া আগে স্বীকার করি, কি প্রকার?

সীতা। দেখ, সিপাইদিগের বন্দুকের শব্দ শোনা যাইতেছে। যাহারা পলাইতেছে শিপাইরা তাহাদের পাছু ছুটিয়াছে। এই বেলা যদি আইস, এখনও বোধ হয় তোমাকে নগরের বাহিরে লইয়া যাইতে পারি। আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলে উভয়ে নষ্ট হইব।

তখন শ্রী উঠিয়া সীতারামের সঙ্গে চলিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সীতারাম নির্ব্বিঘ্নে নগর পার হইয়া নদীকূলে পৌঁছিলেন। নক্ষত্রালোকে, নদীসৈকতে বসিয়া, শ্রীকে নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন। শ্রী বসিলেন; তিনি বলিতে লাগিলেন,

"এখন, যাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, তাহা শোন। না শুনিলেই ভাল হইত।

তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের যখন কথাবার্ত্তা স্থির হয়, তখন আমার পিতা কোষ্ঠী দেখিতে চাহিয়াছিলেন মনে আছে? তোমার কোষ্ঠী ছিল না। কাজেই আমার পিতা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে অস্বীকার হইয়াছিলেন। কিন্তু তুমি বড় সুন্দরী বলিয়া আমার মা জিদ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের মাসেক পরে আমাদের বাড়ীতে এক জন বিখ্যাত দৈবজ্ঞ আসিল। সে আমাদের সকলের কোষ্ঠী দেখিল। তাহার নৈপুণ্যে আমার পিতাঠাকুর বড় আপ্যায়িত হইলেন। সে ব্যক্তি নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে জানিত। পিতৃঠাকুর তাহাকে তোমার কোষ্ঠী প্রস্তুত করণে নিযুক্ত করিলেন।

দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া আনিল। পড়িয়া পিতৃঠাকুরকে শুনাইল; সেই দিন হইতে তুমি পরিত্যাজ্যা হইলে।"

শ্রী। কেন?

সীতা। তোমার কোষ্ঠীতে বলবান্ চন্দ্র স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া শনির ত্রিংশাংশগত হইয়াছিল।

শ্রী। তাহা হইলে কি হয়?

সীতা। যাহার এরূপ হয় সে স্ত্রী প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয়।* অর্থাৎ আপনার প্রিয়জনকে বধ করে। স্ত্রীলোকের "প্রিয়" বলিলে স্বামীই বুঝায়। পতিবধ

---

* চন্দ্রাগারে থাগ্নিভাগে কুজস্য স্বেচ্ছাবৃত্তিস্তস্য শিল্পে প্রবীনা।
বাচাংপত্যুঃ সদ্গুণা ভার্গবস্য সাধ্বী মন্দস্য প্রিয়প্রাণহন্ত্রী॥
ইতি জাতকাভরণে।

তোমার কোষ্ঠীর ফল বলিয়া তুমি পরিত্যক্ত্যা হইয়াছ।" এই বলিয়া সীতা-রাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর বলিতে লাগিলেন,

"দৈবজ্ঞ পিতাকে বলিলেন, 'আপনি এই পুত্রবধূটিকে পরিত্যাগ করুন, এবং পুত্রের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের ব্যবস্থা করুন। কারণ, দেখুন, যদিও স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ পতিই প্রিয়, কিন্তু যে স্থানে পতি স্ত্রীর অপ্রিয় হয়, সেখানে এই ফল পতির প্রতি না ঘটিয়া অন্য প্রিয়জনের প্রতি ঘটিবে। স্ত্রীপুরুষে দেখা সাক্ষাৎ না থাকিলে, পতি স্ত্রীর প্রিয় হইবে না; এবং পতি প্রিয় না হইলে তাহার পতিবধের সম্ভাবনা নাই। অতএব যাহাতে আপনার পুত্রবধূর সঙ্গে আপনার পুত্রের কখন সহবাস না হয়, বা প্রীতি না জন্মে সেই ব্যবস্থা করুন।' পিতৃঠাকুর, এই পরামর্শ উত্তম বিবেচনা করিয়া, সেই দিনই তোমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। এবং আমাকে আজ্ঞা করিলেন, যে আমি তোমাকে গ্রহণ বা তোমার সঙ্গে সহবাস না করি। পাছে তাঁহার পরলোকের পর, আমি তোমার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া এ আজ্ঞা পালন না করি, এই আশঙ্কায় তিনি আমাকে কঠিন শপথে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কারণে তুমি আমার কাছে সেই অবধি পরিত্যক্ত।"

শ্রী দাঁড়াইয়া উঠিল। কি বলিতে যাইতেছিল, সীতারাম তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন, বলিলেন,

"আমার কথা বাকি আছে। যতদিন পিতা বর্ত্তমান ছিলেন—আমি তাঁহার অধীন ছিলাম—তিনি যা করাইতেন, তাই হইত।"

শ্রী। এখন তিনি স্বর্গে গিয়াছেন বলিয়া কি তুমি আর তাঁহার অধীন নও? তুমি তাঁহার কাছে শপথ করিয়াছ—সে শপথ কি কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে?

সীতা। "পিতার আজ্ঞা সকল সময়েই পালনীয়—তিনি যখন আছেন, তখনও পালনীয়—তিনি যখন স্বর্গে তখনও পালনীয়। কিন্তু পিতা যদি অধর্ম্ম করিতে বলেন, তবে কি তাহা পালনীয়? পিতা মাতা বা গুরুর আজ্ঞাতেও অধর্ম্ম করা যায় না—কেননা যিনি পিতা মাতার পিতা মাতা এবং গুরুর গুরু, অধর্ম্ম করিলে তাঁহার বিধি লঙ্ঘন করা হয়। বিনাপরাধে স্ত্রীত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম। অতএব আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া অধর্ম্ম

করিতেছি—ইহা বুঝিয়াছি। শীঘ্রই আমি তোমাকে এ কথা জানাইতাম কিন্তু—

শ্রী আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, "এই আধখানা মোহর তুমি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলে—বিপদে পড়িলে নিদর্শন স্বরূপ তোমাকে ইহা দেখাইতে বলিয়া দিয়াছিলে। সে দিন ইহাই তোমাকে দেখাইয়া ভাইয়ের প্রাণ ভিক্ষা পাইয়াছি। আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও যে তুমি আমাকে এত দয়া করিয়াছ ইহা তোমার অশেষ গুণ। কিন্তু আর কখন ইহাতে আমার প্রয়োজন হইবে না। আর কখন আমি তোমাকে মুখ দেখাইব না, বা তুমি কখনও আমার নামও শুনিবে না। গণকঠাকুর যাই বলুন, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নহে। সহবাস থাকুক বা না থাকুক, স্বামীই স্ত্রীর প্রিয়। তুমি আমার চিরপ্রিয়—এ কথা লুকান আমার আর উচিত নহে। আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব।"

এই বলিয়া শ্রী, সেই সুবর্ণার্দ্ধ নদীসৈকতে নিক্ষিপ্ত করিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল। অন্ধকারে সে কোথায় মিশাইল, সীতারাম আর দেখিতে পাইলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তা, কথাটা কি আজ সীতারামের নূতন মনে হইল? না। কাল শ্রীকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল। কাল কি প্রথম মনে হইল? হাঁ তা বৈকি? সীতারামের সঙ্গে শ্রীর কতটুকু পরিচয়? বিবাহের পর কয়দিন দেখা—সে দেখাই নয়—শ্রী তখন বড় বালিকা। তার পর আর শ্রীর কোন খবরই নাই। একবার সে বড় দুঃখে পড়িয়াছে, লোকমুখে শুনিয়া সীতারাম তাহাকে কিছু অর্থ পাঠাইয়া দিলেন—আর চিহ্নিত করিয়া আধখানা মোহর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, যে তোমার যখন কিছুর প্রয়োজন হইবে, এই আধখানা মোহর সঙ্গে দিয়া একজন লোক আমার কাছে পাঠাইয়া দিও। সে যা চাবে, আমি তাই দিব।" শ্রী সে আধখানা মোহর কখনও কাজে লাগায় নাই—কখনও লোক পাঠায় নাই। কেবল ভাইয়ের প্রাণ রক্ষার্থ সে রাত্রে মোহর লইয়া আসিয়াছিল।

স্বীকার করি, তবু শ্রীকে মনে করা সীতারামের উচিত ছিল। কিন্তু এমন অনেক উচিত কাজ আছে, যে কাহারও মনে হয় না। মনে হইবার একটা কারণ না ঘটিলে, মনে হয় না। যাহার নিত্য টাকা আসে, সে কবে কোথায় সিকিটা আধুলিটা হারাইয়াছে, তার তা বড় মনে পড়ে না। যার একদিকে নন্দা আর দিকে রমা, তার কোথাকার শ্রীকে কেন মনে পড়িবে? যার এক দিকে গঙ্গা, এক দিকে যমুনা, তার কবে কোথায় বালির মধ্যে সরস্বতী শুকাইয়া লুকাইয়া আছে, তা কি মনে পড়ে? যার এক দিকে চিত্রা, আর এক দিকে চন্দ্র, তার কবে কোথাকার নিবান বাত্তির আলো কি মনে পড়ে? রমা সুখ, নন্দা সম্পদ, শ্রী বিপদ—যার এক দিকে সুখ, আর দিকে সম্পদ, তার কি বিপদকে মনে পড়ে?

তবে সে দিন রাত্রে শ্রীর চাঁদপানা মুখ খানা, ঢল ঢল ছল ছল জলভরা বলহারা চোক দুটো, বড় গোল করিয়া গিয়াছে। রূপের মোহ? আ ছি! ছি! তা না! তা না! তবে তার রূপেতে, তার দুঃখেতে, আর স্বকৃত অপরাধে, এই তিনটায় মিশিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছিল। তা যা হউক—তার একটা বুঝা পড়া হইতে পারিত; ধীরে সুস্থে, সময় বুঝিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিয়া, গুরুপুরোহিত ডাকিয়া, শপথ লঙ্ঘনের একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া, যা হয় না হয় হইত।—কিন্তু সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি! আ মরি মরি—এমন কি আর হয়!

তবে সীতারামের হইয়া এ কথাটাও আমার বলা কর্ত্তব্য, যে কেবল সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি স্মরণ করিয়াই সীতারাম, পত্নীত্যাগের অধার্ম্মিকতা হৃদয়াঙ্গম করেন নাই। পূর্ব্ব রাত্রে যখনই প্রথম শ্রীকে দেখিয়াছিলেন, তখনই মনে হইয়াছিল, যে আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া পাপাচরণ করিতেছি। পরশুরামের কুঠার তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। মনে করিয়াছিলেন, যে আগে শ্রীর ভাইয়ের জীবন রক্ষা করিয়া, নন্দা রমাকে পূর্ব্বেই শান্তভাবাবলম্বন করাইয়া, চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সঙ্গে একটু বিচার করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন। কিন্তু পর দিনের ঘটনার স্রোতে সে সব অভিসন্ধি ভাসিয়া গেল। এদিকে উচ্ছলিত অনুরাগের তরঙ্গে বালির বাঁধ সব ভাঙ্গিয়া গেল। নন্দা, রমা, চন্দ্রচূড়, সব দূরে থাক—এখন কৈ শ্রী!

শ্রী সহসা নৈশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে সীতারামের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল।

সীতারাম গাত্রোত্থান করিয়া, যে দিকে শ্রী বনমধ্যে অন্তর্হিতা হইয়াছিল, সেই দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। কিন্তু অন্ধকারে কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। বনের ভিতর তাল তাল অন্ধকার বাঁধিয়া আছে, কোথায় শাখাচ্ছেদ জন্য, বা বৃক্ষবিশেষের শাখার উজ্জ্বল বর্ণ জন্য, যেন সাদা বোধ হয়, সীতারাম সেই দিকে দৌড়াইয়া যান—কিন্তু শ্রীকে পান না। তখন শ্রীর নাম ধরিয়া সীতারাম তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। নদীর উপকূলবর্ত্তী বৃক্ষরাজিতে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—বোধ হইল যেন সে উত্তর দিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া সীতারাম সেই দিকে যান—আবার শ্রী বলিয়া ডাকেন, আবার অন্য দিকে প্রতিধ্বনি হয়—আবার সীতারাম সেই দিকে ছুটেন—কই, শ্রী কোথায় নাই! হায় শ্রী! হায় শ্রী! হায় শ্রী! করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল—শ্রী মিলিল না।

কই যাকে ডাকি, তাত পাই না। যা খুঁজি, তা ত পাই না। যা পাইয়াছিলাম, হেলায় হারাইয়াছি, তা ত আর পাই না। রত্ন হারায়, কিন্তু হারাইলে আর পাওয়া যায় না কেন? সময়ে খুঁজিলে হয় ত পাইতাম—এখন আর খুঁজিয়া পাই না। মনে হয় বুঝি চক্ষু গিয়াছে, বুঝি পৃথিবী বড় অন্ধকার হইয়াছে, বুঝি খুজিতে জানি না। তা কি করিব,—আরও খুঁজি। যাহাকে ইহ জগতে খুঁজিয়া পাইলাম না, ইহ জীবনে সেই প্রিয়। এই নিশা প্রভাত কালে শ্রী, সীতারামের হৃদয়ে প্রিয়ার উপর বড় প্রিয়া, হৃদয়ের অধিকারিণী। শ্রীর অনুপম রূপ মাধুরী, তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীর গুণ এখন তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইতে লাগিল। যিনি হিন্দু সাম্রাজ্যের সংস্থাপনের উচ্চ আশাকে মনে স্থান দিয়াছেন তাহার উপযুক্ত মহিষী কই? নন্দা কি রমা কি সিংহাসনের যোগ্যা? না যে বৃক্ষারূঢ়া মহিষমর্দ্দিনী অঞ্চলসঙ্কেতে সৈন্য সঞ্চালন করিয়া রণ জয় করিয়াছিল, সেই সে সিংহাসনের যোগ্য? যদি শ্রী সহায় হয়, তবে সীতারাম কি না করিতে পারে?

সহসা সীতারামের মনে এক ভরসা হইল। শ্রীর ভাই, গঙ্গারামকে

শ্যামাপুরে তিনি যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। গঙ্গারাম অবশ্য শ্যামাপুরে গিয়াছে। সীতারাম তখন দ্রুতবেগে শ্যামাপুরের অভিমুখে চলিলেন। শ্যামাপুরে পৌঁছিয়া দেখিলেন, যে গঙ্গারাম তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রথমেই সীতারাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"গঙ্গারাম। তোমার ভগিনী কোথায়?" গঙ্গারাম বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "আমি কি জানি। আপনি ত তাহাকে চন্দ্রচূড় ঠাকুরের জিম্মা করিয়া দিয়াছিলেন।"

সীতারাম বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, "সব গোল হইয়াছে। সে ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়া হইয়াছে। এখানে আসে নাই?"

গঙ্গা। না।

সীতা। তবে তুমি এই ক্ষণেই তাহার সন্ধানে যাও। সন্ধানের শেষ না করিয়া ফিরিও না। আমি এই খানেই আছি। তুমি সাহস করিয়া সকল স্থানে যাইতে না পার, লোক নিযুক্ত করিও। সে জন্য টাকা কড়ি যাহা আবশ্যক হয় আমি দিতেছি।"

গঙ্গারাম প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়া ভগিনীর সন্ধানে গেল। বহু যত্নপূর্ব্বক, এক সপ্তাহ তাহার সন্ধান করিল—কোন সন্ধান পাইল না। নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সীতারামের নিকট সবিশেষ নিবেদিত হইল।

কৃষ্ণচরিত্র।

রাজসূয়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন,

"আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ঐ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয় এমত নহে। যে রূপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজ্য, এবং যিনি সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর, সেই ব্যক্তিই রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।"

কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের এই কথাই জিজ্ঞাস্য। তাঁহার জিজ্ঞাস্য এই যে —"আমি কি সেইরূপ ব্যক্তি? আমাতে কি সকলই সম্ভব? আমি কি সর্ব্বত্র পূজ্য, এবং সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর?" যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের ভুজবলে এক জন বড় রাজা হইয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি এমন একটা লোক হইয়াছেন কি যে রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করেন? আমি কত বড় লোক, তাহার ঠিক মাপ কেহই আপনাআপনি পায় না। দাম্ভিক ও দুরাত্মাগণ খুব বড় মাপকাটিতে আপনাকে মাপিয়া আপনার মহত্ত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে বসিয়া থাকে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সাবধান ও বিনয়সম্পন্ন ব্যক্তির তাহা সম্ভব নহে। তিনি মনে মনে বুঝিতেছেন বটে, যে আমি খুব বড় রাজা হইয়াছি, কিন্তু আপনার কৃত আত্মমানে তাঁহার বড় বিশ্বাস হইতেছে না। তিনি আপনার মন্ত্রীগণ ও ভীমার্জ্জুনাদি অনুজগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কেমন আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারি কি?" তাঁহারা বলিয়াছেন—"হাঁ অবশ্য পার। তুমি তার যোগ্য পাত্র।" ধৌম্য দ্বৈপায়নাদি ঋষিগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কেমন আমি কি রাজসূয় পারি?" তাঁহারাও বলিয়াছিলেন, "পার। তুমি রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।" তথাপি সাবধান * যুধিষ্ঠিরের মন নিশ্চিন্ত হইল না। অর্জ্জুন হউন, ব্যাস হউন,—যুধিষ্ঠিরের নিকট পরিচিত ব্যক্তিদিগের

---

* পাণ্ডব পাঁচ জনের চরিত্র বুদ্ধিমান সমালোচকে সমালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, যে যুধিষ্ঠিরের প্রধান গুণ, তাঁহার সাবধানতা। ভীম দুঃসাহসী "গোঁয়ার", অর্জ্জুন আপনার বাহুবলের গৌরব জানিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত, যুধিষ্ঠির সাবধান। ধার্ম্মিক তিন জনেই, কিন্তু ভীমের ধর্ম্ম দুইপাদ, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম তিনপাদ, অর্জ্জুনেরই ধর্ম্ম পূর্ণমাত্রা। মহাভারতকার স্বয়ং, অথবা যিনি মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্ব লিখিয়াছেন, তিনি ঠিক এরূপ মনে করেন না—তিনি বয়োনুসারে ধর্ম্মের অনুপাত করিয়াছেন, কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। স্থূল কথা যুধিষ্ঠির যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত, তাঁহার সাবধানতা তাহার একটি কারণ। এ জগতে সাবধানতাই অনেক স্থানে ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হয়। কথাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বড় গুরুতর কথা বলিয়াই এখানে ইহার উত্থাপন করিলাম। এই অবধানপরতার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের দ্যূতানুরাগ কতটুকু সঙ্গত, তাহা দেখাইবার এ স্থান নহে।

মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহার কাছে এ কথার উত্তর না শুনিলে যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ যায় না তাই "মহাবাহু সর্ব্বলোকোত্তম" কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির করিলেন। ভাবিলেন, "কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপরামর্শ দিবেন।" তাই তিনি কৃষ্ণকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণ আসিলে তাই, তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাও কৃষ্ণকে খুলিয়া বলিতেছেন,

"আমার অন্যান্য সুহৃদ্গণ আমাকে ঐ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোদ্ঘোষণ করেন না। কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন্! এই পৃথিবী মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য্য করা যায় না। তুমি উক্ত দোষরহিত ও কাম ক্রোধ বিবর্জ্জিত; অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।"

পাঠক দেখুন, কৃষ্ণের আত্মীয়গণ, যাঁহারা প্রত্যহ তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিতেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে কি ভাবিতেন; † আর এখন আমরা তাঁহাকে কি ভাবি! তাঁহারা জানিতেন, কৃষ্ণ কাম ক্রোধ বিবর্জ্জিত, সর্ব্বাপেক্ষা সত্যবাদী, সর্ব্বদোষরহিত, সর্ব্বলোকোত্তম, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ—আমরা জানি তিনি লম্পট, ননিমাখনচোর, কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, রিপুবশীভূত, এবং অন্যান্য দোষযুক্ত। যিনি ধর্ম্মের চরমাদর্শ, তাঁহাকে যে জাতি এই পদে অবনত করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে যে ধর্ম্মলোপ হইবে, বিচিত্র কি?

যুধিষ্ঠির যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল। যে অপ্রিয় সত্যবাক্য আর কেহই যুধিষ্ঠিরকে বলে নাই, কৃষ্ণ তাহা বলিলেন। মিষ্ট কথার আবরণ

---

† যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে বাস্তবিক এই সকল কথা গুলি বাহির হইয়াছিল, আর তাহাই কেহ লিখিয়া রাখিয়াছে, এমত নহে। তবে সমকালিক ইতিহাসে এই রূপ ছায়া পড়িয়াছে। ইহাই যথেষ্ট।

দিয়া, যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলিলেন, তুমি রাজসূয়ের অধিকারী নহ, কেননা সম্রাট ভিন্ন রাজসূয়ের অধিকারী হয় না, তুমি সম্রাট নহ। মগধাধিপতি জরাসন্ধ এখন সম্রাট। তাহাকে জয় না করিলে তুমি রাজসূয়ের অধিকারী হইতে পার না, ও সম্পন্ন করিতে পারিবে না।

যাঁহারা কৃষ্ণকে স্বার্থপর ও কুচক্রী ভাবেন, তাঁহারা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "এ কৃষ্ণের মতই কথাটা হইল বটে। জরাসন্ধ কৃষ্ণের পূর্ব্বশক্র, কৃষ্ণ নিজে তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই; এখন সুযোগ পাইয়া বলবান্ পাণ্ডবদিগের দ্বারা তাহার বধ-সাধন করিয়া আপনার ইষ্টসিদ্ধির চেষ্টায় এই পরামর্শটা দিলেন।"

কিন্তু আরও একটু কথা বাকি আছে। জরাসন্ধ সম্রাট কিন্তু তৈমুরলঙ্গ বা প্রথম নেপোলিয়ানের ন্যায় অত্যাচারকারী সম্রাট। পৃথিবী তাহার অত্যাচারে প্রপীড়িত। জরাসন্ধ রাজসূয় যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া, "বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া সিংহ যেমন পর্ব্বতকন্দর মধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে গিরিদুর্গে বদ্ধ রাখিয়াছে।" রাজগণকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখার আর এক ভয়ানক তাৎপর্য্য ছিল। জরাসন্ধের অভিপ্রায়, সেই সমানীত রাজগণকে যজ্ঞকালে সে মহাদেবের নিকট বলি দিবে। পূর্ব্বে যে যজ্ঞকালে কেহ কখন নরবলি দিত, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে বলিতে হইবে না * কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,

"হে ভরতকুলপ্রদীপ! বলিপ্রদানার্থ সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমৃষ্ট হইয়া পশুদিগের ন্যায় পশুপতির গৃহে বাস করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে অচিরাৎ ছেদন করিবে, এই নিমিত্ত আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি। ঐ দুরাত্মা ষড়শীতি জন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দ্দশ জনের অপ্রতুল আছে; চতুর্দ্দশ জন আনীত হইলেই ঐ নৃপাধম উহাদের সকলকে এককালে সংহার করিবে। হে ধর্ম্মাত্মন্! এক্ষণে যে ব্যক্তি দুরাত্মা জরা-

---

* কেহ কদাচিৎ দিত—সামাজিক প্রথা ছিল না। কৃষ্ণ একস্থানে বলিতেছেন, "আমরা কখন নরবলি দেখি নাই।" ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা এ ভয়ানক প্রথার দিক দিয়া যাইতেন না।

সন্ধের ঐ ক্রূর কর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাঁহার যশোরাশি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইবে, এবং যিনি উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।"

অতএব জরাসন্ধ বধের জন্য কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে যে পরামর্শ দিলেন, তাহার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণের নিজের হিত নহে;—যুধিষ্ঠিরেরও যদিও তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি আছে, তথাপি তাহাও প্রধানতঃ ঐ পরামর্শের উদ্দেশ্য নহে; উহার উদ্দেশ্য কারারুদ্ধ রাজমণ্ডলীর হিত—জরাসন্ধের অত্যাচারপ্রপীড়িত ভারতবর্ষের হিত—সাধারণ লোকের হিত। কৃষ্ণ নিজে তখন রৈবতকের দুর্গের আশ্রয়ে, জরাসন্ধের বাহুর অতীত এবং অজেয়, জরাসন্ধের বধে তাঁহার নিজের ইষ্টানিষ্ট কিছুই ছিল না। আর থাকিলেও, যাহাতে লোকহিত সাধিত হয়, সেই পরামর্শ দিতে তিনি ধর্ম্মতঃ বাধ্য—সে পরামর্শে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি থাকিলেও সেই পরামর্শ দিতে বাধ্য। এই কার্য্যে লোকের হিত সাধিত হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে আমারও কিছু স্বার্থসিদ্ধি আছে,—এমন পরামর্শ দিলে লোকে আমাকে স্বার্থপর মনে করিবে—অতএব আমি এমন পরামর্শ দিব না;—যিনি এইরূপ ভাবেন, তিনিই যথার্থ স্বার্থপর, এবং অধার্ম্মিক; কেননা তিনি আপনার মর্য্যাদাই ভাবিলেন, লোকের হিত ভাবিলেন না। যিনি সে কলঙ্ক সাদরে মস্তকে বহন করিয়া লোকের হিতসাধন করেন তিনিই আদর্শ ধার্ম্মিক। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্রই আদর্শ ধার্ম্মিক।

যুধিষ্ঠির সাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে রাজি হইলেন না। কিন্তু ভীমের দৃপ্ত তেজস্বী ও অর্জ্জুনের তেজোগর্ভ বাক্যে, ও কৃষ্ণের পরামর্শে তাহাতে শেষে সম্মত হইলেন। ভীমার্জ্জুন ও কৃষ্ণ এই তিনজন জরাসন্ধ জয়ে যাত্রা করিলেন। যাহার অগণিত সেনার ভয়ে প্রবল পরাক্রান্ত বৃষ্ণিবংশ রৈবতকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনজন মাত্র তাহাকে জয় করিতে যাত্রা করিলেন, এ কিরূপ পরামর্শ? এ পরামর্শ কৃষ্ণের, এবং এ পরামর্শ কৃষ্ণের আদর্শ চরিত্রানুযায়ী। জরাসন্ধ দুরাত্মা, এজন্য সে দণ্ডনীয় কিন্তু তাহার সৈনিকেরা কি অপরাধ করিয়াছে, যে তাহার সৈনিকদিগকে বধের জন্য সৈন্য লইয়া যাইতে হইবে? এরূপ সসৈন্য যুদ্ধে কেবল নিরপরাধীদিগের হত্যা, আর হয় ত অপরাধীরও নিষ্কৃতি, কেন

না জরাসন্ধের সৈন্যবল বেশী, পাণ্ডবসৈন্য তাহার সমকক্ষ না হইতে পারে। কিন্তু তখনকার ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম্ম ছিল যে দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহূত হইলে কেহই বিমুখ হইতেন না। অতএব কৃষ্ণের অভিসন্ধি এই যে অনর্থক লোকক্ষয় না করিয়া, তাঁহারা তিনজন মাত্র জরাসন্ধের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহূত করিবেন—যে তিন জনের মধ্যে একজনের সঙ্গে যুদ্ধে সে অবশ্য স্বীকৃত হইবে। তখন যাহার শারীরিক বল, সাহস, ও শিক্ষা বেশী, সেই জিতিবে। এ বিষয়ে চারি জনেই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যুদ্ধসজ্জার এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা স্নাতক ব্রাহ্মণবেশে গমন করিলেন। এ ছদ্মবেশ কেন, তাহা বুঝা যায় না। এমন নহে যে গোপনে জরাসন্ধকে ধরিয়া বধ করিবার তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল। তাঁহারা শত্রুভাবে, দ্বারস্থ ভেরী সকল ভগ্ন করিয়া, প্রাকার চৈত্যচূর্ণ করিয়া জরাসন্ধ সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব গোপন উদ্দেশ্য নহে। ছদ্মবেশ কৃষ্ণার্জ্জুনের অযোগ্য। ইহার পর আরও একটা কাণ্ড, তাহাও শোচনীয় ও কৃষ্ণার্জ্জুনের অযোগ্য বলিয়াই বোধ হয়। জরাসন্ধের সমীপবর্ত্তী হইলে ভীমার্জ্জুন "নিয়মস্থ" হইলেন। নিয়মস্থ হইলে কথা কহিতে নাই। তাঁহারা কোন কথাই কহিলেন না। সুতরাং জরাসন্ধের সঙ্গে কথা কহিবার ভার কৃষ্ণের উপর পড়িল। কৃষ্ণ বলিলেন, "ইহাঁরা নিয়মস্থ, এক্ষণে কথা কহিবেন না; পূর্ব্ব রাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন।" জরাসন্ধ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহাদিগকে যজ্ঞালয়ে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন, এবং অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

ইহাও একটা কল কৌশল। কল কৌশলটা বড় বিশুদ্ধ রকমের নয়—চাতুরী বটে। ধর্ম্মাত্মার ইহা যোগ্য নহে। এ কল কৌশল ফিকির ফন্দীর উদ্দেশ্যটা কি? যে কৃষ্ণার্জ্জুনকে এত দিন আমরা ধর্ম্মের আদর্শের মত দেখিয়া আসিতেছি, হঠাৎ তাঁহাদের এ অবনতি কেন? এ চাতুরীর কোন যদি উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলেও বুঝিতে পারি, যে হাঁ, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য, ইহাঁরা এই খেলা খেলিতেছেন, কল কৌশল করিয়া শত্রু নিপাত করিবেন বলিয়াই এ নিকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ইহাও বলিতে বাধ্য হইব যে ইহাঁরা

ধর্ম্মাত্মা নহেন, এবং কৃষ্ণচরিত্র আমরা যেরূপ বিশুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম সেরূপ নহে।

যাঁহারা জরাসন্ধ-বধ-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই, তাঁহারা মনে করিতে পারেন, কেন, এরূপ চাতুরীর উদ্দেশ্য ত পড়িয়াই রহিয়াছে। নিশীথকালে, যখন জরাসন্ধকে নিঃসহায় অবস্থায় পাইবেন, তখন, তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বধ করাই এ চাতুরীর উদ্দেশ্য; তাই ইঁহারা যাহাতে নিশীথ কালে তাহার সাক্ষাৎ লাভ হয়, এমন একটা কৌশল করিলেন। বাস্তবিক, এরূপ কোন উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না. এবং এরূপ কোন কার্য্য তাঁহারা করেন নাই। নিশীথকালে তাঁহারা জরাসন্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন নাই আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। নিশীথকালে যুদ্ধ করেন নাই—দিনমানে যুদ্ধ হইয়াছিল। গোপনে যুদ্ধ করেন নাই, প্রকাশ্যে সমস্ত পৌরবর্গ ও মগধবাসীদিগের সমক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল। এমন এক দিন যুদ্ধ হয় নাই, চৌদ্দ দিন এমন যুদ্ধ হইয়াছিল। তিন জনে যুদ্ধ করেন নাই, একজনে করিয়াছিলেন। হঠাৎ আক্রমণ করেন নাই—জরাসন্ধকে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে বিশেষ অবকাশ দিয়াছিলেন—এমন কি, পাছে যুদ্ধে আমি মারা পড়ি, এই ভাবিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে জরাসন্ধ আপনার পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন, ততদূর পর্য্যন্ত অবকাশ দিয়াছিলেন। নিরস্ত্র হইয়া জরাসন্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। লুকাচুরি কিছুই করেন নাই, জরাসন্ধ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র কৃষ্ণ আপনাদিগের যথার্থ পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে জরাসন্ধের পুরোহিত যুদ্ধজাত অঙ্গের বেদনা হরণের উপযোগী ঔষধ সকল লইয়া নিকটে রহিলেন, কৃষ্ণের পক্ষে সেরূপ কোন সাহায্য ছিল না, তথাপি 'অন্যায় যুদ্ধ'' বলিয়া তাঁহারা কোন আপত্তি করেন নাই। যুদ্ধকালে জরাসন্ধ ভীমকর্ত্তৃক অতিশয় পীড্যমান হইলে, দয়াময় কৃষ্ণ ভীমকে তত পীড়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের এইরূপ চরিত্র. এই কার্য্যে তাঁহারা কেন চাতুরী করিবেন? এ উদ্দেশ্যশূন্য চাতুরী কি সম্ভব? অতি নির্ব্বোধে যে শঠতার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা করিলে করিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণার্জ্জুন আর যাহাই হউন, নির্ব্বোধ নহেন, ইহা শত্রুপক্ষও স্বীকার

করেন। তবে এ চাতুর্য্যের কথা কোথা হইতে আসিল? যাহার সঙ্গে এই সমস্ত জরাসন্ধ বধ পর্ব্বাধ্যায়ের অনৈক্য, সে কথা ইহার ভিতর কোথা হইতে আসিল? ইহা কি কেহ বসাইয়া দিয়াছে? এই কথা গুলি কি প্রক্ষিপ্ত? এই বৈ এ কথার আর কোন উত্তর নাই। কিন্তু সে কথাটা আর একটু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা যাউক।

আমরা দেখিয়াছি যে মহাভারতে কোন স্থানে কোন একটি অধ্যায়, কোন স্থানে কোন একটি পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত। যদি একটি অধ্যায়, কি একটা পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, তবে একটি অধ্যায় কি একটি পর্ব্বাধ্যায়ের অংশ বিশেষ বা কতকগুলি শ্লোক তাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না কি? বিচিত্র কিছুই নহে। বরং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলেই এইরূপ ভূরি ভূরি হইয়াছে, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা। এই জন্যই বেদাদির এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা, রামায়ণাদি গ্রন্থের এত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ, এমন কি শকুন্তলা মেঘদূত প্রভৃতি আধুনিক (অপেক্ষাকৃত আধুনিক) গ্রন্থেরও এত বিবিধ পাঠ। সকল গ্রন্থেরই মৌলিক অংশের ভিতর এইরূপ এক একটা বা দুই চারিটা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়—মহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর তাহা পাওয়া যাইবে তাহার বিচিত্র কি?

কিন্তু যে শ্লোকটা আমার মতের বিরোধী, সেইটাই যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমি বাদ দিব, তাহা হইতে পারে না। কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত, কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার নিদর্শন দেখিয়া পরীক্ষা করা চাই। যেটাকে আমি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিব, আমাকে অবশ্য দেখাইয়া দিতে হইবে, যে প্রক্ষিপ্তের চিহ্ন উহাতে আছে, চিহ্ন দেখিয়া আমি উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেছি।

অতি প্রাচীন কালে যাহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা ধরিবার উপায়, আভ্যন্তরিক প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নাই। আভ্যন্তরিক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—অসঙ্গতি, অনৈক্য। যদি দেখি যে কোন পুথিতে এমন কোন কথা আছে, যে সে কথা গ্রন্থের আর সকল অংশের বিরোধী, তখন স্থির করিতে হইবে যে, হয় উহা গ্রন্থকারের বা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ ঘটিয়াছে, নয় উহা প্রক্ষিপ্ত। কোন্‌টি ভ্রমপ্রমাদ, আর কোন্‌টি প্রক্ষেপ, তাহাও সহজে নিরূপণ করা যায়। যদি রামায়ণের কোন কাপিতে দেখি যে

লেখা আছে যে রাম উর্ম্মিলাকে বিবাহ করিলেন, তখনই সিদ্ধান্ত করিব যে এটা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদ মাত্র। কিন্তু যদি দেখি যে এমন লেখা আছে, যে রাম উর্ম্মিলাকে বিবাহ করায় লক্ষ্মণের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল, তার পর রাম উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণকে ছাড়িয়া মিটমাট্ করিলেন, তখন আর বলিতে পারিব না যে এ লিপিকার বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ—তখন বলিতে হইবে যে এটুকু কোন ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ রসে রসিকের রচনা, ঐ পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন, আমি দেখাইয়াছি যে জরাসন্ধ বধ পর্ব্বাধ্যায়ের যে কয়টা কথা আমাদের বিচার্য্য, তাহা ঐ পর্ব্বাধ্যায়ের আর সকল অংশের সম্পূর্ণ বিরোধী। আর ইহাও স্পষ্ট যে ঐ কথাগুলি এমন কথা নহে, যে তাহা লিপিকারের বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। সুতরাং ঐ কথা গুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার আমাদের অধিকার আছে।

ইহাতেও পাঠক বলিতে পারেন যে, যে এই কথা গুলি প্রক্ষিপ্ত করিল, সেই বা এমন অসংলগ্ন কথা প্রক্ষিপ্ত করিল কেন? তাহারই বা উদ্দেশ্য কি? এ কথাটার মীমাংসা আছে। আমি পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি, যে মহাভারতের তিন স্তর দেখা যায়। তৃতীয় স্তর, নানা ব্যক্তির গঠিত। কিন্তু আদিম স্তর, এক হাতের এবং দ্বিতীয় স্তরও এক হাতের। এই দুই জনেই শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাঁহাদের রচনা প্রণালী স্পষ্টতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির, দেখিলেই চেনা যায়। যিনি দ্বিতীয় স্তরের প্রণেতা তাঁহার রচনার কতকগুলি লক্ষণ আছে, যুদ্ধ পর্ব্বগুলিতে তাঁহার বিশেষ হাত আছে—ঐ পর্ব্বগুলির অধিকাংশই তাঁহার প্রণীত, সেই সকল সমালোচন কালে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই কবির রচনার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে ইনি কৃষ্ণকে চতুরচূড়ামণি সাজাইতে বড় ভালবাসেন। বুদ্ধির কৌশল, সকল গুণের অপেক্ষা ইহাঁর নিকট আদরণীয়। এরূপ লোক এ কালেও বড় দুর্লভ নয়। এখন ও বোধ হয় অনেক সুশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক আছেন যে কৌশলবিদ্ বুদ্ধিমান চতুরই তাঁহাদের কাছে মনুষ্যত্বের আদর্শ। ইউরোপীয় সমাজে এই আদর্শ বড় প্রিয়—তাহা হইতে আধুনিক Diplomacy বিদ্যার সৃষ্টি। বিস্মার্ক এখন জগতের প্রধান মনুষ্য। থেমিষ্টক্লিসের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা এই বিদ্যায় পটু তাঁহারাই ইউরোপে

মান্য—Franoisd; Assisi বা Imitation of Christ' গ্রন্থের প্রণেতা কে চিনে? মহাভারতের ভারতের দ্বিতীয় কবির ও মনে সেইরূপ চরমাদর্শ ছিল। আবার কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাই তিনি পুরুষোত্তমকে কৌশলীর শ্রেষ্ঠ সাজাইয়াছেন। তিনি "অশ্বথামা হত ইতি গজঃ" এই বিখ্যাত উপন্যাসের প্রণেতা। জয়দ্রথ বধে সুদর্শনচক্রে রবি আচ্ছাদন, কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধে অর্জ্জুনের রথচক্র পৃথিবীতে পুতিয়া ফেলা, আর ঘোড়া বসাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি কৃষ্ণকৃত অদ্ভুত কৌশলের তিনিই রচয়িতা। তাহা আমি ঐ সকল পর্ব্বের সমালোচনা কালে বিশেষ প্রকারে দেখাইব। এক্ষণে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে, যে জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায় এই অনর্থক এবং অসংলগ্ন কৌশল বিষয়ক প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির প্রণেতা তাঁহাকেই বিবেচনা হয়, এবং তাঁহাকে এ সকলের প্রণেতা বিবেচনা করিলে উদ্দেশ সম্বন্ধে আর বড় অন্ধকার থাকে না। কৃষ্ণকে কৌশলময় বলিয়া প্রতিপন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কেবল এই টুকুর উপর নির্ভর করিতে হইলে, হয়ত আমি এত কথা বলিতাম না। কিন্তু জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায়ে তাঁর হাত আরও দেখিব।

পুষ্প নাটক।

যূথিকা ও বৃষ্টিবিন্দুর প্রবেশ।

যূথিকা। এসো, এসো প্রাণনাথ এসো: আমার হৃদয়ের ভিতর এসো; আমার হৃদয় ভরিয়া যাউক। কতকাল ধরিয়া তোমার আশায় উর্দ্ধমুখী হইয়া বসিয়া আছি, তাকি তুমি জান না? আমি যখন কলিকা, তখন ঐ বৃহৎ আগুনের চাকা—ঐ ত্রিভুবন শুষ্কর মহাপাপ, কোথায় আকাশের পূর্ব্বদিকে পড়িয়াছিল! তখন এমন বিশ্বপোড়ান মূর্ত্তিও ছিল না। তখন এর তেজের এত জ্বালাও ছিলনা—হায়! সে কতকাল হইল! এখন দেখ সেই মহাপাপ ক্রমে আকাশের মাঝখানে উঠিয়া, ব্রহ্মাণ্ড জ্বালাইয়া ক্রমে পশ্চিমে

হেলিয়া হেলিয়া, এখন বুঝি অনন্তে ডুবিয়া যায়। যাক। দূর হোক—তা তুমি এতকাল কোথা ছিলে প্রাণনাথ? তোমায় পেয়ে দেহ শীতল হইল, হৃদয় ভরিয়া গেল—ছি, মাটীতে পড়িও না! আমার বুকে তুমি আছ, তাতে সেই পোড়া তপন আর আমাকে না জ্বালাইয়া তোমাকে কেমন সাজাই-তেছে! সেই রৌদ্রবিম্বে তুমি কেমন রত্নভূষিত হইয়াছ! তোমার রূপে আমিও রূপসী হইয়াছি—থাক, থাক, হৃদয়-স্নিগ্ধকর।—আমার হৃদয়ে থাক, মাটিতে পড়িও না।

টগর। (জনান্তিকে কৃষ্ণকলির প্রতি) দেখ্ ভাই কৃষ্ণকলি,—মেয়েটার রকম দেখ্!

কৃষ্ণকলি। কোন্ মেয়েটার?

টগর। ঐ যুঁই টা। এতকাল মুখ বুজে, ঘাড় হেঁট ক'রে, যেন দোকা-নের মুড়ির মত পড়িয়া ছিল—তারপর আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা, নবাবের বেটা নবাব, বাতাসের ঘোড়ায় চ'ড়ে, একেবারে মেয়েটার ঘাড়ের উপর এসে পড়িল। অমনি মেয়েটা হেসে, ফুটে, একেবারে আটখানা! আঃ তোর ছেলে বয়স! ছেলেমানুষের রকমই এক স্বতন্ত্র।

কৃষ্ণকলি। আ ছি! ছি!

টগর। তা দিদি! আমরা কি আর ফুট্‌তে জানিনে? তা, সংসার ধর্ম্ম করিতে গেলে দিনেও ফুট্‌তে হয়, দুপরেও ফুট্‌তে হয়, গরমেও ফুট্‌তে হয়, ঠাণ্ডাতেও ফুট্‌তে হয়, না ফুট্‌লে চলবে কেন বহিন? আমাদেরই কি বয়স নেই? তা, ও সব অহঙ্কার ঠেকার আমরা ভালবাসি না।

টগর। সেই কথাই ত বলি।

যুঁই। তা এতকাল কোথা ছিলে প্রাণনাথ। জানন৷ কি যে তুমি বিনা আমি জীবন ধারণ করিতে পারি না?

বৃষ্টিবিন্দু। দুঃখ করিও না, প্রাণাধিকে। আসিব আসিব অনেক কাল ধরিয়া মনে করিতেছি, কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই। কি জান, আকাশ হইতে পৃথিবীতে আসা, ইহাতে অনেক বিঘ্ন। একা আসা যায় না, দলবল যুটিয়া আসিতে হয়, সকলের সব সময় মেজাজ মরজি সমান থাকে না। কেহ বাষ্পরূপ ভাল বাসেন, আপনাকে বড় লোক মনে করিয়া আকাশের উচ্চস্তরে

অদৃশ্য হইয়া থাকিতে ভাল বাসেন; কেহ বলেন একটু ঠাণ্ডা পড়ুক, বায়ুর নিম্নস্তর বড় গরম, এখন গেলে শুকাইয়া উঠিব; কেহ বলেন, পৃথিবীতে নামা, ও অধঃপতন, অধঃপাতে কেন যাইব? কেহ বলেন,—আর মাটিতে গিয়া কাজ নাই, আকাশে কালামুখো মেঘ হ'য়ে চিরকাল থাকি সেও ভাল; কেহ বলেন, মাটিতে গিয়া কাজ নাই, আবার সেই চিরকেলে নদী নালা বিল খাল বেয়ে সেই লোণা সমুদ্রটায় পড়িতে হইবে, তার চেয়ে এসো এই উজ্জ্বল রৌদ্রে গিয়া খেলা করি, সবাই মিলে রামধনু হইয়া সাজি, বাহার দেখিয়া ভূচর খেচর মোহিত হইবে। তা সব যদি মিলিয়া মিশিয়া, আকাশে ঘোটপাট হওয়া গেল, তবু জ্ঞাতিবর্গের গোলযোগ মিটে না। কেহ বলেন, এখন থাক্, এখন এসো, কালিমাময়ী কালী করালী কাদম্বিনী সাজিয়া বিদ্যুতের মালা গলায় দিয়া, আমরা এইখানে বসিয়া বাহার দিই। কেহ বলে তত তাড়াতাড়ি কেন? আমরা জলবংশ, ভূলোক উদ্ধার করিতে যাইব, অমনি কি চুপি চুপি যাওয়া হয়?—এসো খানিক ডাক হাঁক করি। কেহ ডাক হাঁক করে, কেহ বিদ্যুতের খেলা দেখে—মাগী নানা রঙ্গে রঙ্গিনী—কখন এ মেঘের কোলে, কখন ও মেঘের কোলে, কখন আকাশ প্রান্তে, কখন আকাশ মধ্যে, কখনও মিটি মিটি, কখন চিকি চাকি—

যুঁই। তা তোমার যদি সেই বিদ্যুতেই এত মন মজেছে, ত এলে কেন? সে হ'লো বড়, আমরা হলেম ক্ষুদ্র!

বৃষ্টিবিন্দু। আছি! ছি! রাগ কেন? আমি কি সেই রকম? দেখ ছেলে ছোকরা হাল্‌কা যারা, তারা কেহই আসিল না, আমরা জন কত ভারি লোক, থাকিতে পারিলাম না, নামিয়া আসিলাম। বিশেষ তোমাদের সঙ্গে অনেক দিন দেখা শুনা হয় নাই।

পদ্ম। (পুকুর হইতে) উঃ বেঁটা কি ভারি রে! আয় না, তোদের মত দুলাখ্ দশ লাখ্ আয় না—আমার একটা পাতায় বসাইয়া রাখি।

বৃষ্টিবিন্দু। বাছা, আসল কথাটা ভুলে গেলে? পুকুর পুরায় কে? হে পঙ্কজে, বৃষ্টি নহিলে জগতে পাঁকও থাকিত না, জলও থাকিত না, তুমি ভাসিতেও পাইতে না, হাসিতেও পাইতে না। হে জলজে, তুমি আমাদের ঘরের মেয়ে, তাই আমরা তোমাকে বুকে করিয়া পালন করি,—নহিলে তোমার

এ রূপও থাকিত না, এ সুবাসও থাকিত না, এ গর্ব্বও থাকিত না। পাপিয়সি! জানিস্ না—তুই তোর পিতৃকুলবৈরি সেই অগ্নিপিণ্ডটার অনুরাগিনী!

যুঁই। ছি! প্রাণাধিক! ও মাগীটার সঙ্গে কি অত কথা কহিতে আছে! ওটা সকাল থেকে মুখ খুলিয়া সেই অগ্নিময় নায়কের মুখপানে চাহিয়া থাকে, সেটা যে দিগে যায়, সেই দিগে মুখ ফিরাইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, এর মধ্যে কত বোলতা, ভোমরা মৌমাছি আসে, তাতেও লজ্জা নাই। অমন বেহায়া জলেভাসা, ভোমরা মৌমাছির আশা, কাঁটার বাসার সঙ্গে কথা কহিতে আছে কি?

কৃষ্ণকলি। বলি, ও যুঁই, ভোমরা মৌমাছির কথাটা ঘরে ঘরে নয় কি?

যুঁই। আপনাদের ঘরের কথা কও দিদি, আমি ত এই ফুটিলাম। ভোমরা মৌমাছির জ্বালা ত এখনও কিছু জানি না।

বৃষ্টিবিন্দু। তুমিই বা কেন বাজে লোকের কথায় কথা কও! যারা আপনারা কলঙ্কিনী, তারা কি তোমার মত অমল ধবলশোভা, এমন সৌরভ, দেখিয়া সহ্য করিতে পারে?

পদ্ম। ভাল রে ক্ষুদে! ভাল! খুব বক্তৃতা কর্‌চিস্! ঐ দেখ বাতাস আসচে!

যুঁই। সর্ব্বনাশ! কি বলে যে!

বৃষ্টিবিন্দু। তাই ত! আমার আর থাকা হইল না।

যুঁই। থাক না!

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে পারিব না। বাতাস আমাকে ঝরাইয়া দিবে।—আমি উহার বলে পারি না।

যুঁই। আর একটু থাক না।

[বাতাসের প্রবেশ]

বাতাস। (বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি) নাম্!

বৃষ্টিবিন্দু। কেন মহাশয়!

বাতাস। আমি এই অমল কমল সুশীতল সুবাসিত ফুল্লকলিকা লইয়া ক্রীড়া করিব! তুই সেটা অধঃপতিত, নীচগামী, নীচবংশ—তুই এই সুখের আসনে বসিয়া থাকিবি। নাম্!

বৃষ্টিবিন্দু। আমি আকাশ থেকে এয়েছি।

বাতাস। তুই বেটা পার্থিবংশনি—নীচগামী—খালে বিলে খানায় ডোবায় থাকিস্—তুই এ আসনে? নাম্।

বৃষ্টিবিন্দু। যূথিকে। আমি তবে যাই?

যুঁই। থাক না।

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে দেয় না যে।

যুঁই। থাকনা—থাকনা—থাকনা।

বাতাস। তুই অত ঘাড় নাড়িস কেন?

যুঁই। তুমি সর।

বাতাস। আমি তোমাকে ধরি, সুন্দরি!

[যূথিকার সরিয়া সরিয়া পলায়নের চেষ্টা।]

বৃষ্টিবিন্দু। এত গোলযোগে আর থাকিতে পারি না।

যুঁই। তবে আমার যা কিছু আছে, তোমাকে দিই, ধুইয়া লইয়া যাও।

বৃষ্টিবিন্দু। কি আছে?

যুঁই। একটু সঞ্চিত মধু—আর একটু পরিমল।

বাতাস। পরিমল আমি নিব—সেই লোভেই আমি এসেছি। দে—

[বায়ুকৃত পুষ্প প্রতি বল প্রয়োগ]

যুঁই।—(বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি) তুমি যাও—দেখিতেছ না ডাকাত!

বৃষ্টিবিন্দু। তোমাকে ছাড়িয়া যাই কি প্রকারে! যে তাড়া দিতেছে, থাকিতেও পারি না—যাই—যাই—যাই—

[বৃষ্টিবিন্দুর ভূপতন।

টগর ও কৃষ্ণকলি। এখন, কেমন স্বর্গবাসী! আকাশ থেকে নেমে এয়েচ না? এখন মাটিতে শোঁষ, নরদমায় পশ, খালে বিলে ভাস—

যুঁই। (বাতাসের প্রতি) ছাড়! ছাড়!

বাতাস। কেন ছাড়িব? দে পরিমল দে!

যুঁই। হায়! কোথা গেলে তুমি অমল, কোমল, স্বচ্ছ, সুন্দর, সূর্য্য-প্রতিভাত, রসময়, জলকণা! এ হৃদয় স্নেহে ভরিয়া আবার শূন্য করিলে কেন জলকণা! একবার রূপ দেখাইয়া, স্নিগ্ধ করিয়া, কোথায় মিশিলে,

কোথায় শুদিলে, প্রাণাধিক। হায় আমি কেন তোমার সঙ্গে গেলাম না, কেন তোমার সঙ্গে মরিলাম না! কেন অনাথ, অস্নিগ্ধ পুষ্প দেহ লইয়া এ শূন্য প্রদেশে রহিলাম—

বাতাস। নে, কান্না রাখ—পরিমল দে—

যুঁই। ছাড়! নহিলে যে পথে আমার প্রিয় গিয়াছে, আমিও সেই পথে যাইব।

বাতাস। যাস্ যাবি, পরিমল দে।—হুঁ হুঁম্!

যুঁই। আমি মরিব।—মরি—তবে চলিলাম।

বাতাস। হুঁ হুম্!

[ইতি যুঁথিকার বৃন্তচ্যুতি ও ভূপতন]

বাতাস। হুঃ! হায়! হায়!

যবনিকা পতন।

EPILOGUE

প্রথম শ্রোতা। নাটককার মহাশয়! এ কি ছাই হইল!

দ্বিতীয় ঐ। তাইত! একটা যুঁই ফুল নায়িকা, আর এক কোটা জল নায়ক। বড় ত Drama!

তৃতীয় ঐ। হতে পারে, কোন Moral আছে। নীতিকথা মাত্র।

চতুর্থ ঐ। না হে—এক রকম Tragedy.

পঞ্চম ঐ। Tragedy না একটা Farce?

ষষ্ঠ ঐ। Farce না—Satire—কাহাকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করা হইয়াছে।

সপ্তম ঐ। তাহা নহে। ইহার গূঢ় অর্থ আছে। ইহা পরমার্থ বিষয়ক কাব্য বলিয়া আমার বোধ হয়। "বাসনা" বা তৃষ্ণা" নাম দিলেই ইহার ঠিক নাম হইত। বোধ হয়, গ্রন্থকার ততটা ফুটিতে চান না।

অষ্টম ঐ। এ একটা রূপক বটে। আমি অর্থ করিব?

প্রথম ঐ। আচ্ছা, গ্রন্থকারই বলুন না কি এটা।

গ্রন্থকার। ও সব কিছুই নহে। ইহার ইংরাজী Title দিব—A true and faithful account of a lamentable Tragedy which occurred in a flower-plot on the evening of the 19*th* July, 1885 Sunday, and of which the writer was an eye-witness!"

সংসার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসারের কথা।

প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি হইয়াছে। চন্দ্রের নির্ম্মল শীতল কিরণে সুন্দর তালপুখুর গ্রাম সুপ্ত রহিয়াছে। বড় বড় তালবৃক্ষসার আকাশপটে অন্ধকারময় ও বিস্ময়কর ছবির ন্যায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। গ্রামের চারিদিকে প্রচুর ও সুন্দর বাঁশ ঝাড়ের সুচিক্কণ পত্রের উপর সুপ্ত চন্দ্রকিরণ রহিয়াছে, পুষ্করণীর ঈষৎ কম্পমান জলের উপর চন্দ্রালোক সুন্দর খেলা করিতেছে, গৃহস্থের প্রাঙ্গণে, প্রাচীরে ও তৃণাচ্ছাদিত ঘরের চালের উপর সেই সুন্দর আলোক যেন রূপার চাদর বিছাইয়া দিয়াছে। সমস্ত সুপ্ত গ্রামের উপর চাঁদের আলোক যেন যূঁই ফুলের ন্যায় ফুটিয়া রহিয়াছে। গৃহস্থগণ অনেকেই খাওয়া দাওয়া করিয়া কবাট বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছেন, কেবল কোথাও কোথাও কোন নিদ্রাহীন বৃদ্ধ বাহিরের প্রাঙ্গনে বসিয়া এখনও ধূম পান করিতেছেন, আর কোথাও বা অল্পবয়স্কা গৃহস্থবধূ এখনও বাটীর পার্শ্বের পুখুরে বাসন মাজিতেছেন, সংসারের কায এখনও শেষ হয় নাই। নৈশ-বায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, আর দূর হইতে কোন প্রফুল্লমনা কৃষকের গান সেই বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে শুনা যাইতেছে।

বিন্দু সংসার কার্য্য শেষ করিয়া এখনও স্বামী আসেন নাই বলিয়া উদ্বিগ্ন মনে সেই শুইবার ঘরের রকে বসিয়া রহিয়াছেন, নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ তাঁহার শুভ্রবসন ও শান্তনয়নের উপর পড়িয়াছে। সুধা আজ শুইতে যাইবে না, হেমচন্দ্রকে সন্ন্যাসী সাজাইবে স্থির করিয়াছে, কিন্তু বালিকা ভগিনীর পার্শ্বে সেই রকে একটু শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল, তাহার কুসুমরঞ্জিত পাট তাহার অাঁচলেই রহিল। নিদ্রাতেও সে সুন্দর ফুটন্ত বিম্বফলের ন্যায় ওষ্ঠ দুটী হাস্যবিস্ফারিত, বোধ হয় বালিকা এই সুন্দর সুশীতল রজনীতে কোনও সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

ক্ষণেক পর বাহিরের কবাটে শব্দ হইল, বিন্দু তাহাই প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ গিয়া খুলিয়া দিলেন, হেমচন্দ্র বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

হেমচন্দ্রের বয়স চতুর্ব্বিংশ বৎসর হইয়াছে, তাঁহার শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, ললাট উন্নত ও প্রশস্ত, মুখমণ্ডল শ্যাম বর্ণ কিন্তু সুন্দর, নয়ন দুটী অতিশয় তেজব্যঞ্জক। অনেক পথ হাঁটিয়া আসিয়াছেন সুতরাং তাঁহার মুখ শুখাইয়া গিয়াছে, শরীরে ধূলি লাগিয়াছে, পা দুটী ধুলায় ভরিয়া গিয়াছে। বিন্দু সযত্নে তাঁহাকে একখানি চৌকি আনিয়া দিলেন, এবং পা ধুইবার জল ও গামছা আনিয়া দিলেন; হেম হাত মুখ ধুইলেন।

বিন্দু। "তোমার আসিতে এত রাত্রি হইল? এখনও খাওয়া দাওয়া হয় নাই?"

হেম। "আমি সন্ধ্যার সময়ই আসিতাম, তবে কাটওয়ার একটী পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হইল, তিনি বৈকালে আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন, উপরোধ করিয়া কিছু জলখাবার খাওয়াইলেন, সেই জন্য এত দেরি হইল। তা তোমরা খাইয়াছ ত?"

বিন্দু। "সুধা খাইয়া ঘুমাইয়াছে, আমি খাব এখন। তুমি ত বৈকালে জল খাইয়াছ আর কিছু খাও নাই, তবে ভাত এনে দি।"

হেম। "আমার বিশেষ ক্ষুধা পায় নাই, তবে ভাত নিয়ে এস, আর রাত্রি করার আবশ্যক নাই।"

বিন্দু সেই রকে একটু জল ছিটাইয়া আসন পাতিলেন, পরে রান্নাঘর হইতে থালে করিয়া ভাত আনিয়া দিলেন। খাবার সামান্য, ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, ও বাড়ীতে উচ্ছে ও লাউ হইয়াছে তাহাই ভাজা ও তরকারি। আর গাছে নেবু হইয়াছিল বিন্দু তাহা কাটিয়া রাখিয়াছিলেন, গাছ হইতে দুইটী ডাব পাড়িয়া তাহা শীতল করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং বাড়ীতে গাভী ছিল তাহার দুগ্ধ ঘন করিয়া রাখিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র আহারে বসিলেন, বিন্দু পার্শ্বে বসিয়া পাখা করিতে লাগিলেন।

হেম। "খোকার জন্য একটা অষুধ আনিয়াছি, সেটা এখন খাওয়াইও না, রাত্রিতে যদি ঘুম ভাঙ্গে, যদি কাঁদে, তবে খাওয়াইও। আর যে চেষ্টায় গিয়াছিলাম তাহার বড় কিছু হইল না।"

বিন্দু। "কি হইল ?"

হেম। "কাটওয়াতে আমার পরিচিত একটী উকিল আছেন আমি তাঁহার কাছে তোমার বাপের জমীর কথা বলিলাম, এবং সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া বলিলাম।"

বিন্দু। "তার পর ?"

হেম। "তিনি বলিলেন মকদ্দমা ভিন্ন উপায় নাই।"

বিন্দু। "ছি! জেঠা মশাইয়ের সঙ্গে কি মকদ্দমা করে? তিনি যাহা হউক ছেলে বেলা আমাকে মানুষ করিয়াছিলেন, আমার বে দিয়েছেন, জেঠাই মা এখনও আমাদের জিম্মি টিনিষ পাঠিয়ে দেন, তাঁদের সঙ্গে কি মকদ্দমা করা ভাল ?"

হেম। "আমাদের বিবাহের জন্য আমরা তোমার জেঠা মহাশয়ের নিকট বড় ঋণী নই; কিন্তু তুমি তখন ছেলে মানুষ ছিলে সে সব কথা বড় জান না, জানিবার আবশ্যকও নাই। তথাপি তিনি তোমার জেঠা, এই জন্যই তাঁহার সহিত বিবাদ করা ইচ্ছা নাই, কেবল অগত্যা করিতে হয়।"

বিন্দু। "ছি! সে কাযটা কি ভাল হয়? আর দেখ আমরা গরিব লোক আমাদের কি মকদ্দমা পোষায়? আমরা গরিবের মত যদি থাকিতে পারি, দুবেলা দুপেট যদি খেতে পাই, ভগবানের ইচ্ছায় যদি ছেলে দুটীকে মানুষ করিতে পারি, তাহা হইলেই ঢের হইল। তোমার যে জমি জমা আছে তাহাতেই আমাদের গরিবের সোণা ফলে, তোমার পৈতৃক বাড়ীই আমার সাত রাজার ধন।"

হেম। "আমি যখন তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, এরূপ কষ্টে চিরকাল জীবন যাপন করিবে তাহা মনে করি নাই। তুমি সহিষ্ণু, সাধ্বী, পতিব্রতা, এত কষ্ট সহ্য করিয়া তুমি মুখ ফুটে একটী কথা কও না সে তোমারই গুণ, কিন্তু আমি তাহা চক্ষে দেখিতে পারি না।"

বিন্দুর চক্ষে জল আসিল। মনে মনে ভাবিলেন, "পথের কাঙ্গালীকে কোলে করিয়া লইয়া স্বর্গে স্থান দিয়াছ সেটা কি ভুলে গেলে ?" প্রকাশ্যে একটু হাসিয়া বলিলেন, "কেন এমন ঘর বাড়ী, এখানে রাজার উপাদেয় দ্রব্য

পাওয়া যায়, ইহাতে আমাদের অভাব কিসের? একটী রাজার উপাদেয় জিনিস দেখিবে?"

হেম একটু হাসিয়া বলিলেন "কৈ দেখি।"

হেম উঠিয়া রান্নাঘরে গেলেন। সেই দিন গাছের কচি কচি আঁব পাড়িয়া তাহার অম্বল করিয়াছিলেন, স্বামীর সম্মুখে পাথর বাটীটী রাখিয়া বলিলেন "একবার খেয়ে দেখ দেখি।"

হেম হাসিয়া অম্বল ভাতে মাখিলেন। খাইয়া সহাস্যে বলিলেন, "হাঁ। এ রাজার উপাদেয় দ্রব্য বটে, কিন্তু সে আমাদের এ রাজ্যের গুণ নহে, রাজরাণীর হাতের গুণ।"

ক্ষণেক পর হেম আবার বলিলেন, "আমি সত্য বলিতেছি জেঠা মহাশয়ের সহিত মকদ্দমা করিবার আমার ইচ্ছা নাই, কিন্তু তিনি তোমার পৈতৃক ধন কাড়িয়া লইবেন, আমাদিগকে দরিদ্র বলিয়া তুচ্ছ করিবেন তাহা আমি কখনই সহ্য করিব না। আমি দরিদ্র কিন্তু আমি অন্যায় সহ্য করিতে পারি না।"

বিন্দু। "তবে এক কাজ কর দেখি। ঐ ভাত কটি এই ঘন দুদ দিয়া খেয়ে নাও দেখি, তা হইলে গায়ে জোর হবে, তাহার পর কোমর বেঁধে লড়াই করিও।"

হেমচন্দ্র যুদ্ধের সেই উদ্যোগ করিলেন, আবার গাভীদুগ্ধের অথবা রাজ্ঞীর রন্ধন নৈপুন্যের প্রশংসা করিলেন। তখন বিন্দু বলিলেন,

"আচ্ছা, জেঠা মশাইয়ের সঙ্গে এ বিষয়টা মিটাইয়া ফেলিলে ভাল হয় না? গ্রামেও পাঁচ জন ভদ্রলোক আছেন।"

হেম। "সে চেষ্টাও করিয়াছিলাম। তোমার জেঠা মহাশয় বলেন যে জমিতে তাঁহারই সত্ব আছে, তিনি এখন দশ বৎসর অবধি জমীদারকে খাজনা দিতেছেন, তিনি অর্থব্যয় করিয়া জমির উন্নতি করিয়াছেন, এবং জমীদারের সেরেস্তায় আপনার নাম লিখাইয়াছেন, এখন তিনি এ জমি হাতছাড়া করিবেন না। তবে তোমাকে ও সুধাকে কিছু নগদ অর্থ দিতে সম্মত আছেন, তাহা জমির প্রকৃত মূল্য নহে, অর্দ্ধেক মূল্য অপেক্ষাও অল্প। কেবল আমরা দরিদ্র, এই জন্য তিনি এরূপ অন্যায় করিতেছেন।"

বিন্দু। "আমি মেয়ে মানুষ, তুমি যতদূর এ সব বিষয় বুঝ আমি ততদূর পারি না, কিন্তু আমার বোধ হয় তিনি যাহা দিতে চাহেন তাতেই স্বীকার হওয়া ভাল। তিনি আমাদের গুরু, এক সময়ে আমাকে পালন করিয়াছিলেন, যদি কিছু অল্প মূল্যেই তাঁহাকে একটা জিনিস দিলাম তাতেই বা ক্ষতি কি? আর দেখ, মকদ্দমা করিলে আমাদের বিস্তর খরচ, কর্জ্জ করিতে হইবে, তাহা কেমন করিয়া পরিশোধ করিব? যদি মকদ্দমায় জমি পাই তাহা হইলে ঋণ পরিশোধ করিতে সে জমি বিক্রয় হইয়া যাইবে, আর জেঠা মশাই চিরকাল আমাদের শক্র থাকিবেন। আর যদি মকদ্দমায় হারি, তবে এ কুল ও কুল দুকুল গেল। তিনি যদি কিছু অল্প মূল্যই দেন, না হয় আমরা কিছু অল্পই পাইলাম, গোলমালটা এই খানেই শেষ হয়। আমি মেয়ে মানুষ, ও সব গোলমাল বুঝি না, মকদ্দমা বড় ভয় করি, সেই জন্যই এরূপ বলিলাম; কিন্তু তুমি রাগ না করিয়া বেশ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ, শেষে যেটা ভাল বোধ হয় সেইটে কর।"

হেমচন্দ্র আহার সমাপন করিলেন, এক ঘটি জল খাইলেন, অনেকক্ষণ বিবেচনা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,

"তোমার ন্যায় মেয়ে মানুষ যাহার বন্ধু সে এ জগতে ভাগ্যবান্। আমি তোমার সহিত পরামর্শ না করিয়া যে উকিলের নিকট গিয়াছিলাম সে আমার মূর্খতা। তোমার পরামর্শটি উৎকৃষ্ট। আমি এই পরামর্শই গ্রহণ করিলাম, জেঠা মহাশয় বাড়ী আসিয়াছেন, কল্যই আমি এ বিষয় নিষ্পত্তি করিব। আর পুনরায় যখন কোন পরামর্শের আবশ্যক হইবে, এই ঘরের বৃহস্পতির সহিত আগে পরামর্শ করিব।"

বিন্দু সহাস্যে বলিলেন, "তবে বৃহস্পতির আর একটী পরামর্শ গ্রহণ কর।"

হেম। "কি বল, আমি কিছুই অস্বীকার করিব না।"

বিন্দু। "ঐ বাটীতে যে দুধটুকু পড়িয়া আছে সেটুকু চুমুক দিয়ে খাও দেখি।"

হেমচন্দ্র অগত্যা বৃহস্পতির এই দ্বিতীয় পরামর্শটীও গ্রহণ করিলেন, পরে আসন ত্যাগ করিয়া আচমন করিলেন।

বিন্দু তখন হেমচন্দ্রের জন্য শয্যা রচনা করিয়া দিলেন, হাতে একটী পান দিলেন, এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই শয্যায় স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া সাংসারিক কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হেমচন্দ্র সেই স্নেহময়ীকে আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া সস্নেহে চুম্বন করিয়া বলিলেন "যাও, অনেক রাত্রি হইয়াছে, তুমি খাওয়া দাওয়া কর গিয়ে।" জগতের মধ্যে সৌভাগ্যবতী বিন্দুবাসিনী তখন উঠিয়া পাকগৃহে আহারাদি করিতে গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চাষবাসের কথা।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। ঊষা তরুণী-গৃহিণীর ন্যায় সংসার কার্য্যের জন্য জগতে সকলকে উঠাইলেন, সকলকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করিলেন। মাতা যেরূপ কন্যাকে সুন্দর রূপে সাজাইয়া দেয়, সেই রূপ সুন্দর সাজ পরিধান করিয়া ঊষা আকাশে দর্শন দিলেন। হাস্যমুখী তরুণীর প্রণয়াভিলাষে প্রণয়ী সূর্য্য অচিরেই উদিত হইলেন, ঊষার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন! তাঁহার উজ্জ্বল কিরণ রূপ সপ্ত অশ্ব রথে সংযোজিত করিয়া সেই জলন্তকেশী সবিতা আকাশমার্গে ধাবমান হইলেন, আকাশ আলোকে পূর্ণ করিলেন, জগতে সংজ্ঞাশূন্যকে সংজ্ঞা দান করিলেন, রূপ-শূন্যকে রূপ দান করিলেন। ঊষা ও সূর্য্যোদয়ের শোভায় বিস্মিত হইয়া চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের প্রাচীন ঋগ্বেদের ঋষিগণ এইরূপ সুন্দর কল্পনা দ্বারা সে শোভাটি বর্ণন করিয়া গিয়াছেন;—সেরূপ সরল, সুন্দর এবং প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ কবিত্ব তাহার পর আর রচিত হয় নাই!

হেমচন্দ্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলেন এবং বাটী হইতে বাহির হইলেন। গ্রামের বৃক্ষ পত্র ও কুটীর গুলি সূর্য্যের লোহিত আলোকে শোভা পাইতেছিল, গ্রাম্য পুষ্প গুলি বৃক্ষে ঝোপে বা জঙ্গলে ফুটিয়া রহিয়াছে, এবং প্রাতঃকালের পাখী গুলি নানাদিক হইতে রব করিতেছে।

গৃহস্থের মেয়েরা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ঘর দ্বার ও প্রাঙ্গন ঝাঁট দিয়া পুখুর হইতে কলস করিয়া জল আনিতেছে অথবা রন্ধনাদি আরম্ভ করিতেছে। বালকগণ পাঠশালায় বা খেলায় যাইতেছে, কৃষকগণ লাঙ্গল ও গরু লইয়া মাঠের দিকে যাইতেছে। হেমচন্দ্রও আজি নিজের জমিখানি দেখিতে যাইবেন মানস করিয়াছিলেন।

ছায়াপূর্ণ গ্রাম্য পথ দিয়া কতকদূর আসিয়া হেমচন্দ্র একজন কৃষকের বাড়ীর সম্মুখে পঁহুছিলেন ; কৃষকের নাম সনাতন কৈবর্ত্ত।

সনাতন কৈবর্ত্তের একখানি উচ্চ ভিটিওয়ালা ঘর ছিল, তাহার পার্শ্বে একখানি ঢেঁকির ঘর ও একখানি গোয়াল ঘর, তথায় ৪।৫টি গরু ছিল। উঠানেই উনুন, পার্শ্বে একখানি চালা আছে, বৃষ্টি বাদলের দিন সেই চালার ভিতর রান্না হয়, নচেৎ খোলা উঠানে। সম্মুখে কতকগুলা কাঁটা গাছ ও জঙ্গল, এক স্থানে একটা বড় খানা আছে তাহাতে বৎসরের গোবর সঞ্চিত হয়, চাষের সময় উপকার লাগে। গোয়াল ঘরের পাশে গাড়ীর দুখানা চাকা ও খান দুই লাঙ্গল পড়িয়া আছে, এবং বাড়ীর পশ্চাতে একটা ডোবার ন্যায় ময়লা পুখুর আছে। আমাদের বলিতে লজ্জা করে যে এক্ষণকার নূতন মিউনিসিপাল আইন ও নিম্ন শিক্ষা সত্ত্বেও সনাতনের প্রণয়িনী এই ডোবাতেই যে কেবল বাসন ধুইতেন এমন নহে, তাঁহার স্নান ও কাপড়কাচাও এইখানে হইত, এবং তাঁহার হৃদয়েশ্বরের পানের জল ও সংসারের রান্নার জলও এই পুখুরের।

হেমচন্দ্র আসিয়া সনাতনকে ডাকিলেন। সনাতনের তখন নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তবে গাত্রোত্থান রূপ মহৎ কার্য্যের উদ্যোগ পর্ব্বে রত ছিল, দুই একবার এ পাশ ও পাশ করিতেছিল, দুই একবার হস্ত বিস্তার করিয়া হাই তুলিতেছিল, আর কখন কখন পার্শ্বে শয়ানা সহধর্ম্মিণীর সহিত, "পোড়ামুখী এখনও উঠ্‌লিনি, এখনও মাগীর ঘুম ভাঙ্গল না বুঝি" ইত্যাদি মিষ্টালাপ করিতেছিল এবং আলস্য বড় দোষ এই নীতি বাক্যটী প্রকটিত করিতেছিল। এই নৈতিক বক্তৃতার মধ্যে সনাতন হেমচন্দ্রের ডাক শুনিল।

গলাটা মহাজনের গলার ন্যায়, অতএব বুদ্ধিমান সনাতন সহসা উঠিল না। আবার ডাক,—তৃতীয় বার ডাক, সুতরাং সনাতন কি করে, একটা

উপায় করিতে হইল। বিপদ আপদে সনাতনের একমাত্র উপায় তাহার গরীয়সী সহধর্ম্মিণী, অতএব তাহাকেই একটু অনুনয় করিয়া বলিল, "এই দরজাটা খুলে উঁকি মেরে দেখ্‌ত কে এসেছে। যদি হারাণ সিকদার মহাজন হয় তবে বলিস্‌ বাড়ী নেই।" সনাতনের প্রণয়িনী প্রিয় স্বামীর "পোড়ারমুখী" প্রভৃতি মিষ্টালাপ শুনিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, এখন সময় পাইলেন। স্বামীর কথাটী শুনিয়া আস্তে ২ পাশ ফিরিয়া শুইলেন। একটী হাই তুলিয়া সনাতনের দিকে পেছুন করিয়া অসংকুচিত চিত্তে আর একবার নিদ্রা গেলেন।

সনাতন দেখিল বড় বিপদ, অথচ আপনি সহসা বাহির হইতে পারে না, কি করে? দুই এক বার প্রণয়িনীকে ডাকিল, কোন উত্তর নাই, একবার টানিল, সাড়া নাই, একবার ঠেলা দিল, তথাপি চৈতন্য হইল না! সকল যত্ন ব্যর্থ গেল, সকল বাণ কাটা গেল, তখন বীরপুরুষ একেবারে রোষে দণ্ডায়মান হইয়া রিক্ত হস্তে যুঝিবার উদ্যম করিল। বলিল "এত বেলা হলো এখনও মাগীর উঠা হইল না, এত ডাকাডাকি করিলাম তবুও হারামজাদীর সাড়া নাই, এবার সাড়া করাচ্চি, দুটো গুঁতো দিলেই ঠিক হবে।"

সনাতনপত্নী দেখিলেন আর মৌন অস্ত্র খাটে না, এখন অন্য অস্ত্র না ধারণ করিলে বড় বিপদ। অতএব তিনিও একবার বিছানায় উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন "কি হয়েছে কি? সকাল থেকে উঠে বাপ মা তুলে গাল দিচ্ছ কেন, মাতাল হয়েছ না কি?—দেখ না, মিনসের মরণ আর কি!" বিধুমুখী এইরূপে স্বামীর দীর্ঘায়ু বাঞ্ছা করিয়া পুনরায় পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

সে তীব্র স্বর শ্রবণে ও আরক্ত নয়ন দর্শনে সনাতনের বীর হৃদয় বসিয়া গেল, তথাপি সহসা কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধ ত্যাগ করিল না।

সনাতন। "বলি আবার শুলি যে!"

স্ত্রী। "শোব না?"

সনাতন। "ঘরের কাজ কর্ম্ম করিতে হবে না?"

স্ত্রী। "হবে না?"

সনাতন। "জল আনবিনি?"

স্ত্রী। "আনবো না।"

সনাতন। "রান্না চড়াবি নি?"

স্ত্রী। "চড়াব না।"

সনাতন। তবে আবার শুলি যে?"

স্ত্রী। "শোব না?"

সনাতন। "তবে ঘরকন্না করবে কে?"

স্ত্রী। "তা আমি কি জানি? আমি পোড়ারমুখী, আমি হারামজাদী, আমার বাপ হারামজাদা, আমাব ঠাকুরদাদা হারামজাদা, 'আমি আব ঘরকন্না করে কি হবে? আর একটী ভাল দেখে ডেকে আনগে।"

সনাতন। "না, বলি রাগ কল্লি না কি?"

স্ত্রী। "রাগ আবার কিসের?" বলিযা গৃহিণী আর একবার পাশ ফিরিয়া শুইলেন, আর একটি হাই তুলিয়া দীর্ঘ নিদ্রার সূচনা করিতে লাগিলেন।

সনাতন তখন পরাস্ত হইল; তখন বিধুমুখীর হাতে পায়ে ধরিয়া ঘাট মানিয়া অনেক মিনতি করিয়া উঠাইল। সেই অব্যর্থ সাধনে বিধুমুখীর কোপের কিঞ্চিৎ উপশম হইল এবং তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। মনে মনে হাসিতে হাসিতে মুখে রাগ দেখাইয়া বলিলেন,

"এখন কি করিতে হবে বল। এমন লোকেরও ঘর করিতে মানুযে আসে। গালাগালি না দিলে রাত্রি প্রভাত হয় না।"

সনাতন। "না গালি দিলাম কৈ, একটীবার আদর করে পোড়ারমুখী বলেছি বইত নয়, তা আর বলবো না।"

স্ত্রী। "না কিছু বল নাই, আমাব আদর সোহাগে কায নাই, কি করিতে হবে বল।"

সনাতন। "বলি ঐ দরজায় কে ডাকাডাকি করচে, একবার গিয়ে দেখ্ না; যদি হারাণ সিকদার হয় তবে বলিস আমি বাড়ী নেই।"

তখন বিধুমুখী গাত্রোত্থান করিলেন, তাঁহার বিশাল শরীর খানি তুলিলেন। মুখখানি একখানি মধ্যমাকৃতির কাল পাথরের থালার ন্যায়, সেইরূপ প্রশস্ত, সেইরূপ উজ্জ্বল বর্ণ। শরীরখানি বেশ নাদশ নোদশ, স্থূলাকার, গোলাকার পৃথিবীর ন্যায়। পা দুখানি মাটিতে পড়িলে পৃথিবী তাহার সুন্দর

চিহ্ন অনেক ক্ষণ ধারণ করিতে ভাল বাসিতেন। বাহু দুই খানি দেখিয়া সনাতনের মনে মনে ভয় সঞ্চার হত, কোন্ দিন এই রমণীরত্বের প্রিয় আলিঙ্গনে বা আমার শ্বাসরোধ হইয়া অপঘাৎ মৃত্যু হয়। দীর্ঘে বর বড় না কনে বড় দর্শকের কিছু সন্দেহ হইত, পার্শ্বে কনেটী তিনটী সনাতন।

গরীয়সী বামা দরজা একটু খুলিয়া মধুর স্বরে বলিলেন "কে গা"।

হেম "আমি এসেছি গো। সোনাতন বাড়ী আছে"।

মনিবকে দেখিয়া সোনাতনের স্ত্রী তখন ব্যগ্র ও লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া মাথায় একটু ঘোমটা দিয়া একটী কাঠের চৌকি লইয়া বাবুকে বসিতে দিলেন ও সনাতনকেও ডাকিয়া দিলেন।

সনাতন তখন নির্ভয়ে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিল, দণ্ডবৎ হইয়া বলিল,

"আজ্ঞে আমরা ঘুমিয়ে ছিলুম, তা আপনাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়েছে।"

হেম। "তা হোক, এখন চল মাঠে যেতে হবে, ক্ষেতখানা দেখিতে হবে। কৈ তোমার লোক কৈ"।

সোনাতন। "আজ্ঞে জন ঠিক করেছি, এই চলুম বলে। আপনি অনেকটা পথ চলিয়া এসেছেন একটু দুধ খাবেন কি"।

হেম। "না আবশ্যক নাই"।

সনাতন "না একটু খান, আমাদের বাড়ীর গরুর দুধ একটু খান। এই বলিয়া সনাতন দুধ দুইতে গেল, তাহার স্ত্রী পাথর বাটী আনিল।

দোয়া হইলে সনাতনের স্ত্রী একটু ঘোমটা দিয়া একটী ছেলে কোলে করিয়া এক বাটী গরম দুধ বাবুর কাছে আনিয়া ধরিল। হেম সানন্দচিত্তে সেই কৃষকের ভক্তিদত্ত দুগ্ধ পান করিলেন।

সনাতনও লোককে ডাকাডাকি করিয়া হাজির করিয়া দুই খানি হাল ও চারিটী বলদ লইয়া প্রস্তুত হইল। সকলে ক্ষেতের দিকে চলিল। পথে অন্যান্য কথা হইতে২ সনাতন বলিল "তা বাবু এত কষ্ট করিয়া যাবেন কেন, আমি আপনার জমি দুটা চাষ দিয়াছি আর একটা চাষ দিলেই

হয়, আজ সব হইয়া যাবে, তারপর কাল ধান বুনে দিব। আপনি আর কষ্ট করেন কেন?"

হেম "না আমি অনেক দিনে অবধি আমার জমিটা দেখি নাই তোরা কি কচ্ছিস না কচ্ছিস একবার দেখা ভাল, তাই আজ সকালে মনে করিলাম একবার আসি।"

সনাতন। "তা দেখুন না, আপনার জিনিস দেখ্‌বেন না? জমিটী ভাল, ধান বেশ হয়, তবে আপনারা ভদ্রলোক, জন খাটিয়ে চাষ করাতে হয় তাই বোধ হয় আপনাদের তত লাভ হয় না।"

হেম। "সামান্যই লাভ হয়। তোমাদের জন মজুরদের দিয়ে বেশি থাকে না। গেল বার বুঝি ২০০।২৫০ মন ধান হইয়াছিল কিন্তু তোদের দিয়ে, বিচ খরচ দিয়ে জমীদারের খাজনা দিয়ে ১০০ টাকার বড় বেশি ঘরে উঠে নাই।"

সনাতন। "তা বাবু যে একবার বলেছিলেন, জমিটা ভাগে দিবেন, তা কি এখন ইচ্ছা আছে? যদি দেন তবে আমাকেই দিবেন, আমি আপনার বাড়ীর চাকর, আপনার বাপের আমল থেকে ঐ জমি করিতেছি। আপনাকে কোনও কষ্ট পেতে হবে না, কিছু দেখ্‌তে হবে না, আমি নিজের খরচে চাষবাস করিব, আমার হাল গরু সবই আছে, বছরের শেষে অর্দ্ধেক ধান মাপিয়া গাড়ী করিয়া আপনার বাড়ীতে পঁহুছিয়া দিব।"

হেম। "কেন বল দেখি, তোর ভাগ নেবার এত ইচ্ছা কেন"?

সনাতন। "আজ্ঞে আপনি ত জানেন আমার এক খানি নিজের ছোট জমি আপনার জমির পাশে আছে, কিন্তু ৮।১০ কুড়ো—তাহাতে পেট ভরে না, আপনাদের কাছে মজুরি করিয়া যা পাই তাহাতে আমার চলে। তবে যদি আপনার জমিটা ভাগে পাই তবু লোকের কাছে বলিতে পারিব এতটা জমি ভাগে করি। আর আপনাদের যত খরচ হয়, আমরা ছোট লোক আমাদের চাষে তত খরচ হবে না, দুই পয়সা পাব, ছেলেগুলি খেয়ে বাঁচবে"।

হেম।" তা আচ্ছা দেখা যাক কি হয়। তুই এখন ত আমার জমিটা বুনে দে, তার পর যাহা হয় করিব এখন"।

এই রূপ কথাবার্ত্তা করিতে করিতে হেমচন্দ্র ও সনাতন ও সনাতনের লোক জন গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাঠে গিয়া পড়িলেন।

বৈশাখ মাসের দুই একটী বৃষ্টির পর সকল জমিই চাষ হইতেছে। প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে কৃষকগণ আনন্দে গান করিতে করিতে অথবা গরুকে নানা রূপ প্রণয়সূচক কথায় উত্তেজিত করিতে ২ চাষ দিতেছে। ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র, বঙ্গ দেশের উর্ব্বরা ভূমির অন্ত নাই, তাহাই বঙ্গালীদিগের প্রাণ সর্ব্বস্ব। জমির পার্শ্বস্থ আইলের উপর দিয়া অনেক জমি পার হইয়া অনেক কৃষককে কৃষি কার্য্যে দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্র নিজ জমির দিকে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু অদ্যও তাঁহার জমি দেখা হইল না, পথে তিনি সহসা তাঁহার শ্বশুর মহাশয় তারিণী বাবুকে দেখিতে পাইলেন। তারিণী বাবু পূর্ব্বদিন কার্য্য বশতঃ অন্য গ্রামে গিয়াছিলেন, অদ্য প্রত্যূষে বাটী ফিরিয়া আসিতে ছিলেন। হেমচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন, তিনিও আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "এ কি বাবা, এখানে মজুরের সঙ্গে কোথায় যাইতেছ এস ঘরে এস। তবে ভাল আছ? আমি প্রত্যহই মনে করি তোমাকে একবার ডেকে খাওয়াই, তবে কি জান বর্দ্ধমান থেকে ছুটী নিয়ে এসে অবধি নানা বিষয় কার্য্যে বিব্রত, আর শরীর ও ভাল নাই, আর ছেলেগুলকে টিক টিক করে বলি তোমাকে এক বার নিমন্ত্রণ করে আসবে তা যদি তারা ঘরথেকে একবার বেরয়। তা তুমি একদিন এস না, খাওয়া দাওয়া করিও"

হেমচন্দ্র শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে ফিরিলেন। বলিলেন, "আজ্ঞে তা যাব বৈ কি, আমিও মনে করেছিলুম আজ কালের মধ্যে একদিন দেখা করি, কিছু আবশ্যক আছে। মহাশয়ের যদি অবকাশ থাকে তবে আজই সন্ধ্যার সময় আসিব।"

তারিণী। "তা তুমি ঘরের ছেলে আবার অবকাশ অনবকাশ কি, যখন আসিবে তখনই দেখা হবে। বাছা উমাতারা শ্বশুর বাড়ী হইতে এসেছে সেও কতবার বলেছে, বাবা একবার হেম বাবুকে নেমতন্ন কর না, আর গিন্নী ও তোমার কথা কত বলেন। তা আসবে বৈ কি, এস না আজ সন্ধ্যার সময় এসো, কিছু জলযোগ করিও"।

এইরূপ কথা বার্ত্তা করিতে ২ উভয়ে একত্রে গ্রামে আসিলেন

কৃষ্ণচরিত্র।
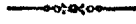
নিশীথকালে যজ্ঞাগারে জরাসন্ধ স্নাতক বেশধারী তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। এখানে কিছুই প্রকাশ নাই যে তাঁহারা জরাসন্ধের পূজা গ্রহণ করিলেন কি না। আর এক স্থানে আছে। মূলের উপর আর একজন কারিগরি করায় এই রকম গোলযোগ ঘটিয়াছে।

তৎপরে সৌজন্য বিনিময়ের পর জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "হে বিপ্রগণ! আমি জানি স্নাতক ব্রতাচারী ব্রাহ্মণগণ সভাগমন সময় ভিন্ন কখন মাল্য * বা চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে? আপনাদের বস্ত্র রক্ত বর্ণ; অঙ্গে পুষ্পমাল্য ও অনুলেপন সুশোভিত; ভুজে জ্যাচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে; আকার দর্শনে ক্ষত্র তেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, অতএব সত্য বলুন, আপনারা কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়। কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া, নির্ভয়ে চৈতক পর্ব্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা বীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্য্য দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত বিরুদ্ধানুষ্ঠান করিতেছেন। আরও, আপনারা আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পূজা গ্রহণ করিলেন না? এক্ষণে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন বলুন।"

---

* লিখিত আছে যে মাল্য তাঁহারা একজন মালাকারের নিকট বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছিলেন। যাঁহাদের এত ঐশ্বর্য্য যে রাজসূয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত তাঁহাদের তিন ছড়া মালা কিনিবার যে কড়ি জুটিবে না, ইহা অতি অসম্ভব। যাঁহারা কপট দ্যূতাপহৃত রাজ্যই ধর্ম্মানুরোধে পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার যে ডাকাতি করিয়া তিন ছড়া মালা সংগ্রহ করিবেন, ইহা অতি অসম্ভব। এ সকল দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত। দৃপ্ত ক্ষত্রতেজের বর্ণনায় এ সকল কথা বেশ মানায়।

তদুত্তরে কৃষ্ণ স্নিগ্ধ গম্ভীরস্বরে, (মহাভারতে কোথাও দেখি না যে কৃষ্ণ চঞ্চল বা রুষ্ট হইয়া কোন কথা বলিলেন, তাঁহার সকল রিপুই বশীভূত) "হে রাজন্! তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতিই স্নাতক ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয়জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পত্তিশালী হয়। পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্ হয় বলিয়া আমরা পুষ্প ধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্, বাগ্বীর্য্যশালী নহেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদের অপ্রগল্‌ভ বাক্য প্রয়োগ করা নির্দ্ধারিত আছে।"

কথা গুলি শাস্ত্রোক্ত ও চতুরের কথা বটে, কিন্তু কৃষ্ণের যোগ্য কথা নহে, সত্যপ্রিয়, ধর্ম্মাত্মার কথা নহে। কিন্তু যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে এই রূপ উত্তর কাজেই দিতে হয়। ছদ্মবেশটা যদি দ্বিতীয় স্তরের কবির সৃষ্টি হয়, তবে এ বাক্য গুলির জন্য তিনিই দায়ী। কৃষ্ণকে যে রকম চতুরচূড়ামণি সাজাইতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এই উত্তর তাহার অঙ্গ বটে। কিন্তু যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণ বলিয়া ছলনা করিবার কৃষ্ণের কোন উদ্দেশ্য ছিল না; ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে স্পষ্টই স্বীকার করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা শত্রু ভাবে যুদ্ধার্থে আসিয়াছেন, তাহাও স্পষ্ট বলিতেছেন।

"বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন্! যদি তোমার আমাদের বাহুবল দেখিতে বাসনা থাকে, তবে অদ্যই দেখিতে পাইবে সন্দেহ নাই। হে বৃহদ্রথনন্দন! ধীর ব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে অপ্রকাশ্য ভাবে এবং সুহৃদ্গৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আমরা স্বকার্য্য সাধনার্থ শত্রুগৃহে আগমন করিয়া তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করি না; এই আমাদের নিত্যব্রত।"

কোন গোল নাই—সব কথা গুলি স্পষ্ট। এই খানে অধ্যায় শেষ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশের গোলযোগটা মিটিয়া গেল। দেখা গেল যে ছদ্মবেশের কোন মানে নাই। তার পর, পর অধ্যায়ে কৃষ্ণ যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপে ভিন্নপ্রকার। তাঁহার যে উন্নত চরিত্র

এ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি, সে তাহারই যোগ্য। পূর্ব্ব অধ্যায়ে এবং পর অধ্যায়ে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রে এত গুরুতর প্রভেদ, যে দুই হাতের বর্ণন বলিয়া বিবেচনা করিবার আমাদের অধিকার আছে।

জরাসন্ধের গৃহকে কৃষ্ণ তাঁহাদের শত্রুগৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে, জরাসন্ধ বলিলেন "আমি কোন্ সময়ে তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছ"

উত্তরে, জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যথার্থ যে শত্রুতা তাহাই বলিলেনঃ তাঁহার নিজের সঙ্গে জরাসন্ধের যে বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উত্থাপনা করিলেন না। নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য কেহ তাঁহাব শত্রু হইতে পারে না, কেন না তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী শত্রুমিত্র সমান। তিনি পাণ্ডবের সুহৃদ এবং, কৌরবের শত্রু, এইরূপ লৌকিক বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবিক মৌলিক মহাভারতের সমালোচনে আমরা ক্রমশঃ দেখিব, যে তিনি ধর্ম্মের পক্ষ, এবং অধর্ম্মের বিপক্ষ; তদ্ভিন্ন তাঁহার পক্ষাপক্ষ কিছুই নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আমরা এখানে দেখিব যে কৃষ্ণ উপযাচক হইয়া জরাসন্ধকে আত্মপরিচয় দিলেন, কিন্তু নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য তাঁহাকে শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন না। তবে যে মনুষ্যজাতির শত্রু, সে কৃষ্ণের শত্রু। কেননা আদর্শ পুরুষ সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য প্রকার আত্মজ্ঞান নাই। তাই তিনি জরাসন্ধের প্রশ্নের উত্তরে জরাসন্ধ তাঁহার যে অপকার করিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ মাত্র না করিয়া সাধারণের যে অনিষ্ট করিয়াছে, কেবল তাহাই বলিলেন। বলিলেন যে তুমি রাজগণকে মহাদেবের নিকট বলি দিবার জন্য বন্দী করিয়া রাখিয়াছ। তাই, যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে, আমরা তোমার প্রতি সমুদ্যত হইয়াছি। শত্রুতাটা বুঝাইয়া দিবার জন্য কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিতেছেন,—

"হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদিগকেও ত্বৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্ম্মচারী এবং ধর্ম্মরক্ষণে সমর্থ।"

এই কথাটার প্রতি পাঠক বিশেষ মনোযোগী হইবেন, এই ভরসায় আমরা ইহা বড় অক্ষরে লিখিলাম। এখন পুরাতন বলিয়া বোধ হইলেও,

কথাটা অতিশয় গুরুতর। যে ধর্ম্মরক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে সেই পাপের সহকারী। অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম্ম। "আমি ত কোন পাপ করিতেছি না. পরে করিতেছে, আমার তাতে দোষ কি ?" যিনি এইরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনিও পাপী। কিন্তু সচরাচর ধর্ম্মাত্মারাও তাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এইজন্য জগতে যে সকল নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা এই ধর্ম্মরক্ষা ও পাপ নিবারণ ব্রত গ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। এই বাক্যই তাহাদের জীবন-চরিতের মূল সূত্র। শ্রীকৃষ্ণেরও সেই ব্রত। এই মহাবাক্য স্মরণ না রাখিলে তাঁহার জীবনচরিত বুঝা যাইবে না। জরাসন্ধ, কংস, শিশুপালের বধ, মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা, কৃষ্ণের এই সকল কার্য্য এই মূলসূত্রের সাহায্যেই বুঝা যায়। ইহাকেই পুরাণকারেরা "পৃথিবীর ভার হরণ বলিয়াছেন। খ্রীষ্টকৃত হউক, বুদ্ধকৃত হউক, কৃষ্ণকৃত হউক এই পাপনিবারণ ব্রতের নাম ধর্ম্মপ্রচার। ধর্ম্মপ্রচার, দুই প্রকারে হইতে পারে ও হইয়া থাকে, এক বাক্যতঃ অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশের দ্বারা. দ্বিতীয়, কার্য্যতঃ অর্থাৎ আপনার কার্য্য সকলকে ধর্ম্মের আদর্শে পরিণত করণের দ্বারা। খৃষ্ট, শাক্যসিংহ, ও শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বিবিধ অনুষ্ঠানই করিয়াছিলেন। তবে শাক্যসিংহ ও খৃষ্টকৃত ধর্ম্মপ্রচার, উপদেশপ্রধান; কৃষ্ণকৃত ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য প্রধান। ইহাতে কৃষ্ণেরই প্রাধান্য কেন না, বাক্য সহজ, কার্য্য কঠিন এবং অধিকতর ফলোপধায়ক। যিনি কেবল মানুষ, তাঁহার দ্বারা ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে কি না. সে কথা এক্ষণে আমাদের বিচার্য্য নহে

এইখানে একটা কথার মীমাংসা করা ভাল। কৃষ্ণকৃত কংস শিশুপালাদির বধের উল্লেখ করিলাম. এবং জরাসন্ধকে বধ করিবার জন্যই কৃষ্ণ আসিয়াছেন বলিয়াছি; কিন্তু পাপীকে বধ করা কি আদর্শ মনুষ্যের কাজ ? যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী তিনি পাপাত্মাকেও আত্মবৎ দেখিয়া, তাহারও হিতাকাঙ্ক্ষী হইবেন না কেন ? সত্য বটে, পাপীকে জগতে রাখিলে, জগতের মঙ্গল নাই, কিন্তু তাহার বধ সাধনই কি জগৎ উদ্ধারের একমাত্র উপায় ? পাপীকে পাপ হইতে বিরত করিয়া, ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া, জগতের এবং পাপীর উভয়ের মঙ্গল এক

কালে সিদ্ধ করা তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় নয় কি? আদর্শ পুরুষের তাহাই অবলম্বন করাই কি উচিত ছিল না? যীশু, শাক্যসিংহ ও চৈতন্য এইরূপে পাপীর উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এ কথার উত্তর দুইটি। প্রথম উত্তর এই যে, কৃষ্ণচরিত্রে এ ধর্ম্মেরও অভাব নাই। তবে ক্ষেত্র ভেদে ফলভেদও ঘটিয়াছে। দুর্য্যোধন ও কর্ণ, যাহাতে নিহত না হইয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক জীবনে ও রাজ্যে বজায় থাকে, সে চেষ্টা তিনি বিধিমতে করিয়াছিলেন, এবং সেই কার্য্য সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন, পুরুষকারের যাহা সাধ্য তাহা আমি করিতে পারি, কিন্তু দৈব আমার আয়ত্ত নহে। কৃষ্ণ মানুষী শক্তিরদ্বারা কার্য্য করিতেন, তজ্জন্য যাহা স্বভাবতঃ অসাধ্য তাহাতে যত্ন করিয়াও কখন কখন নিষ্ফল হইতেন। শিশুপালেরও শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। সেই ক্ষমার কথাটা অলৌকিক উপন্যাসে আবৃত হইয়া আছে। যথাস্থানে আমরা তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। কংস বধের কাণ্ডটা কি, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই, কেননা মহাভারতে কংস বধ দুই ছত্রে সমাপ্ত। তবে ইহা বুঝা যায়, যে যে বধোদ্যত শত্রুর ভয়ে জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে পলাইয়া থাকিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে যুদ্ধত্যাগ করিয়া ধর্ম্মালাপ করিতে গেলে, সেইখানেই কৃষ্ণলীলা সমাপ্ত হইত। পাইলেটকে খ্রীষ্টিয়ান করা, খ্রীষ্টের পক্ষে যতদূর সম্ভব ছিল, কংসকে ধর্ম্মপথে আনয়ন কর কৃষ্ণের পক্ষে ততদূর সম্ভব। জরাসন্ধ সম্বন্ধেও তাই বলা যাইতে পারে। তথাপি জরাসন্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণের সে বিষয়ের একটু কথোপকথন হইয়াছিল। জরাসন্ধ কৃষ্ণের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সে কৃষ্ণকেই ধর্ম্মবিষয়ক একটি লেক্‌চর শুনাইয়া দিল, যথা—

"দেখ, ধর্ম্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃপীড়া জন্মে; কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও নিরপরাধে লোকের ধর্ম্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহকালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়, সন্দেহ নাই। ইত্যাদি"

এ সব স্থলে ধর্ম্মোপদেশে কিছু হয় না। জরাসন্ধকে সৎপথে আনিবার অন্য উপায় ছিল কি না, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। অতিমানুষ কীর্ত্তি একটা প্রচার করিলে, যা হয় একটা কাণ্ড হইতে পারিত। তেমন

অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে অনেক দেখি, কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র অতিমানুষী শক্তির বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ ভূত ঝাড়াইয়া, রোগ ভাল করিয়া, বা কোন প্রকার বুজরুকী ভেলকির দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার বা আপনার-দেবত্ব স্থাপন করেন নাই।

তবে ইহা বুঝিতে পারি, যে জরাসন্ধের বধ কৃষ্ণের উদ্দেশ্য নহে; ধর্ম্মের রক্ষা অর্থাৎ নির্দ্দোষী অথচ প্রপীড়িত রাজগণের উদ্ধারই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি জরাসন্ধকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, "আমি বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই দুই বীরপুরুষ পাণ্ডু তনয়। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর, না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর।" অতএব, জরাসন্ধ রাজগণকে ছাড়িয়া দিলে, কৃষ্ণ তাহাকে নিষ্কৃতি দিতেন। জরাসন্ধ তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন, সুতরাং যুদ্ধই হইল। জরাসন্ধ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন রূপ বিচারে যাথার্থ্য স্বীকার করিবার পাত্র ছিলেন না।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যীশু বা বুদ্ধের জীবনীতে যতটা পতিতোদ্ধারের চেষ্টা দেখি, কৃষ্ণের জীবনে ততটা দেখি না, ইহা স্বীকার্য্য। যীশু বা শাক্যের ব্যবসায়ই ধর্ম্ম প্রচার, কৃষ্ণ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্ম্ম প্রচার তাঁহার ব্যবসায় নহে; সেটা আদর্শ পুরুষের আদর্শ জীবন নির্ব্বাহের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। কথাটা এই রকম করিয়া বলাতে কেহই না মনে করেন, যে আমি যীশুখৃষ্ট বা শাক্যসিংহের, বা ধর্ম্মপ্রচার ব্যবসায়ের কিছুমাত্র লাঘব করিতে ইচ্ছা করি। যীশু এবং শাক্য উভয়কেই আমি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তি করি, এবং তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিয়া, তাহাতে জ্ঞানলাভ করিবার ভরসা করি। ধর্ম্মপ্রচারকের ব্যবসায় (ব্যবসায় অর্থে এখানে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমরা সর্ব্বদা প্রবৃত্ত) আর সকল ব্যবসায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। কিন্তু যিনি আদর্শ মনুষ্য তাঁহার সে ব্যবসায় হইতে পারে না। কারণ, যিনি আদর্শমনুষ্য, মানুষের যত প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে, সকলই তাঁহার অনুষ্ঠেয়। কোন কর্ম্মই তাঁহার 'ব্যবসায়," অর্থাৎ অন্য কর্ম্মের অপেক্ষা প্রধানত্ব লাভ করিতে পারে না। যীশু বা শাক্যসিংহ আদর্শপুরুষ নহেন কিন্তু মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়

অবলম্বনই তাঁহাদের বিধেয়, এবং তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা লোক হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন।

কথাটা যে আমার সকল শিক্ষিত পাঠক বুঝিয়াছেন, এমন আমার বোধ হয় না। বুঝিবার একটা প্রতিবন্ধক আছে। আদর্শ পুরুষের কথা বলিতেছি। অনেক শিক্ষিত পাঠক "আদর্শ" শব্দটি "Ideal" শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিবেন। অনুবাদও দূষ্য হইবে না। এখন একটা "Christian Ideal" আছে। খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ পুরুষ যীশু। আমরা বাল্যকাল হইতে খ্রীষ্টিয়ান জাতির সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া, সেই আদর্শটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আদর্শপুরুষের কথা হইলেই সেই আদর্শের কথা মনে পড়ে। যে আদর্শ সেই আদর্শের সঙ্গে মিলে না, তাহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। খ্রীষ্ট পতিতোদ্ধারী; কোন দুরাত্মাকে তিনি প্রাণে নষ্ট করেন নাই করিবার ক্ষমতাও রাখিতেন না। শাক্যসিংহে বা চৈতন্যে আমরা সেই গুণ দেখিতে পাই, এজন্য ইঁহাদিগকে আমরা আদর্শপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কৃষ্ণ পতিতপাবন নাম ধরিয়াও, প্রধানতঃ পতিত-নিপাতী বলিয়াই ইতিহাসে পরিচিত। সুতরাং তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়াই আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদের একটা কথা বিচার করিয়া দেখা উচিত। এই Christian Ideal কি যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ? সকল জাতির জাতীয় আদর্শ কি সেইরূপ হইবে?

এই প্রশ্নে আর একটা প্রশ্ন উঠে—হিন্দুর আবার জাতীয় আদর্শ আছে না কি? Hindu Ideal আছে না কি? যদি থাকে তবে কে? কথাটা শিক্ষিত হিন্দুমণ্ডলী মধ্যে জিজ্ঞাসা হইলে অনেকেই মস্তক কণ্ডূয়নে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। কেহ হয়ত জটা বল্কল ধারী শুভ্র শ্মশ্রু গুম্ফ বিভূষিত ব্যাস বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগকে ধরিয়া টানাটানি করিবেন, কেহ হয়ত বলিয়া বসিবেন, ও ছাই ভস্ম নাই। নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন? কিন্তু এক দিন ছিল।—তখন হিন্দু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। সে আদর্শ হিন্দু কে? ইহার উত্তর আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, নবজীবনে তাহা বুঝাইয়াছি। রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিয়গণ সেই আদর্শ প্রতিমার নিকটবর্ত্তী কিন্তু যথার্থই হিন্দু আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই যথার্থ মনুষ্য-

ষ্টের আদর্শ—খ্রীষ্টাদিতে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

কেন, তাহা বলিতেছি। মনুষ্যত্ব কি, নবজীবনে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য মনুষ্যত্ব। যাঁহাতে সে সকলের চরম স্ফূর্ত্তি সামঞ্জস্যযুক্ত তিনিই আদর্শ মনুষ্য। খ্রীষ্টে তাহা নাই—শ্রীকৃষ্ণে তাহা আছে। যীশুকে যদি রোমক সম্রাট্ য়িহুদার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি সুশাসন করিতে পারিতেন? তাহা পারিতেন না—কেননা রাজকার্য্যের জন্য যে সকল বৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহার অনুশীলিত হয় নাই। অথচ এরূপ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইলে সমাজের অনন্ত মঙ্গল। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ তাহা প্রসিদ্ধ। শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ বলিয়া তিনি মহাভারতে ভূরিভূরি বর্ণিত হইয়াছেন, এবং যুধিষ্ঠির বা উগ্রসেন শাসন কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর কাজ করিতেন না। এইরূপে কৃষ্ণ নিজে রাজা না হইয়াও প্রজার অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন—এই জরাসন্ধের বন্দীগণের মুক্তি তাহার এক উদাহরণ। পুনশ্চ, মনে কর যদি য়িহুদীরা রোমকের অত্যাচার পীড়িত হইয়া স্বাধীনতার জন্য উত্থিত হইয়া, যীশুকে সেনাপতিত্বে বরণ করিত, যীশু কি করিতেন? যুদ্ধে তাঁহার শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। "কাইসরের পাওনা কাইসরকে দাও" বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতেন। কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তিশূন্য—কিন্তু ধর্ম্মার্থ যুদ্ধও আছে। ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তিনি অজেয় ছিলেন। যীশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ মনুষ্য—"Christian Ideal" অপেক্ষা Hindu Ideal শ্রেষ্ঠ।

ঈদৃশ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন আদর্শ মনুষ্য কার্য্য বিশেষে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন না। তাহা হইলে ইতর কার্য্যগুলি অননুষ্ঠিত, অথবা অসামঞ্জস্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। লোক চরিত্রভেদে ও অবস্থাভেদে, শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনের অধিকারী; আদর্শ মনুষ্য সকল শ্রেণীরই

আদর্শ হওয়া উচিত। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের, শাক্যসিংহ যীশু বা চৈতন্যের ন্যায় সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার ব্যবসায় স্বরূপ অবলম্বন করাও সম্ভব। কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী, * এবং ধর্ম্মপ্রচারক, সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের, ধর্ম্মবেত্তাদিগের, এবং একাধারে সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের আদর্শ। জরাসন্ধাদির বধ আদর্শ রাজপুরুষ ও দণ্ডপ্রণেতার অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ইহাই Hindu Ideal. অসম্পূর্ণ যে বৌদ্ধ বা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আদর্শ স্থানে বসাইয়া, সম্পূর্ণ যে হিন্দুধর্ম্ম তাহার আদর্শপুরুষকে, আমরা বুঝিতে পারিব না।

কিন্তু বুঝিবার বড় প্রয়োজন হইয়াছে, কেন না ইহার ভিতর আর একটা বিস্ময়কর কথা আছে। কি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপে, কি হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবর্ষে, আদর্শের ঠিক বিপরীত ফল ফলিয়াছে। খ্রীষ্টীয় আদর্শ পুরুষ, বিনীত, নিরীহ, নির্ব্বিরোধী, সন্ন্যাসী; এখনকার খ্রীষ্টিয়ান ঠিক বিপরীত। ইউরোপ এখন ঐহিক সুখ রত, সশস্ত্র যোদ্ধৃবর্গের বিস্তীর্ণ শিবির মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের আদর্শপুরুষ সর্ব্ব কর্ম্মকৃৎ—এখনকার হিন্দু সর্ব্ব কর্ম্মে অকর্ম্মা। এরূপ ফল বৈপরীত্য ঘটিল কেন? উত্তর সহজ,—লোকের চিত্ত হইতে উভয় দেশেই সেই প্রাচীন আদর্শ লুপ্ত হইয়াছে। উভয় দেশেই এককালে সেই আদর্শ একদিন প্রবল ছিল—প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা, ও প্রাচীন হিন্দু রাজগণ ও রাজপুরুষগণের সর্ব্বগুণবত্তা তাহার প্রমাণ। যে দিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত হইল—যে দিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে আমাদিগের সামাজিক অবনতি। জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না।

এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে। ভরসা করি, এই কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যার যে কার্য্যের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবে।

জরাসন্ধ বধের ব্যাখ্যায় এসকল কথা বলিবার তত প্রয়োজন ছিল না, প্রসঙ্গতঃ এ তত্ত্ব উত্থাপিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু একথা গুলি একদিন না

* তিনি যে তপস্বী তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ হইবে।

একদিন আমাকে বলিতে হইত। আগে বলিয়া রাখায় লেখক পাঠক উভয়ের পথ সুগম হইবে।

সীতারাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামাপুরে সীতারাম একটু স্থির হইলে, লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর দর্শনে সস্ত্রীক হইয়া চলিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দির, নিকটস্থ এক জঙ্গলে ভূমিমধ্যে প্রোথিত ছিল। সীতারামের আজ্ঞাক্রমে ভূমি খননপূর্ব্বক, তাহার পুনর্বিকাশ সম্পন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রাচীন দেবদেবী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। অদ্য প্রথম সীতারাম তদ্দর্শনে চলিলেন। সঙ্গে শিবিকারোহণে নন্দা ও রমা চলিলেন।

যে জঙ্গলের ভিতর মন্দির তাহার সীমাদেশে উপস্থিত হইয়া তিন জনেই শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন, এবং একজন মাত্র পথপ্রদর্শক সঙ্গে লইয়া তিনজনে জঙ্গলমধ্যে পদব্রজে প্রবেশ করিলেন। কাননের অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগের চিত্ত প্রফুল্ল হইল। অতিশয় শ্যামলোজ্জ্বল পত্র রাশিমধ্যে স্তবকে স্তবকে পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। শ্বেত হরিৎ কপিল পিঙ্গল রক্তনীল প্রভৃতি নানা বর্ণের ফুল স্তরে স্তরে ফুটিয়া গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিতেছে। তন্মধ্যে নানা বর্ণের পাখী সকল বসিয়া নানাস্বরে কূজন করিতেছে। পথ অতি সঙ্কীর্ণ। গাছের ডাল পালা ঠেলিতে হয়, কখন কাটায় নন্দারমার আচল বাঁধিয়া যায়, কখন ফুলের গোছা তাহাদিগের মুখে ঠেকে, কখন ডাল নাড়া পেয়ে ভোমরা ডালছেড়ে তাঁদের মুখের কাছে উড়িয়া বেড়ায়, কখন তাহাদের মলের শব্দে ত্রস্তা হইয়া চকিতা হরিণী শয়ন ত্যাগ করিয়া বেগে পলায়ন করে। পাতা খসিয়া পড়ে,

ফুল ঝরিয়া যায়, পাখী উড়িয়া যায়, খরা দাঁড়িয়া যায়। যথাকালে তাহারা মন্দিরসমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন তাহারা পথপ্রদর্শককে বিদায় দিলেন।

দেখিলেন, মন্দির-ভূগর্ভস্থ, বহির হইতে কেবল চূড়া দেখা যায়। সীতারামের আজ্ঞাক্রমে মন্দির দ্বারে অবতরণ করিবার সোপান প্রস্তুত হইয়াছিল; এবং অন্ধকার নিবারণের জন্য দীপ জ্বলিতে ছিল। তাহাও সীতারামের আজ্ঞাক্রমে হইয়াছিল। কিন্তু সীতারামের আজ্ঞাক্রমে সেখানে ভৃত্যবর্গ কেহই ছিল না, কেন না তিনি নির্জ্জনে ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে দেব দর্শনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

সোপান সাহায্যে তাঁহারা তিনজনে মন্দির দ্বারে অবতরণ করিলে পর, সীতারাম সবিস্ময়ে দেখিলেন যে মন্দিরদ্বারে দেবমূর্ত্তি সমীপে একজন মুসলমান বসিয়া আছে। বিস্মিত হইয়া সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কে বাবা তুমি?"

মুসলমান বলিল, "আমি ফকির!"

সীতারাম। মুসলমান?

ফকির। মুসলমান বটে।

সীতা। আ সর্ব্বনাশ।

ফকির। তুমি এত বড় জমীদার, হঠাৎ তোমার সর্ব্বনাশ কিসে হইল!

সীতা। ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর মুসলমান!

ফকির। দোষ কি বাবা! ঠাকুর কি তাতে অপবিত্র হইল?

সীতা। হইল বৈকি? তোমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল?

ফকির। তোমাদের এ ঠাকুর, কি ঠাকুর? ইনি করেন কি?

সীতা। ইনি নারায়ণ, জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা।

ফকির। তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সী। ইনিই।

ফকির। আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সী। ইনিই—যিনি জগদীশ্বর তিনি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন।

ফকির। মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়া ইনি অপবিত্র হন নাই—কেবল মুসলমান ইঁহার মন্দির দ্বারে বসিলেই ইনি অপবিত্র হইবেন? এই বুদ্ধিতে

বাবা তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ? আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ইনি থাকেন কোথা? এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই কি ইনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন? না, আর থাকিবার স্থান আছে?

সীতা। ইনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বঘটে সর্ব্বভূতে আছেন।

ফকির। তবে আমাতে ইনি আছেন?

সীতা। অবশ্য—তোমরা মানন৷ কেন?

ফকির। বাবা! ইনি আমাতে অহরহ আছেন, তাহাতে ইনি অপবিত্র হইলেন না—আমি উঁহার মন্দিরের দ্বারে বসিলাম ইহাতেই ইনি অপবিত্র হইলেন?

একটি স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক ব্রাহ্মণ থাকিলে ইহার যথাশাস্ত্র একটা উত্তর দিলে দিতে পারিত—কিন্তু সীতারাম স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক নহেন, কথাটার কিছু উত্তর দিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইলেন। কেবল বলিলেন,

"এইরূপ আমাদের দেশাচার।"

ফকির বলিল, "বাবা! শুনিতে পাই তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্য ও ধর্ম্ম রাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। সেই এক জনই হিন্দু মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাকে হিন্দু করিয়াছেন, তিনিই করিয়াছেন, যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন, সেও তিনিই করিয়াছেন। উভয়েই তাঁহার সন্তান; উভয়েই তোমার প্রজা হইবে। অতএব দেশাচারের বশীভূত হইয়া প্রভেদ করিও না। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।

সীতা। মুসলমান রাজা প্রভেদ করিতেছে না কি?

ফকির। করিতেছে। তাই মুসলমান রাজ্য ছারে খার যাইতেছে। সেই পাপে মুসলমান-রাজ্য যাইবে, তুমি রাজ্য লইতে পার ভালই, নহিলে অন্যে লইবে। আর যখন তুমি বলিতেছ, ঈশ্বর হিন্দুতেও আছেন, মুসলমানেও আছেন, তখন তুমি কেন প্রভেদ করিবে? আমি মুসলমান হইয়াও

হিন্দু মুসলমানে কোন প্রভেদ করি না। এক্ষণে তোমরা দেবতার পূজা কর, আমি অন্তরে যাইতেছি। যদি ইচ্ছা থাকে বল, যাইবার সময়ে আবার আসিয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইব।

সীতা। দেখিতেছি, আপনি বিজ্ঞ। অবশ্য আসিবেন।

ফকির তখন চলিয়া গেল। সীতামের দর্শন ও পূজা ইত্যাদি সমাপন হইলে, সে আবার ফিরিয়া আসিল। সীতারাম তাহার সঙ্গে অনেক কথা বার্ত্তা কহিলেন। সীতারাম দেখিলেন, সে ব্যক্তি জ্ঞানী। ফারসী আরবী উত্তম জানে সে। তাহার উপর সংস্কৃতও উত্তম জানে, এবং হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থও পড়িয়াছে। দেখিলেন যে যদিও তাহার বয়স এমন বেশী নয়, তথাপি সংসারে সে মমতাশূন্য বৈরাগী, এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী। তাহার এবম্বিধ চরিত্র দেখিয়া নন্দা রমাও লজ্জা ত্যাগ করিয়া একটু দূরে বসিয়া তাহার জ্ঞানগর্ভ কথা সকল শুনিতে লাগিলেন।

বিদায় কালে সীতারাম বলিলেন, "আপনি যে সকল উপদেশ দিলেন, তাহা অতি ন্যায্য। আমি সাধ্যানুসারে তাহা পালন করিব। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে আমার নূতন রাজধানীতে আপনি বাস করেন। আমি এ উপদেশের বিপরীতাচরণ করিলে, আপনি নিকটে থাকিলে আমাকে সে সকল কথা আবার মনে করিয়া দিতে পারিবেন। আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি আমার নিকট থাকিলে, আমার রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল হইবে।"

ফকির। তুমি একটি কথা আমার নিকট স্বীকৃত হইলে, আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হইতে পারি। তুমি রাজধানীর কি নাম দিবে?

সীতা। শ্যামাপুর নাম আছে—সেই নামই থাকিবে।

ফকি। যদি উহার মহম্মদপুর নাম দিতে স্বীকৃত হও, তবে আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হই।

সীতা। এ নাম কেন?

ফকির তাহা হইলে আমি খাতির জমা থাকিব, যে তুমি হিন্দু মুসলমানে সমান দেখিবে।

সীতারাম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ফকির তখন বলিল,

"আমি ফকির, কোন গৃহে বাস করিব না। কিন্তু তোমার নিকটেই থাকিব। যখন যেখানে থাকি তোমাকে জানাইব। তুমি খুঁজিলেই আমাকে পাইবে।"

গমন কালে ফকির তিনজনকে আশীর্ব্বাদ করিল। সীতারামকে বলিল, "তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হউক।" নন্দাকে বলিল, "তুমি মহিষীর উপযুক্ত; মহিষীর ধর্ম্ম পালন করিও। তোমাদের হিন্দু শাস্ত্রে স্বামীর প্রতি যেরূপ আচরণ করার হুকুম আছে সেই রূপ করিও—তাহাতেই মঙ্গল হইবে।"* রমাকে ফকির বলিল, "মা তোমাকে কিছু ভীরু-স্বভাব বলিয়া বোধ হইতেছে। ফকিরের কথা মনে রাখিও; কোন বিপদে পড়িলে ভয় করিও না। ভয়ে বড় অমঙ্গল ঘটে, রাজার মহিষীকে ভয় করিতে নাই।"

তার পর তিন জনে গৃহে গমন করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মধুমতী নদীর তীরে, শ্যামাপুর নামক গ্রাম, সীতারামের পৈর্ত্তৃক সম্পত্তি। সীতারাম সেই খানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার সঙ্গে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা সকলে ফৌজদারের কোপ দৃষ্টি পড়িবার আশঙ্কায়, ভূষণা এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল পরিত্যাগ করিয়া, শ্যামপুরে তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল। যাহারা সে দিনের হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল, তাহারা সকলেও আপনাদিগকে অপরাধী জানিয়া, এবং কোন দিন না কোন দিন ফৌজদার কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবার আশঙ্কায় বাস ত্যাগ করিয়া, শ্যামাপুরে, সীতারামের আশ্রয়ে ঘর বাঁধিতে লাগিল। সীতারামের প্রজা, অনুচর বর্গ, এবং খাদক যে যে ছিল, তাহারাও সীতারাম কর্ত্তৃক আহুত হইয়া আসিয়া শ্যামাপুরে বাস করিল। এরূপে, ক্ষুদ্র গ্রাম শ্যামাপুর সহসা বহুজনাকীর্ণ হইয়া নগরে পরিণত হইল।

তখন সীতারাম নগর নির্ম্মাণে মনোযোগ দিলেন। যেখানে বহুজন সমাগম সেইখানেই ব্যবসায়ীরা আসিয়া উপস্থিত হয়; এই জন্য ভূষণা এবং অন্যান্য নগর হইতে দোকানদার, শিল্পী, আড়ৎদার, মহাজন, এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আসিয়া শ্যামাপুরে অধিষ্ঠান করিল। সীতারামও তাহাদিগকে যত্ন করিয়া বসাইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই নূতন নগর হাট, বাজার, গঞ্জ, গোলা বন্দরে পরিপূর্ণ হইল। সীতারামের পূর্ব্বপুরুষ হইতে সংগৃহীত অর্থ ছিল, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তাহা ব্যয় করিয়া তিনি নূতন নগর সুশোভিত করিতে লাগিলেন। বিশেষ এখন প্রজা বাহুল্য ঘটাতে, তাঁহার বিশেষ আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। আবার এক্ষণে, জনরব উঠিল যে সীতারাম হিন্দু রাজধানী স্থাপন করিতেছেন; ইহা শুনিয়া দেশে বিদেশে যেখানে মুসলমান পীড়িত, রাজভয়ে ভীত, বা ধর্ম্মারক্ষার্থে হিন্দুরাজ্যে বাসের ইচ্ছুক, তাহারা সকলে দলে দলে আসিয়া সীতারামের অধিকারে বাস করিতে লাগিল। অতএব সীতারামের ধনাগম সম্যক প্রকারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি রাজপ্রাসাদ তুল্য আপন বাসভবন, উচ্চ দেবমন্দির, স্থানে স্থানে সোপানবলী রঞ্জিত সরোবর, এবং রাজবর্ত্ম সকল নির্ম্মাণ করিয়া নূতন নগরী অত্যন্ত সুশোভিতা ও সমৃদ্ধিশালিনী করিলেন। প্রজাগণও হিন্দুরাজ্যের সংস্থাপন জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ধন দান করিতে লাগিল। যাহার ধন নাই, সে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা, নগর নির্ম্মাণ ও রাজ্য রক্ষার সহায়তা করিতে লাগিল।

সীতারামের কর্ম্মঠতা, এবং প্রজাবর্গের হিন্দুরাজ্য স্থাপনের উৎসাহে অতি অল্পদিনেই এই সকল ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি রাজা নাম গ্রহন করিলেন না, কেননা দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে রাজা না করিলে, তিনি যদি রাজোপাধি গ্রহণ করেন, তবে মুসলমানেরা তাঁহাকে বিদ্রোহী বিবেচনা করিয়া তাঁহার উচ্ছেদের চেষ্টা করিবে, ইহা তিনি জানিতেন। এ পর্য্যন্ত তিনি বিদ্রোহিতার কোন কাজ করেন নাই। গঙ্গারামের উদ্ধারের জন্য যে হাঙ্গামা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি অস্ত্রধারী বা উৎসাহী ছিলেন না, ইহা ফৌজদার জানিত। কারাগার ভগ্ন করার নেতা যে তিনি, ইহা মুসলমান জানিতে পারে নাই। তিনি যে বন্দীর মধ্যে

ছিলেন, তাহাও ফৌজদার অবগত হয়েন নাই। কাজেই তাঁহাকে বিদ্রোহী বিবেচনা কোন কারণ ছিল না। বিশেষ তিনি রাজা নাম এখনও গ্রহন করেন নাই; বরং দিল্লীশ্বরকে সম্রাট স্বীকার করিয়া জমীদারীর খাজনা পূর্ব্বমত রাজ-কোষাগারে পৌঁছাইয়া দিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকারে মুসলমানের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতে লাগিলেন। এবং নূতন নগরীর নাম "মহম্মদ পুর" রাখাতে, এবং হিন্দু মুসলমান প্রজার প্রতি তুল্য ব্যবহার করাতে মুসলমানের অপ্রীতি ভাজন হইবার আর কোন কারণই রহিল না। আপাততঃ মুসলমানের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইলে, সকলই নষ্ট হইবে; অতএব যতদিন তিনি উপযুক্ত বলশালী না হয়েন, ততদিন কোন গোলযোগ না বাধে ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

তথাপি, তাঁহার প্রজাবৃদ্ধি, ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রতাপ, খ্যাতি, এবং সমৃদ্ধি শুনিয়া ফৌজদার তোরাব খাঁ উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, একটা কোন ছল পাইলেই, মহম্মদপুর লুঠপাঠ করিয়া সীতারামকে বিনষ্ট করিবেন। ছল ছুতারই বা অভাব কি? তোরাব খাঁ সীতারামকে আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন, যে তোমার জমীদারীতে অনেকগুলি বিদ্রোহী ও পলাতক বদমায বাস করিতেছে, ধরিয়া পাঠাইয়া দিবা। সীতারাম উত্তর করিলেন, যে অপরাধীদিগের নাম পাঠাইয়া দিলে, তিনি তাহাদিগকে ধরিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ফৌজদার পলাতক প্রজাদিগের নামের একটি তালিকা পাঠাইয়া দিলেন। শুনিয়া পলাতক প্রজারা সকলেই নাম বদলাইয়া বসিল। সীতারাম কাহারও নামের সহিত তালিকার মিল না দেখিয়া, লিখিয়া পাঠাইলেন, যে ফর্দ্দের লিখিত নাম কোন প্রজা স্বীকার করে না।

এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। উভয়ে উভয়ে মনের ভাব বুঝিলেন। তোরাব খাঁ, সীতারামের ধ্বংসের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সীতারামও আত্মরক্ষার্থ, মহম্মদপুরে চারিপার্শ্বে দুর্লঙ্ঘ্য গড় প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। প্রজাদিগকে অস্ত্রবিদ্যা ও যুদ্ধরীতি শিখাইতে লাগিলেন, এবং সুন্দরবন পথে, গোপনে, অস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

এই সকল কার্য্যে সীতারাম তিনজন উপযুক্ত সহায় পাইয়াছিলেন। এই তিন জন সহায় ছিল বলিয়া এই গুরুতর কার্য্য এত শীঘ্র এবং সুচারুরূপে

নির্ব্বাহ হইয়াছিল। প্রথম সহায় চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার, দ্বিতীয়, মৃণ্ময় বা মেনাহাতী, তৃতীয় গঙ্গারাম। বুদ্ধিতে চন্দ্রচূড়, বলে ও সাহসে মৃণ্ময়, এবং ক্ষিপ্রকারিতায় গঙ্গারাম। গঙ্গারাম, সীতারামের একান্ত অনুগত ও কার্য্যকারী হইয়া মহম্মদপুরে বাস করিতেছিল। ফকির আসে যায়। জিজ্ঞাসামতে সৎপরামর্শ দেয়, কেহ বিবাদের কথা তুলিলে তাহাকে ক্ষান্ত করে। অতএব আপাততঃ সকল বিষয় সুচারুমতে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

নিষ্কাম কৰ্ম্ম।

ছা। ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ বুঝিয়াছি যে, যে সকল কর্ম্ম কামনা শূন্য হইয়া করা যায় তাহা আমাদিগের বন্ধের কারণ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এই যে, যে কাজ করিবে, তাহাতে যেন আসক্তি না থাকে, কর্ম্মফলে যেন স্পৃহা না থাকে। একটি ছেলে লেখা পড়া শিখিতেছে তাহার যদি সেই লেখা পড়ায় আসক্তি না থাকে সে লেখা পড়ায় এলাকাড়া দিবে এরূপ এলাকাড়া দেওয়াকে কি ধর্ম্ম বলিতে পারা যায়।

শি। তুমি নিষ্কাম কর্ম্ম কথাটির অর্থ ঠিক বুঝ নাই। কর্ত্তব্য কর্ম্মে এলাকাড়া দিয়া অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে নিষ্কাম কর্ম্ম করা হয় না। উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে অথচ কর্ম্ম ফলে স্পৃহা থাকিবে না—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। আমি একটি উদাহরণ দিয়া তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সে দিন ছেলেরা ছুটাছুটি খেলা করিতেছে দেখিতেছিলাম। খেলায় হার হউক বা জিৎ হউক সে বিষয়ে কেহই উৎকণ্ঠিত নহে, তাহারা খেলা করিবার জন্য খেলা করিতেছে। এইরূপ ছেলে খেলায় ছেলেদের কতই উৎসাহ তাহা তুমি অবশ্যই দেখিয়াছ। এই ছেলেদের খেলার বিষয় মনমধ্যে ভাবিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে যে কর্ম্মফলে স্পৃহা না থাকিলে, যে কর্ম্মে উৎসাহ থাকিবে না ইহা কোন কাজের কথা নয়।

অনেকে এরূপ অলস আছেন যে তাঁহাদের কোন কর্ম্মেই গা নাই। অদৃষ্ট বলে যা হইতেছে হউক এইরূপ ভাবিয়া সকল কর্ম্মেই, যত্ন ও উৎসাহ বিহীন হইয়া চুপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভাবকে নিষ্কাম ভাব বলে না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করাই এক কর্ম্ম। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিয়া তাহার ফল লাভে আকাংখা না থাকিলেও, অলস ব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করায় যে ফল তাহাতে আসক্ত। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝ। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে অনেক যত্ন অনেক চেষ্টা করা রূপ কষ্ট আছে সেই কষ্ট যাহাতে না পাইতে হয় অলস ব্যক্তির সেই আকাংখা। এইরূপ অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম না করাকে, বন্ধের কারণ কর্ম্মের ন্যায় দেখিবে—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্ন কর্ম্মকৃৎ॥

কর্ত্তব্য কর্ম্মকে অকর্ম্ম বুঝিতে হইবে অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে হইবে কিন্তু আমি ঐ কর্ম্মের কর্ত্তা এইরূপ অভিমানশূন্য হইতে হইবে। আমি করিতেছি না, এইরূপ জ্ঞান জন্মাইলেই ঐ কর্ম্ম আমার পক্ষে অকর্ম্ম হইবে। এবং অলস হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন না করা যে অকর্ম্ম তাহাকেই কর্ম্ম জ্ঞান করিতে হইবে অর্থাৎ এরূপ অকর্ম্মও বন্ধের কারণ। অর্থাৎ চরম উন্নতি মুক্তির পথের কণ্টক বুঝিতে হইবে। যিনি এইরূপ বুঝেন তিনি যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও পরমপদে যুক্ত।

এই সংসারক্ষেত্রে আমরা খেলা করিতে আসিয়াছি। যাহার যে রূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা করিয়া যাই এস। সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের যে ভিন্ন ভিন্ন ফল দেখা যায়, সে ফলের উপর কোন লক্ষ্য রাখিয়া কাজ নাই। সকল কর্ম্ম সাধনের এক চরমফল আছে—সেই ফল আত্মজ্ঞান, বা মোক্ষপদ, বা ঈশ্বরে লীন হওয়া; সদা সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে অভ্যাস করি এস। কোন একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন It is not the goal but the course that makes us happy. ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মফল সম্বন্ধে এই জ্ঞানটি রাখা উচিত, যে কর্ম্ম করাটিই সুখ, কর্ম্ম ফল পাওয়াটি সুখ নহে।

যে ছেলে লেখা পড়া শিখিতে এলাকাড়া দিবে সে তাহার ঐ এলাকাড়া দেওয়া কর্ম্মের ফল পাইবে। লেখা পড়া শিখিয়া উপাধি পাব পুরস্কার পাব বা পরে ধন উপার্জ্জন করিতে পারিব, এই সকল সম্মুখস্থিত ফলের প্রত্যাশী হইয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিতে যাওয়া নিষ্কাম কর্ম্ম নহে, কিন্তু লেখা পড়া শিখিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই জন্য লেখা পড়া শিখিতে প্রাণপনে চেষ্টা করাই নিষ্কাম কর্ম্ম। সকল প্রকার কামনা শূন্য হইবে, কর্ম্ম ফলে কখন আসক্তি রাখিবে না—গীতাশাস্ত্রে এই উপদেশ বার বার কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই কর্ম্ম ফল কথায়, মোক্ষ ফল ব্যতীত অন্যান্য কর্ম্ম ফল—এই অর্থ বুঝিতে হইবে। কামনা অর্থে ভোগৈশ্বর্য্য সুখে কামনা; মোক্ষফল পাইবার আগ্রহকে কামনা বলে না। নিষ্কাম হও এই কথার অর্থ সমস্ত অনিত্য সুখের স্পৃহা ত্যাগ করিয়া নিত্যসুখ পাইবার জন্য লালায়িত হও।

এমন অনেক অলস ব্যক্তি আছেন যাঁহারা মনে করেন যে তাঁহাদিগের কোন বিষয়েই ইচ্ছা নাই। কিন্তু সেটি ভ্রম। আমাদিগের ইচ্ছাবৃত্তি কোন না কোন বিষয়ে যুক্ত থাকিবেই থাকিবে। সাধারণতঃ এই ইচ্ছাবৃত্তি নানারূপ ভোগ্য বিষয়েই লিপ্ত থাকে। নিষ্কাম ধর্ম্মে এই শিক্ষা দেয় যে তোমার ইচ্ছাবৃত্তি যাহা এখন নানা বিষয়ে লিপ্ত রহিয়াছে তাহাকে সেই সমস্ত বিষয় হইতে সরাইয়া লইয়া কেবল একমাত্র নিত্য পদার্থে—ঈশ্বর প্রীতিতে সংযুক্ত কর। যেমন সূর্য্যরশ্মি আতশি কাচের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া একটি বিন্দুতে জমা হইয়া প্রখরতর হইয়া উঠে, সেইরূপ আমাদের সমস্ত ইচ্ছা, এক ঈশ্বরপদ লাভে যোজনা করিয়া, সৎইচ্ছার প্রখরতা বৃদ্ধি করাই, নিষ্কাম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

ছা। এখন বুঝিলাম যে চুপ্ চাপ করে, যা হচ্চে হউক এইরূপ ভাবিয়া বসিয়া থাকিলেই নিষ্কাম হওয়া হয় না। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে কোনটি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আর কোনটিই বা কর্ত্তব্য নহে তাহা কেমন করিয়া বুঝিব।

শি। ঐটি বুঝা একটু শক্ত কথা। ইহা আর এক দিন বুঝাইব।

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধীয় দুটি কথা।

প্রচারের কোন একজন পাঠক ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে গুটিকত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। চিন্তাশীল লোক ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিবেন ততই নানারূপ দুরূহ প্রশ্ন সকল তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে। আমরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে সেই সকল বিষয় যথাসাধ্য মিমাংসা করিতে চেষ্টা করিব ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আপাততঃ পাঠক মহাশয় যে দুইটি প্রশ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপে উত্তর দিব।

১ম। এই জগৎ যদি জগদীশ্বরের দেহ হয় তবে ঈশ্বরে লীন হইবার জন্য এত চেষ্টা কেন। মোক্ষ মোক্ষ বলিয়াই বা চিৎকার কেন? আমরা সকলেই ত তাঁহার শরীরে আছি।

উত্তর। ঈশ্বরে লীন হওয়া কথাটির অর্থ স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই এই প্রশ্নের উত্তর সহজ হইয়া পড়ে।

যেমন একটি পত্র একটি বৃক্ষের সহিত অভিন্নভাবে সংযুক্ত হইয়া থাকে আমিও সেইরূপ সদাই ঈশ্বরে সংযুক্ত রহিয়াছি অথচ আমি মোক্ষ পদ পাই নাই—ঈশ্বরে লীন হইতে পারি নাই; এই দুইটি কথায় আপাততঃ বিরুদ্ধ-ভাব লক্ষিত হয়। এই দুইটি কথার যদি একটি সত্য হয় তবে অন্যটি মিথ্যা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি পূর্ণজ্ঞাণীগণ যাঁহারা আধ্যাত্মিক রহস্য ভেদ করিয়া মোক্ষপদ পাইয়াছেন তাঁহারা ঐ দুইটি কথাই সত্য বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

যেমন এক মাসের ছেলে, জানে না—যে সে মনুষ্য, কিন্তু তথাপি সে যে মনুষ্য এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই সেইরূপ আমি ঈশ্বরের সহিত একান্ত সংযুক্ত বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই সত্যটি আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। জ্ঞানের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যিনি আপনাকে বিশ্বরূপ ঈশ্বরের

সহিত অভিন্ন বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহাকেই মুক্ত বা ঈশ্বরে লীন পুরুষ বলা যায়। হিন্দুশাস্ত্রে এই জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বলে। আমরা এক্ষণে মুখে বলিতে পারি যে আমরা সকলেই ঈশ্বরের সহিত একান্ত সংযুক্ত কিন্তু যতক্ষণ এই সত্য অন্তরে ধারণা করিতে না পারিব ততদিন ঈশ্বরে লীন হইতে পারিব না। ঈশ্বর ও আমি যে অভিন্ন এই জ্ঞানের অভাবস্বরূপ যে অজ্ঞান তাহার অত্যন্ত নাশ হওয়াকেই শাস্ত্রকারগণ ঈশ্বরে লীন হওয়া বলিয়া থাকেন। ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের সহিত আমার আমি জ্ঞান একান্ত সংযুক্ত করিতে পারিলেই আমি ঈশ্বরে লীন হইতে পারিব।

আমার স্থূল দেহ এই বিশ্বের স্থূল দেহের সহিত স্থূল প্রাকৃতিক শক্তি সূত্রে একান্ত সংযুক্ত, আমার প্রাণ বিশ্বের প্রাণের সহিত, আমার মন বিশ্বের মনের সহিত, সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর শক্তিসূত্রে গাঁথা রহিয়াছে। যে চৈতন্যের বশে বিশ্ব প্রকটিত হইয়াছে সেই চৈতন্যের বশেই আমি চেতন; যে যে পদার্থ লইয়া আমি গঠিত, সে সকলই ঈশ্বরের, আমার কিছুই নহে, কেবল একটি জিনিস আমার আছে, সেইটি কেবল ঈশ্বরে সংযুক্ত নহে—সেইটি আমার অহংকার। আমি জানি যে আমি আর এই বিশ্ব এই দুইটি পৃথক জিনিস। এই জ্ঞানটিই অহংকার। যখন এই ভেদ জ্ঞান থাকিবে না যখন আমার অহংজ্ঞান ঈশ্বরে সন্নিবেশ করিতে পারিব তখনই আমি ঈশ্বরে লীন হইতে পারিব।

'ঈশ্বরে লীন হওয়া কথাটির এইরূপ অর্থ বুঝিতে পারিলে, আমি ঈশ্বরে সংযুক্ত অথচ লীন নহি এ কথাটিতে আর গোলমাল ঠেকিবে না।

প্র। আমরা যদি সেই পরমপুরুষের অংশ তবে আর আমরা আমাদের কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করি কেন? আমরা যাহা করিতেছি তাহাত পরমাত্মাই করিতেছেন।

উ। অহংকার। যে সকল কর্ম্ম আমি করিয়া থাকি, বাস্তবিক সেই সমুদয় কর্ম্ম আমার কৃত নহে। প্রকৃতির গুণের বশে সমস্ত কার্য্য হইতেছে কিন্তু সেই সকল কর্ম্মে আমার আমি কর্ত্তা এই অভিমান থাকাতেই আমি কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি। আমি ভাত খাই ইহাও প্রকৃতির কার্য্য আমি ছেলেকে ভালবাসি ইহাও প্রকৃতির কার্য্য কিন্তু আমি এই সকল বিষয়ে

আপনাকে কর্ত্তা জ্ঞান করি—এই অভিমান টুকু আমার। এই অভিমান টুকুর জন্যই আমাদের কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতে হয়।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ভগবদ্গীতা।

যাঁহার এই অহংকার নষ্ট হইয়াছে তাঁহাকে কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতে হয় না। সমগ্র বিশ্বের সহিত আমি অভিন্ন এই জ্ঞান না জন্মিলে অহংকার ধ্বংস হয় না।

আমার অহংকার আমার নিজের। আমার অহংজ্ঞান সংকীর্ণ করা বা বিস্তীর্ণ করা আমার উপর নির্ভর করে। চেষ্টা যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে আমি আমার অহংজ্ঞান সমগ্র বিশ্বে বিস্তীর্ণ করিতে পারি। যিনি এইরূপে সমগ্র বিশ্বে আপনাকে এবং আপনাতে সমগ্র বিশ্বকে দেখিতে পান তিনিই মুক্তপুরুষ, তিনিই ঈশ্বরে লীন পুরুষ, এবং তিনিই সগুণ ঈশ্বর।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী স্থূল কথা।

আমরা বেদের দেবতাতত্ত্ব সমাপন করিয়াছি। এক্ষণে ঈশ্বরতত্ত্ব সমালোচনে প্রবৃত্ত হইব। পরে আনন্দময়ী ব্রহ্ম কথায় আমরা প্রবেশ করিব।

একজন ঈশ্বর যে এই জগত সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ইহার স্থিতিবিধান ও ধ্বংস করিতেছেন, এই কথাটা আমরা নিত্য শুনি বলিয়া; ইহা যে কত গুরুতর কথা, মনুষ্য বুদ্ধির কতদূর দুষ্প্রাপ্য, তাহা আমরা অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারি না। মনুষ্য জ্ঞানের অগম্য যত তত্ত্ব আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য।

এই গুরুতর কথা, যাহা আজিও কৃতবিদ্য সভ্য মনুষ্যেরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না, তাহা কি আদিম অসভ্য জাতিদিগের জানা ছিল? ইহা অসম্ভব। বিজ্ঞান* প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর জ্ঞানের উন্নতি অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে ক্রমশঃ হইয়া আসিতেছে; তখন সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ব্বোধ্য যে জ্ঞান তাহাই আদিম মনুষ্য সর্ব্বাগ্রে লাভ করিবে, ইহা সম্ভব নহে। অনেকে বলিবেন, ও বলিয়া থাকেন, ঈশ্বরকৃপায় তাহা অসম্ভব নহে; যাহা মনুষ্য উদ্ধারের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা কৃপা করিয়া তিনি অপক্ব বুদ্ধি আদিম মনুষ্যের হৃদয়ে প্রকটিত করিতে পারেন; এবং এখনও দেখিতে পাই যে সভ্য সমাজস্থিত অনেক অকৃতবিদ্য মূর্খেরও ঈশ্বর জ্ঞান আছে। এ উত্তর যথার্থ নহে। কেন না এখন পৃথিবীতে যে সকল অসভ্য জাতি বর্ত্তমান আছে, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইয়াছে যে তাহাদের মধ্যে প্রায়ই ঈশ্বর জ্ঞান নাই। একটা মনুষ্যের আদি পুরুষ কিম্বা একটা বড় ভূত বলিয়া কোন অলৌকিক চৈতন্যে কোন কোন অসভ্য জাতির বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ঈশ্বর জ্ঞান নহে। তেমনি সভ্য সমাজস্থ নির্ব্বোধ মূর্খ ব্যক্তি ঈশ্বর নাম শুনিয়া তাহার মৌখিক ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু যাহার চিত্তবৃত্তি অনুশীলিত হয় নাই, তাহার পক্ষে ঈশ্বর জ্ঞান অসম্ভব। বহি না পড়িলে যে চিত্তবৃত্তি সকল অনুশীলিত হয় না এমত নহে। কিন্তু যে প্রকারেই হউক, বুদ্ধি, ভক্তি, প্রভৃতির সম্যক অনুশীলন ভিন্ন ঈশ্বর জ্ঞান অসম্ভব। তাহা না থাকিলে, ঈশ্বর নামে কেবল দেবদেবীর উপাসনাই সম্ভব।

অতএব বুদ্ধির মার্জ্জিতাবস্থা ভিন্ন মনুষ্য হৃদয়ে ঈশ্বর জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা নাই। কোন জাতি যে পরিমাণে সভ্য হইয়া মার্জ্জিত বুদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করে। এ কথার প্রতিবাদে যদি কেহ

---

* হিন্দুশাস্ত্রে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা জানেন যে "বিজ্ঞান" অর্থে Science নহে। কিন্তু এক্ষণে ঐ অর্থে তাহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া আমিও ঐ অর্থে ব্যবহার করিতে বাধ্য। "নীতি" শব্দেরও ঐরূপ দশা ঘটিয়াছে। নীতি অর্থে Politics, কিন্তু এখন আমরা "Morals" অর্থে ব্যবহার করি।

প্রাচীন য়িহুদীদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন, যে তাহারা প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি জাতির অপেক্ষায় সভ্যতায় হীন হইয়াও ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে য়িহুদীদিগের সে ঈশ্বর জ্ঞান বস্তুত ঈশ্বর জ্ঞান নহে। জিহোবাকে আমরা আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষকদিগের কৃপায় ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি, কিন্তু জিহোবা য়িহুদীদিগের একমাত্র উপাস্য দেবতা হইলেও ঈশ্বর নহেন। তিনি রাগদ্বেষপরতন্ত্র পক্ষপাতী মনুষ্য প্রকৃত দেবতামাত্র। পক্ষান্তরে সুশিক্ষিত গ্রীকেরা ইহার অপেক্ষা উন্নত ঈশ্বর জ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে ঈশ্বর জ্ঞান, যিশু য়িহুদী হইলেও, সে জ্ঞান কেবল য়িহুদীদিগেরই নিকট প্রাপ্ত নহে। খৃষ্টধর্ম্মের যথার্থ প্রণেতা সেণ্টপল। তিনি গ্রীকদিগের শাস্ত্রে অত্যন্ত সুশিক্ষিত ছিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা বৈদিক হিন্দুরাই অল্পকালে সভ্যতার পদবীতে আরূঢ় হইয়া ঈশ্বরজ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা এপর্য্যন্ত বৈদিক ধর্ম্মের কেবল দেবতাতত্ত্বই সমালোচনা করিয়াছি। কেন না সেইটা গোড়া, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিপক্ক যে বৈদিক ধর্ম্ম, তাহা অতি উন্নত ধর্ম্ম, এবং এক ঈশ্বরের উপাসনাই তাহার স্থূল মর্ম্ম। তবে বলিবার কথা এই যে প্রথম হিন্দুরা, একেবারে গোড়া হইতেই ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই। জাতিকর্তৃক ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্তির সচরাচর ইতিহাস এই যে, আগে নৈসর্গিক পদার্থ বা শক্তিতে ক্রিয়মান্ চৈতন্য আরোপ করে, অচেতনে চৈতন্য আরোপ করে। তাহাতে কি প্রকারে দেবোৎপত্তি হয় তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এই প্রণালী অনুসারে, বৈদিকেরা কি প্রকারে ইন্দ্রাদি দেব পাইয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়াছি। এই অবস্থায় জ্ঞানের উন্নতি হইলে উপাসকেরা দেখিতে পান, যে আকাশের উপাসনা করি, বায়ুরই উপাসনা করি, মেঘেরই উপাসনা করি, আর অগ্নিরই উপাসনা করি, এই সকল পদার্থই নিয়মের অধীন। এই নিয়মেও সর্ব্বত্র একত্ব, এক স্বভাব দেখা যায়। ঘোল মউনির তাড়নে ঘোল. আর বাত্যাতাড়িত সমুদ্র এক নিয়মের বিলোড়িত হয়; যে নিয়মে আমার হাতের গণ্ডূষের জল পড়িয়া যায়. সেই নিয়মেই আকাশের বৃষ্টি পৃথিবীতে পড়ে। এক নিয়তি সকলকে শাসন করিতেছে; সকলই সেই

নিয়মের অধীন হইয়া আপন আপন কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে, কেহই নিয়মকে ব্যতিক্রম করিতে পারেন না। তবে ইহাঁদেরও নিয়মকর্ত্তা, শাস্তা, এবং কারণ স্বরূপ আর একজন আছেন। এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু আছে সকলই সেই এক নিয়মে চালিত; অতএব এই বিশ্ব জগতের সর্ব্বাংশই সেই নিয়মকর্ত্তার প্রণীত এবং শাসিত। ইন্দ্রাদি হইতে রেণুকণা পর্য্যন্ত সকলই এক নিয়মের অধীন, সকলই একজনের সৃষ্ট ও রক্ষিত, এবং এক জনই তাহার লয়কর্ত্তা। ইহাই সরল ঈশ্বরজ্ঞান। জড়ের উপাসনা হইতেই ইহা অনেক সময়ে উৎপন্ন হয়, কেন না জড়ের একতা ও নিয়মাধীনতা ক্রমশঃ উপাসকের হৃদয়ঙ্গম হয়।

তবে ঈশ্বরজ্ঞান উপস্থিত হইলেই যে দেবদেবীর উপাসনা লুপ্ত হইবে এমন নহে। যাহাদিগকে চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া পূর্ব্বে বিশ্বাস হইয়াছে, জ্ঞানের আরও অধিক উন্নতি না হইলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা ব্যতীত, তাহাদিগকে জড় ও অচেতন বলিয়া বিবেচনা হয় না। ঈশ্বরজ্ঞান এই বিশ্বাসের প্রতিষেধক হয় না। ঈশ্বর জগৎশ্রেষ্ঠা হউন, কিন্তু ইন্দ্রাদিও আছে, এই বিশ্বাস থাকে—তবে ঈশ্বর-জ্ঞান হইলে উপাসক ইহা বিবেচনা করে, যে এই ইন্দ্রাদিও সেই ঈশ্বরের সৃষ্ট, এবং তাঁহার নিয়োগানুসারেই স্বস্ব ধর্ম্ম পালন করে। ঈশ্বর যেমন মনুষ্য ও জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি ইন্দ্রাদিকেও সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং মনুষ্যও জীবগণকে যেমন পালন ও কল্পে কল্পে ধ্বংস করেন, ইন্দ্রাদিকেও সেইরূপ করিয়া থাকেন। তবে ইন্দ্রাদিও মনুষ্যের উপাস্য, এ কথাতেও বিশ্বাস থাকে, কেন না ইন্দ্রাদিকে লোকোত্তর শক্তিসম্পন্ন ও ঈশ্বর কর্তৃক লোক রক্ষায় নিযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস থাকে। এই কারণে ঈশ্বরজ্ঞান জন্মিলেও, জাতি মধ্যে দেবদেবীর উপাসনা উঠিয়া যায় না। হিন্দুধর্ম্মে তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাই প্রচলিত সাধারণ হিন্দুধর্ম্ম—অর্থাৎ লৌকিক হিন্দুধর্ম্ম, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম নহে। লৌকিক হিন্দুধর্ম্ম এই যে একজন ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সর্ব্বকর্ত্তা, কিন্তু দেবগণও আছেন, এবং তাঁহারা ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া লোক রক্ষা করিতেছেন। বেদে এবং হিন্দুশাস্ত্রের অন্যান্য অংশে স্থানে স্থানে এই ভাবের বাহুল্য আছে।

তার পর, জ্ঞানের আর একটু উন্নতি হইলে, দেবদেবী সম্বন্ধে ভাবান্তরের উদয় হয়। জ্ঞানবান্ উপাসক দেখিতে পান যে ইন্দ্র বৃষ্টি করেন না, ঈশ্বরের শক্তিতে বা ঈশ্বরের নিয়মে বৃষ্টি হয়; ঈশ্বরই বৃষ্টি করেন। বায়ু নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা বাতাস করেন না; বাতাস ঐশিক কার্য্য। সূর্য্য চৈতন্যবিশিষ্ট আলোক কর্ত্তা নহেন; সূর্য্য জড় বস্তু, সৌরালোক ও ঐশিক ক্রিয়া। যখন বৃষ্টিকর্ত্তা, বায়ুকর্ত্তা, আলোকদাতা, প্রভৃতি সকলেই সেই ঈশ্বর বলিয়া জানা গেল, তখন, ইন্দ্র, বায়ু, সূর্য্য এ সকল উপাসনাকালে ঈশ্বরেরই নামান্তর বলিয়া গৃহীত হইল। তিনি এক, কিন্তু তাঁহার বিকাশ ও ক্রিয়া অসংখ্য, কার্য্যভেদে, শক্তিভেদে, বিকাশভেদে তাঁহার নামও অসংখ্য। তখন উপাসক যখন ইন্দ্র বলিয়া ডাকে তখন তাঁহাকেই ডাকে, যখন বরুণ বলিয়া ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে; যখন সূর্য্যকে বা অগ্নিকে ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে।

ইহার এক ফল হয় এই যে উপাসক ঈশ্বরের স্তবকালে ঈশ্বরকে পূর্ব্বপরিচিত ইন্দ্রাদি নামে অভিহিত করে। ঈশ্বরই ইন্দ্রাদি, কাযেই ইন্দ্রাদিও ঈশ্বরের নামান্তর। তখন ইন্দ্রাদি নামে তাঁহার পূজাকালীন, ইন্দ্রাদির প্রতি সর্ব্বাঙ্গীন জগদীশ্বরত্ব আরোপিত হয়। কেন না, জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহই ইন্দ্রাদি নাই।

বেদের সূক্তে এই ভাবের বিশেষ বাহুল্য দেখিতে পাই। এ সূক্তে ইন্দ্রে জগদীশ্বরত্ব, ও সূক্তে বরুণে জগদীশ্বরত্ব, অন্য সূক্তে অগ্নিতে জগদীশ্বরত্ব, সূক্তান্তরে সূর্য্যে জগদীশ্বরত্ব, এইরূপ পুনঃ পুনঃ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মক্ষমূলের ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, একটা কিম্ভূত কিমাকার ব্যাপার ভাবিয়া কি বলিয়া এরূপ ধর্ম্মের নামাকরণ করিবেন, তদ্বিষয়িণী দুশ্চিন্তায় ম্রিয়মান্! এরূপ কাণ্ডটা ত কোন পাশ্চাত্য ধর্ম্মে নাই, ইহা না Theism না Polytheism, না Atheism—কোন ismই নয়! ভাবিয়া চিন্তিয়া পণ্ডিতপ্রবর গ্রীক ভাষার অভিধান খুলিয়া খুব দেড়গজী রকম একটা নাম প্রস্তুত করিলেন—Kakenotheism বা Henotheism. এই সকল বিদ্যা যে এ দেশে, অধীত, অধ্যাপিত, আদৃত, এবং অনুবাদিত হয়, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। আচার্য্য মক্ষমূলের বেদ বিশেষ

প্রকারে অধীত করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণেতিহাসে তাঁহার কিছুই দর্শন নাই বলিলেও হয়। যদি থাকিত, তাহা হইলে জানিতেন যে এই দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার —অর্থাৎ সকল দেবতাতেই জগদীশ্বরত্ব আরোপ, কেবল বেদে নহে, পুরাণেতিহাসেও আছে। উহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে—কেবল সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপারে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য দর্শন। তাঁহার Henotheism বা Kakenotheism আর কিছুই নহে, কেবল Polytheism নামক সামগ্রীর উত্তরাধিকারী Pure Theism.

এই গেল বৈদিকধর্ম্মের তিন অবস্থা—

(১) প্রথম, দেবোপাসনা—অর্থাৎ জড় চৈতন্য আরোপ, এবং তাহার উপাসনা।

(২) ঈশ্বরোপাসনা, এবং তৎসঙ্গে দেবোপাসনা।

(৩) ঈশ্বরোপাসনা, এবং দেবগণের ঈশ্বরে বিলয়।

বদিক ধর্ম্মের চরমাবস্থা উপনিষদে। সেখানে দেবগণ একেবারে দূরীকৃত বলিলেই হয়। কেবল আনন্দময় ব্রহ্মই উপাস্যস্বরূপ বিরাজমান। এই ধর্ম্ম অতি বিশুদ্ধ, কিন্তু অসম্পূর্ণ। ইহাই চতুর্থাবস্থা।

শেষে গীতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আবির্ভাবে এই সচ্চিদানন্দের উপাসনার সঙ্গে ভক্তি মিলিতা হইল। তখন হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্মের মধ্যে জগতে শ্রেষ্ঠ। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান, এবং সগুণ ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত উপাসনা ইহাই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম। ইহাই সকল মনুষ্যের অবলম্বনীয়। দুঃখের বিষয় এই যে হিন্দুরা এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশকে বা দেশাচারকে হিন্দুধর্ম্মের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাতেই হিন্দুধর্ম্মের অবনতি এবং হিন্দুজাতির অবনতি ঘটিয়াছে।

এক্ষণে যাহা বলিলাম তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। সফল হইব কিনা, তাহা যিনি এই ধর্ম্মের উপাস্য, তাঁহারই হাত। কিন্তু পাঠকের যেন এই কয়টা স্থূল কথা মনে থাকে। নহিলে পরিশ্রম বৃথা হইবে। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচারে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ পায়, তাহা ধারাবাহিক ক্রমে না পড়িয়া, মাঝে মাঝে পড়িলে

সে সকলের মর্ম্ম গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। হস্তীই হউক, আর শৃগালই হউক, অন্ধের ন্যায় কেবল তাহার করচরণ বা কর্ণ স্পর্শ করিয়া তাহার স্বরূপ অনুভাব করা যায় না। "এটা রাজদ্বারে আছে, সুতরাং বান্ধব" এ রকম কথা আমরা শুনিয়াছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বড় মানুষের কথা।

সন্ধ্যার সময় হেমচন্দ্র তারিণী বাবুর বাড়ীতে যাইলেন। বাড়ীর বাহিরে গোয়াল ঘর আছে, দু তিনটী ধানের গোলা আছে, একটী পূজার চণ্ডীমণ্ডপ আছে ও তাহার সম্মুখে যাত্রার একখানি বড় আটচালা আছে। নাজির বাবুর বাড়ীতে বড় ধুমধামে দুর্গাপূজা হয়, নাচ গাওনা বাজনা হয়, প্রসিদ্ধ যাত্রার দল বৎসর বৎসর আইসে, এবং গ্রামের লোকে সে বাটী সমাকীর্ণ হয়। প্রতিবারই নাজির মশাই পূজার সময় বাড়ী আসেন, এবার কোনও আবশ্যকের জন্য বৈশাখ মাসে এক মাসের ছুটী লইয়া আসিয়াছেন।

আজ দুই বৎসর হইল, তারিণী বাবু আপনার বসিবার জন্য বাহিরে একটী পাকা ঘর করিয়াছেন, এবং বাড়ীর পাশে কতকগুলি ইটের পাঁজা পোড়ান হইয়াছে, গৃহিণীর বড় ইচ্ছা যে শোবার ঘরটীও পাকা হয়। সেই পাকা বৈঠকখানা ঘরে একটী তেলের বাতি জ্বলিতেছে, একটী বড় তক্তা-পোশের উপর সতরঞ্চ ও চাদর বিছান আছে, তাহার উপর তারিণী বাবু বসিয়া ধুম সেবন করিতেছেন, পাড়ার ৪।৫ জন লোক সম্মুখে বসিয়া নানারূপ আলাপ ও গল্প রহস্য করিতেছে।

হেমচন্দ্র আসিবামাত্র তারিণী বাবু তাহাকে বসিতে দিলেন এবং দুই চারিটী মিষ্টালাপ করিয়া একটী ছেলেকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে বলিলেন।

বাড়ীর ভিতর চারিদিকে বেড়া দেওয়া প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, সম্মুখে শুইবার ঘর, উচ্চ ভিটার উপর সুন্দর বড় আটচালা, তাহার এ পাশে ও পাশে উচ্চ ভিটার উপর সুন্দর সুন্দর তিন চারি খানি চৌচালা বা পাঁচচালা ঘর।

ঘরের ভিটিগুলি সুন্দররূপে লেপা. উঠান ঝাট দেওয়া ও পরিষ্কার, এবং তাহার এক পার্শ্বে রান্নাঘর। বাটীর পশ্চাতে একটী বড় রকম পুখুর, তাহার চারিদিকে বাগান, নারিকেল আম কাঁঠাল প্রভৃতি নানারূপ গাছ আছে।

হেমচন্দ্র বাড়ীর ভিতর আসিয়াই শাশুড়ীকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন, তিনিও আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর পার হইয়াছে, শরীরখানি গৌরবর্ণ. স্থূল এবং কিছু খর্ব্ব হইলেও জমকাল। স্থূল বাহুর উপর মোটা মোটা তাবিজ ও বাজু বাহুর সৌন্দর্য্য ও সংসারের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। হাতে মোটা মোটা দুই গাছি বালা, পায়ে মোটা মোটা মল। তাঁহার সেই বহুমূল্য গহনা ও গৌরবের শরীর খানি দেখিলে, তাঁহার আস্তে আস্তে চলন ও ভারি ভারি পদবিক্ষেপ দেখিলে, তাঁহার অল্প অল্প হাসিমাখা একটু একটু গৌরব ও দর্পমাখা কথা গুলি শুনিলে তাঁহাকে বড় মানুষের গৃহিণী বলিয়াই বোধ হয়। তথাপি তারিণী বাবুর গৃহিণী মন্দ লোক ছিলেন না, তাঁহার মনটী সাদা, তাঁহার কথা গুলিতে একটু একটু দর্প থাকিলেও হাস্যপূর্ণ ও মিষ্ট, তিনি আপনার সুখ্যাতি বা ধন গৌরবের কথা শুনিতে ভাল বাসিলেও পরের নিন্দা, পরের অনিষ্ট বা পরকে ক্লেশ দেওয়া ইচ্ছা করিতেন না।

শাশুড়ী। "বলি, বাড়ীর পাশে বাড়ী, তবু কি এক দিনও আসতে নেই? বুড়ী আছে কি মরেছে বলে আর খবর নাও না?"

হেম। "না তা নয়. প্রত্যহই আপনাদের খবর পাই, তবে আমাদের অবস্থা সামান্য, সর্ব্বদাই কায কর্ম্মে রত থাকিতে হয়।"

শাশুড়ী। "হ্যাঁ, এখন তাই বলবে বই কি? এই এত করে বিন্দুকে হাতে করে মানুষ কর্‌লুম, এত করে তার বিয়ে থা দিলুম, তা সেও কি একবার জিজ্ঞেস করে না যে জেঠাই মা কেমন আছে।"

হেম। "সে সর্ব্বদাই আপনার তত্ত্ব লয়, আর এই উমাতারা আসিয়া অবধি একবার আসবে আসবে মনে কচ্চে, কিন্তু সংসারের সকল কাজ তাহাকেই কর্ত্তে হয় আর ছেলেটীরও ব্যারাম, সেই জন্য আসতে পারে না। তা উমাতারা যদি একদিন আমাদের বাড়ী যায় তবে তার বোনের সঙ্গেও দেখা হয়, ছেলে দুটীকেও দেখিয়া আসিতে পারে।

শাশুড়ী। "না বাপু, উমার যে ঘরে বে হয়েছে, তাদের এমন মত নয় যে উমা কারও বাড়ীতে যাওয়া আসা করে। তারা ভারি বড় মানুষ,—ধনপুরে বনিয়াদী বড় মানুষ, ঐ যে আগে ধনেশ্বর বলে নবাবদের দেওয়ান ছিল না, তাদেরই ঝাড়, ভারি বড় লোক, এ অঞ্চলে তেমন ঘর নাই।"

হেম। "হাঁ তা আমি জানি।"

শাশুড়ী। "হ্যাঁ, জানবে বৈকি, তাদের ঘর কে না জানে? ক্রিয়া কর্ম্ম দান ধর্ম্ম সকল রকমে, বুঝলে কি না, তাদের যেমন টাকা তেমনি যশ। এই এবার তাদের একটী মেয়ের বে হল বর্দ্ধমানে, ঐ ইনি যেখানে কর্ম্ম করেন, সেইখানে, তা বে-তে দশ হাজার টাকা খরচ কল্লে। তাদের কি আর টাকার গণাগুন্তি আছে। বছর বছর পূজা হয়, তা দেশের যত বামুন আছে, বুঝলে কি না, এ ধনপুরে দক্ষিণা পায় না এমন বামুনই নাই।"

হেম। "তা আমি জানি।"

শাশুড়ী। "তা,উমাকে কি শীগ্‌গির পাঠায়;—সেই পূজার সময় একবার করে পাঠায়, আর পাঠায় না। এবার এই ইনি ছুটি নিয়ে এসেছেন, তাই কত লোক পাঠিয়ে হাঁটাহাঁটি করে তবে উমাকে পাঠিয়েছে, তাও বলে দিয়েছে ১৪ দিনের বাড়া যেন এক দিনও না থাকে, তা এই ১৪ দিন হলেই পাঠাব। এই বর্দ্ধমানে আমাদের লোক গিয়েছে, কাপড়, সন্দেশ, আঁব, নিচু, এই সব আন্‌তে দিয়েছি, মেয়ের সঙ্গে পাঠাতে হবে। বড় ঘরে মেয়ের বে দিলে কিছু খরচ কর্‌তেই হয়।"

হেম। "তা হয়ই ত, তা ইহার মধ্যেই আমার স্ত্রীকে ছেলেদের নিয়ে পাঠিয়ে দেব এখন। সে উমার সঙ্গে দেখা করে যাবে।"

শাশুড়ী। "হাঁ, তা আস্‌বে বৈ কি, বিন্দু আমার পেটের ছেলের মত, সে আসবে না? সে আসবে, আর তুমিও বাছা মধ্যে মধ্যে এস, আমাদের খোঁজ খবর নিও।"

হেম। "হাঁ তা আসবো বৈকি। এখন উমা আর আছে ক দিন?"

শাশুড়ী। "আর আছে কৈ? এই বর্দ্ধমান থেকে আঁব সন্দেশ এলেই উমাকে পাঠিয়ে দেব; মেয়ের সঙ্গে কিছু না দিলে ত ভাল দেখায় না, বড় মানুষ কুটুম করেছি, কিছু না দিলে খুলে কি ভাল দেখায়?

আবার দেখ এই আস্‌ছে মাসে ষষ্ঠিবাটা, আবার তত্ত্ব করতে হবে। তাতেও বিস্তর খরচ আছে।

হেম। "তা বটেই ত।"

শাশুড়ী। "কাজেই যেমন কুটুম্ব করেছি তেমনি তত্ত্ব করতে হয়, লোকের কাছেও আমাদের একটু মান সম্ভ্রম আছে, কুটুমেরাও জানে আমরা বিষয়ী লোক, কাজেই কিছু দিয়ে থুয়ে তত্ত্ব না করিলে ভাল দেখায় না। তবে তোমার ছেলে দুটি ভাল আছে?"

হেম "না. খোকার ৫।৭ দিন থেকে একটু রাত্রিতে গা গরম হয়, তা আমি কাল কাট্‌ওয়া থেকে অষুদ এনে খাওয়াচ্ছি, আজ একটু ভাল আছে।"

শাশুড়ী। "বেশ করেছ। বাছা, বিন্দুও ঐ রকম ছিল, কাহিল ছিল, মধ্যে মধ্যে জর হত। আহা সেদিনকার ছেলে, বাছা এমন ধীর শান্ত ছিল যে মুখটী খুলে কখনও কিছু চায় নি, আমি যতক্ষণ না ডেকে তাকে ভাত খাওয়াতুম ততক্ষণ সে মুখটী খুলে একবার বলতো না যে জেঠাই মা, ক্ষিদে পেয়েছে। জেঠাই-মা তার প্রাণ; তার বাপ মরে অবধি তার মার আর মন স্থির ছিল না, সুতরাং বিন্দুকে আর সুধাকে আমি যতক্ষণে খাওয়াতুম ততক্ষণ খেত, যতক্ষণ পরাতুম, ততক্ষণ পরিত। আমার উমাতারা যে বিন্দুও সে, আহা বেঁচে থাকুক, আর এক একবার আসতে বলো।"

হেম। "হাঁ, আসবে বৈ কি।"

শাশুড়ী। "এই পূজার সময় বিন্দু এল, আবার সেই দিনই চলে গেল; এবার পূজার সময় ত তা হবে না। ঘরের মেয়ে, পূজার সময় ঘরে ৫।৭ দিন থেকে কায কর্ম্ম ক'রবে। আর কায কর্ম্মও ত এমন নয়, এই আমাদের ঠাকুর দর্শন করিতে, বুঝলে কি না, এই ৩।৪ ক্রোশের মধ্যে যত গ্রাম আছে, সব গ্রামের কি ইতর কি ভদ্র সকলেই আসে। তোমরা বাছা বাইরে থেকে আস বাইরে থেকে চলে যাও, ঘরের কায ত জান না। রাত তিনটের সময় হাঁড়ি চড়ে আর বেলা তিনটে পর্য্যন্ত উনুনের জ্বাল নেবে না তবু ত কুলিয়ে উঠতে পারি নে। লোকই কত, খাওয়া দাওয়াই কত, তার কি সীমা পরিসীমা আছে?"

হেম। "তা আর আমি দেখিনি, প্রতি বছরই দেখিতেছি, আপনার বাড়ীতে পূজার ধুমধাম এ সকলেই জানে।"

শাশুড়ী। "তা কি জান বাপু, বংশানুগত ক্রিয়া কর্ম্মটা উনি না করিলে নয়। তবে যদি টাকা না থাকিত সে আলাদা কথা। এই গ্রামে কি সকলেই পূজা করে, এই তোমরা কি পূজা কর, তা ত নয়, তার জন্য লোকে ত কিছু বলে না। তবে আমাদের পুরুষানুক্রম থেকে এটা আছে, মল্লিক-দের বাড়ীর একটা নাম আছে, এঁর চাকুরিও আছে, কাজেই আমাদের না করিলে নয়, এই জন্য করা।"

হেম। "তা বটেইত।"

কতক্ষণ পর্য্যন্ত হেমচন্দ্র এই মল্লিক বাড়ীর ইতিহাস, ধনের ইতিহাস, পূজার ইতিহাস, ধনপুরের ধনেশ্বরের বংশের গৌরব, মেয়ের গৌরব, তত্ত্বের গৌরব এই সমুদয় হৃদয়গ্রাহী বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা সেই দিন সায়ং-কালে শুনিয়াছিলেন তাহা আমরা ঠিক জানি না। তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে ক্ষণেক পর হেমচন্দ্রের (দৈনিক পরিশ্রমের জন্যই বোধ হয়) চক্ষু দুটী একটু একটু মুদিত হইয়া আসিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে তিনি কথার স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ না করিয়াই "তা বটেই ত," "তা বৈকি" ইত্যাদি শাশুড়ীর সন্তোষজনক শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলেন। রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে এমন সময় ঝম্ ঝম্ করিয়া শব্দ হইল; ধনপুরের ধনেশ্বর বংশের পুত্রবধূ, ষোড়শবর্ষীয়া, হীরক-মুক্তা-বিভূষিতা, রূপাভিমানিনী উমাতারা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

উমাতারা অতিশয় গৌরবর্ণা, মুখখানি কাঁচা সোনার মত, এবং তাহার উপর স্বর্ণ ও হীরকের জ্যোতি বড় শোভা পাইতেছে। মাথায় সুন্দর চিক্কণ কালো চুলের কি সুন্দর চিক্কণ খোঁপা, তার উপর কপালে জড়ওয়া সিঁতির কি বাহার হইয়াছে, খোঁপায় সোনার ফুল, সোনার প্রজাপতি আর একটী হীরার প্রজাপতি! হাতে পৈচা, যবদানা, মরদানা, আর জড়োয়া বালা, বাহুতে জড়ওয়ার তাবিজ ও বাজুর কি শোভা! পিঠে পিঠঝাঁপা দুলিতেছে, কটিদেশে চন্দ্রবিনিন্দিত চন্দ্রহার! গলায় চিক, বুকে সখের সাতনর মুক্তাহার! হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে উমাতারা

ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,

"ইস্ আজ কি ভাগ্যি, না জানি কার মুখ দেখে উঠেছি!"

হেমচন্দ্র। "আমার ভাগ্য বল; ভাগ্য না হইলে কি তোমাদের মত লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়।"

উমা। "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তা নৈলে আর এই দশ দিন এখানে এসেছি একবারও দেখা কত্তে আস না? তা যা হোক্ ভাল আছ ত? বিন্দু দিদি ভাল আছে?"

হেম। "সে ভাল আছে। তুমি ভাল আছ?"

উমা। "আছি যেমন রেখেচ, তবু জিজ্ঞাসা করিলে এই ঢের। তা আজ এখানে আমাদের দর্শন দিলে কি মনে করে? বিন্দুদিদি যে বড় ছেড়ে দিলে, এতক্ষণ এখানে আছ রাগ করিবেন না ত?"

হেম। "তোমার বিন্দুদিদি আপনি আস্‌তে পারলে বাঁচে, সে আর ছেড়ে দেবে না। সে এই কতদিন থেকে তোমাকে দেখবার জন্য আসবে আসবে কচ্চে। তা কাল পরশুর মধ্যে একদিন আসিবে।"

উমা। "তবে কালই পাঠিয়ে দিও। দেবে ত?"

হেম। "আচ্ছা কালই আসিবে। সেও তোমার সঙ্গে দেখা করিতে অতিশয় উৎসুক, তুমি শ্বশুরবাড়ী থাকিলে সর্ব্বদাই তোমার মার কাছে তোমার খবর জেনে পাঠায়।"

উমা। "তা আমি জানি। বিন্দুদিদি আমাকে ছেলে বেলা থেকে বড় ভাল বাসে, ছেলে বেলা আমরা দুইজনে একত্রে খেলা করিতাম, আমাকে এক দণ্ড না দেখে থাকৃতে পারিত না। ছেলেবেলা মনে করিতাম বিন্দুদিদির সঙ্গে চিরকাল একত্র থাকিব, প্রত্যহ দেখা হবে, কিন্তু ছেলেবেলার ইচ্ছাগুলি কি কখনও সম্পন্ন হয়? মনের ইচ্ছা মনেই থাকে। তা কাল তোমার ছেলেদুটীকেও পাঠিয়ে দিবে?"

হেম। "দিব বৈ কি, অবশ্য দিব।"

উমাতারা অতিশয় অহ্লাদিত হইলেন। পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে উমার পিতার ধনলিপ্সায়, মাতার ধন গৌরবে, শ্বশুরবাড়ীর বড়মানুষী চালে, উমার বাল্যহৃদয়, বাল্য ভালবাসা একেবারে বিলুপ্ত করে নাই, সে এখনও

বাল্যকালের সৌহৃদ্য কখন কখন মনে করিত, বাল্যকালের সুহৃদকে একটু স্নেহ করিত। ধনপুরের ধনেশ্বর বংশের পুত্রবধুব অপূর্ব্ব রূপগরিমা ও বহুমূল্য হীরকমুক্তাদি দেখিয়া আমরা প্রথমে একটু ভীত হইয়াছিলাম,—এগুলি দেখিলেই আমাদিগের একটু ভয় সঞ্চার হয়,—এক্ষণে যাহা হউক তাহার হৃদয়ের একটী সদ্গুণ দেখিয়াও কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম;—আর এই সামান্য সদ্গুণটী জগৎসংসারে সচরাচর দেখিতে পাইলে সুখী হইব। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর উমা বলিলেন,

"তবে এখন একবার উঠ, অনুগ্রহ করে যখন এসেছ, একটু জলটল খেয়ে যাও, জলখাবার তৈয়ের হয়েছে।"

উমা ঝম্ ঝম্ করিয়া আগে আগে গেলেন, হেমচন্দ্র বিনীত ভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। খাবারঘরে ঢুকিলেন, খাবার সম্মুখে দুটী সমাদান জ্বলিতেছে, রুপার থালে খানকত লুচি আর নানা রূপ মিষ্টান্ন,চারিদিকে রুপার বাটীতে নানা রকম ব্যঞ্জন ও দুগ্ধ ক্ষীর, যেন পূর্ণ চন্দ্রের চারিদিকে কত নক্ষত্র বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে! হেমচন্দ্রের কপালে এরূপ আয়োজন, এরূপ খাবার দাবার সহসা ঘটে না, এই রৌপ্য সামগ্রীর মূল্যে তাঁহার এক বৎসরের সংসারিক খরচ চলিয়া যায়!

উমাতারা আবার, বলিলেন "তবে খেতে বস, আমাদের গরিবদের যথা সাধ্য কিছু করেছি, ত্রুটী হইয়া থাকিলে কিছু মনে করিও না।"

শ্যালীর সহিত অনেক মিষ্টালাপ করিতে করিতে হেমচন্দ্র আহার করিতে লাগিলেন। যে বৎসর বিন্দুর বিবাহ হইয়াছিল তাহারই পর বৎসর উমার বিবাহ হয়। উমা অতিশয় গৌরবর্ণা ও সুন্দরী, হেমচন্দ্রের মতে উমার চেয়ে বিন্দুর নয়ন দুটী সুন্দর ও মুখের শ্রী অধিক, কিন্তু এ বিষয়ে হেমচন্দ্র নিরপক্ষ সাক্ষী নহেন, সুতরাং তাঁহার সাক্ষ্য আমরা গ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। গ্রামে সকলে বলিত বিন্দু কালো মেয়ে. উমা সুন্দরী এবং সেই সৌন্দর্য্য গুণেই উমার বড় ঘরে বিবাহ হইল। ধনপুরের জমিদারের ছেলে সুন্দরী না হইলে বিবাহ করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন, উমা সুন্দরী মেয়ে বলিয়া তাহার সেই স্থানে বিবাহ হইল।

তারিণী বাবু এত ধনবান সম্বন্ধ করিয়া অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতেন,

তারিণী বাবুর মহিষী ও ধনপুরের দাসীর নিকট গঞ্জনা সহিতেন; কিন্তু বড় মনুষের কাছে লাথী ঝেঁটাও সয়, গরিবের একটী কথা সয় না।

তারিণী বাবু বড় কুটুম্ব করিয়াছেন বলিয়া গ্রামে তাঁহার মান সম্ভ্রম বাড়িল; তিনি ক্রমে দেশের মধ্যে একজন বড় লোক হইতে চলিলেন। এরূপ লাভ হইলে গোপনে দুই একটী গঞ্জনা ও তিরস্কার ও কুটুম্বের ঘৃণা কোন্ বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকে হেলায় না বহন করেন?

উমাতারার টাকার সুখ হইল, অন্য সুখ তত হইয়াছিল কি না জানি না, যদি এই উপন্যাসের মধ্যে ধনপুরের জমিদার পুত্রের সহিত কখনও দেখা হয় তবে সে কথার বিচার করিব। তবে শুনিয়াছি বয়সের সহিত সেই জমিদার পুত্রের রূপলালসা বাড়িতে লাগিল এবং নানা দিকে প্রবাহিত হইল। কিন্তু বড় মানুষেব কথায় আমাদের এখন কায নাই, আমরা গরিব গৃহস্থের ইতিহাস লিখিতেছি।

উমার শ্বশুর বাড়ীতে অন্য কষ্টেরও অভাব ছিল না। গরিবের মেয়ে বলিয়া তাঁহাকে কখন কখন কথা সহিতে হইত, শাশুড়ীর ঘৃণা, ননদদিগের লাঞ্ছনা, সময়ে সময়ে দাসীদিগেরও গঞ্জনা। কিন্তু গা-ময় গহনা পরিলে বোধ হয় অনেক কষ্ট সয়, মুক্তাহার ও জড়ওয়া দেখিলে বোধ হয় হৃদয়জাত অনেক দুঃখের হ্রাস হয়। এ শাস্ত্রে আমরা বড় বিজ্ঞ নহি, সুবর্ণ রৌপ্যের গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই, জড়ওয়া চক্ষে বড় দেখি নাই, সুতরাং তাহার মূল্যও জানি না। হীরকের জ্যোতিতে মনের মালিন্য ও অন্ধকার কতদূর দূর হয় বিজ্ঞবর পণ্ডিত ও পণ্ডিতাগণ নির্দ্ধারণ করুন। আমরা কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ অবধি উমাতারার সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে এবং অনেক বার উমাতারার সেই সুবর্ণ-মণ্ডিত মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে একটু সন্দিগ্ধমনা হইলেন। তাঁহার বোধ যেন সেই হীরকমণ্ডিত সুন্দর ললাটে এই বয়সেই এক একবার চিন্তার ছায়া দৃষ্ট হইতেছে, যেন সেই হাস্য-বিস্ফারিত নয়নের প্রান্তে সময়ে সময়ে চিন্তার ছায়া দৃষ্ট হইতেছে। এটী কি প্রকৃতই চিন্তার ছায়া? না সেই সমাদানের আলোক এক একবার বায়ুতে স্তিমিত হইতেছে তাহার ছায়া? না ভবিষ্যৎ জীবন সেই যৌবনের ললাটে আপন ছায়া অঙ্কিত করিতেছে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

বিষয় কর্ম্মের কথা ।

আহারাদি সমাপ্ত হইলে হেমচন্দ্র বাহির বাটীতে আসিলেন, দেখিলেন তারিণী বাবু তখন একাকী বসিয়া আছেন। প্রদীপের স্তিমিত আলোকে একখানি কাগজ পড়িতেছেন,—সেখানি দৈনিক বা সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র নহে, সে একটী পুরাতন তমস্সুক। তারিণী বাবুর কপালে দুই একটী বয়সের রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, শরীর ক্ষীণ, বর্ণ গৌর, চক্ষু দুটী ছোট ছোট কিন্তু উজ্জ্বল, মস্তকে টাক পড়িতেছে, সম্মুখের কয়েকটী চুল পাকিয়াছে। তারিণী বাবুর আকারে বা আচরণে কিছু মাত্র বাহ্যাড়ম্বর বা অর্থের দর্প ছিল না, যাঁহারা বিষয় সৃষ্টি করেন তাঁহাদের সে গুলি বড় থাকে না, যাঁহারা ভোগ করেন না উড়াইয়া দেন তাঁহাদেরই সে গুলি ঘটিয়া থাকে। হেমচন্দ্রকে দেখিয়া তারিণী বাবু কাগজ রাখিলেন, ধীরে ধীরে চসমাটী খুলিয়া রাখিলেন, পরে নম্র ধীর বচনে বলিলেন "এস বাবা, বস।" হেমচন্দ্র উপবেশন করিলেন।

মিষ্টালাপ ও অন্যান্য কথার পর হেমচন্দ্র বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলেন, তারিণী বাবু কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহা শুনিলেন এবং ধীরে ধীরে উত্তর দিতে লাগিলেন।

হেম। "অনেক দিন পরে আপনি বাড়ী আসিয়াছেন আপনাকে দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা কহিয়া বড় সুখী হইলাম, যদি অনুমতি করেন তবে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।"

তারিণী। "হাঁ তা বল না, তার আবার অনুমতি কি বাবা, যা বলিবে বল, আমি শুনিতেছি।"

হেম। "আমার শ্বশুর মহাশয় যে সামান্য একটু জমী চাষ করাইতেন তাহারই কথা বলিতেছি।"

তারিণী। "বল।"

হেম। "সে জমীটুকু আমার শ্বশুর মহাশয় আজীবন দখল করিতেন ও

চাষ করাইতেন, তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার পিতা আজীবন চাষ করাইতেন তাহা অবশ্যই আপনি জানেন।”

তারিণী। “জানি বৈ কি। এবং হরিদাসের পিতার পূর্ব্বে তাঁহার পিতা সেই জমি চাষ করাইতেন, তিনি আমারও পিতামহ হরিদাসেরও পিতামহ। তখন আমরা বালক ছিলাম, কিন্তু সে কথা বেশ মনে আছে। পিতামহের কাল হইলে আমার পিতাই সমস্ত জমীই চাষ করাইতেন, হরিদাসের পিতা জ্যেষ্ঠ ছিলেন কিন্তু তাহার বিষয় বুদ্ধি বড় ছিল না, এই জন্য পিতামহ আমার পিতাকেই সমস্ত সম্পত্তি দেখিতে শুনিতে বলিয়া যান। পরে আমার জেঠা হরিদাসের পিতা, পৃথক হইয়া গেলে তাঁহার জীবন যাপনের জন্য আমার পিতা তাঁহাকে কএক বিঘা জমী চাষ করিতে দিয়াছিলেন মাত্র। হরিদাসও আজীবন সেই জমী টুকু চাষ করিয়া আসিয়াছে মাত্র, কিন্তু আমাদিগের সম্পত্তি এজমালি। এ সকল কথা বোধ হয় তুমি জান না, কেমন করেই বা জানিবে, তুমি সে দিনের ছেলে, আর ছেলেবেলা ত গ্রামে বড় থাকিতে না, বর্দ্ধমানে ও কলিকাতায় লেখা পড়া করিতে।”

হেমচন্দ্র এ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, সম্পত্তি এজমালি তাহা এই নূতন শুনিলেন! তারিণী বাবুর এই নূতন সুন্দর তর্কটী শুনিয়া তাঁহার একটু হাসি পাইল, কিন্তু অদ্য তিনি তর্ক খণ্ডন করিতে আইসেন নাই, আপস করিতে আসিয়াছেন। সুতরাং হাসি সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন; “পূর্ব্বের কথা আপনি আমাপেক্ষা অনেক অধিক জানেন তাহার সন্দেহ নাই। আমি এই মাত্র বলিতেছিলাম যে শ্বশুর মহাশয় যে জমী আজীবন কাল পৃথক রূপ চাষ করিয়া আসিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার অনাথা কন্যা কিছু প্রত্যাশা করিতে পারে কি?”

তারিণী। “আহা! বাছা বিন্দু এ বয়সেই পিতা মাতা হারা হইয়া অনাথা হইয়াছে তাহা ভাবিলে বুক ফেটে যায়! আহা! আজ যদি হরিদাস থাকিত, এমন সোণার চাঁদ মেয়েকে নিয়া, এমন সচ্চরিত্র সোণার জামাইকে লইয়া ঘর করিতে পারিত, তাহা হইলে কি এত গণ্ডগোল হইত, এত খরচা করিয়া আমাকে তাহার কর্ষিত জমীটুকু রক্ষা করিতে হইত? তবে ভগবানের ইচ্ছা। হরিদাস গিয়াছেন, আমাকে একলাই সমস্ত ভার বহন করিতে

হইল ; এজমালি জমীর যে অংশটুকু তিনি চাষ করাইতেন তাহা পুনরায় অন্যান্য জমীর সহিত আমাকেই তত্ত্বাবধান করিতে হইতেছে। তাহাতে আমার লাভ বিশেষ নাই, সেই জমীটুকু রক্ষার জন্য তাহার মূল্য অপেক্ষা ব্যয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু কি করি পৈতৃক সম্পত্তি পরের হাতে যায়, জমীদার অন্যকে দেয় তাহা ত আর চক্ষুতে দেখা যায় না।"

হেম। "তবে শ্বশুর মহাশয়ের জমী হইতে কি তাহার কন্যা কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারে না।"

তারিণী। "প্রত্যাশা আবার কি বল: আমরা বুড়ো সুড়ো লোক, তোমরা কালেজের ছেলে তোমাদের সব কথা, একটু ভাঙ্গিয়া না বলিলে, কি বুঝিয়া উঠিতে পারি? বিন্দু আমাদের ঘরের ছেলে, আমার উমা যে বিন্দু সে, যত দিন আমার ঘরে এক কুন্‌কে চাল আছে তত দিন বিন্দু ও উমা তাহার সমান ভাগ করে খাবে। তাহাতে আবার জমীর অংশই কি প্রত্যাশাই কি?"

হেমচন্দ্র দেখিলেন তারিণী বাবুর সঙ্গে পেরে উঠা ভার, তারিণী বাবুর সুন্দর তর্ক তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। অনেকক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বৃথা চেষ্টা করিয়া, অনেক ক্ষণ কথাবার্ত্তা করিয়া অবশেষে কহিলেন, "মহাশয় যদি অনুমতি দেন, যদি রাগ না করেন, তবে আর একটী কথা বলি।"

তারিণী। "বল না বাবা এতে রাগের কথা কি আছে? তুমি আমার ছেলের মত, তোমার কথায় আবার রাগ?"

হেম। "আপনি বোধ হয় জানেন যে শ্বশুর মহাশয় যে জমী আজীবন-কাল পৃথক রূপ চাষ করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা যে এজমালি সম্পত্তি তাহা আমরা স্বীকার করি না।"

তারিণী। "তোমরা স্বীকার কর্‌বে কেন? তোমরা কালেজের ছেলে, ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াছ, তোমরা কি আর এজমালি স্বীকার করিবে? এখন কালেজের ছেলেরা ভায়ে ভায়ে একত্র থাকিতে পারে না, শুনেছি মায়ে পোয়ে এজমালীতে থাকিতে পারে না, তোমাদের কথা কি বল? আমরা বুড়ো সুড়ো লোক, আমরা সে সব বুঝিনা, আমরা এজমালিতে থাকতে ভালবাসি, বাপ পিতামহ যা করে গিয়েছেন তাই করিতে ভালবাসি। আহা, থাকতো আমার হরিদাস সে জানিত এ জমি মল্লিক বংশের এজমালি

সম্পত্তি কি না, তোমরা সে দিনকার ছেলে তোমরা কি জানবে বল?”

হেম। “তা যাহাই হউক, আমরা এজমালি বলিয়া স্বীকার করি না, তাহা আপনি জানেন। আর এজমালিই হউক আর নাই হউক, সে সম্পত্তির একটু অংশ বোধ হয় আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি। আমার শ্বশুর মহাশয় যে জমীটুকু চাষ করিতেন এক্ষণে আমার স্ত্রীর পক্ষে আমি যদি সেই জমীটুকু পৃথক রূপ চাষ করিতে চাহি তাহাতে কি আপনি সম্মত আছেন?”

তারিণী বাবু কিছু মাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন “ছি বাবা, তুমি স্বভাবত বুদ্ধিমান ছেলে, লেখা পড়া শিখিয়াছ. এমন নির্ব্বুদ্ধির কথা কেন? মল্লিক বংশের বংশানুগত এজমালি জমী কি পৃথক করা যায়? তাহাই যদি পারিতাম তবে সেই জমীটুকুর মূল্যের দশগুণ খরচ করিয়া আমার হাতেই রাখিলাম কেন? সঙ্গত কথা বল, তবে শুনিতে পারি; অসঙ্গত কথা শুনিব কেমন করিয়া? “ওরে হরে! আর এক ছিলুম তামাক দিয়ে যা রাত হইয়াছে, আর এক ছিলুম তমাক খেয়ে শুতে যাই, কাল রাত্রিতেও গ্রীষ্মে বড় ঘুম হয় নাই, গাটা বড় ঘুম্ ঘুম্ করচে” ইত্যাদি।

উগ্রস্বভাব হেমচন্দ্রের মনে একটু রাগের সঞ্চার হইল, কিন্তু তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন তিনি বাস্তবিকই অসঙ্গত কথা বলিয়াছিলেন। যে জমী তারিণী বাবুর ন্যায় বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন লোক দশ বৎসর দখল করিয়া আসিয়াছেন সেটী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বলা অসঙ্গত নহে ত কি? ক্ষণেক চিন্তা করিয়া হেমচন্দ্র পুনরায় বলিলেনঃ—

“আপনার যদি শয়নের সময় হইয়া থাকে তবে আমি আর আপনাকে বসাইয়া রাখিব না. তবে আর একটী কথা আছে যদি আজ্ঞা করেন তবে নিবেদন করি”।

তারিণী। “না না তাড়াতাড়ি উঠিও না; অনেক দিনের পর তোমাকে দেখিলাম চক্ষু জুড়াইল, তোমাকে কি ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে? তবে বড় গ্রীষ্ম পড়িয়াছে তাই গাটা মাটি মাটি করে। তা এখনই আমি শুইতে যাইব না, বিলম্ব আছে, কি বলিতেছিলে বল।”

হেম। “আপনি সে জমী টুকু ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিবেন তাহা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, তবে সেই জমীর জন্য আমরা কিছু কি প্রত্যাশা

করিতে পারি? এ বিষয়ে মকদ্দমা করাতে আমাদের নিতান্ত অনিচ্ছা কোনও মতে আপসে এ বিষয়টা মিমাংসা হয় তাহাই আমাদের ইচ্ছা। যদি আদালতে যাইতে হয় তবে জমী এজমালী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে কি না এবং হইলেও আমরা এক অংশ পাইব কি না, বিবেচনা করিয়া দেখুন; কিন্তু আপসে নিষ্পত্তি হইলে আদালতে যাইতে আমাদিগের নিতান্ত অনিচ্ছা।"

হেমচন্দ্র উগ্রস্বভাব লোক সহসা আদালতে যাইতে পারেন, তিনি সেই জন্য সম্প্রতি উকিলদিগের পরামর্শ লইতেছেন, এ কথাগুলি তারিণী বাবু জানিতেন। আদালতে যদি হেমচন্দ্র মকদ্দমার ব্যয় বহন করিতে পারেন তবে শেষে কি ফল হইবে তাহাও তারিণী বাবু কতক কতক অনুভব করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আপসের কথায় বড় অসম্মত ছিলেন না। যৎকিঞ্চিৎ টাকা দিয়া হরিদাসের সত্ব একেবারে ক্রয় করিয়া লইবেন এরূপ মত পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু যে টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা বড় অল্প। বলিলেন,

"দেখ বাপু, যদি আদালত করিতে ইচ্ছা কর তবে অগত্যা আমাকেও সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে, আদালতের বিস্তর খরচ, কিন্তু সম্পত্তি রক্ষার্থ আমি বোধ হয় বহন করিতে পারিব, তুমি বহিতে পারিবে কি না, তুমিই ভাল জান। আর যদি সে কথা ছাড়িয়া দিয়া সত্যই আপসের কথা বল, তবে বিন্দুকে হাত তুলিয়া কিছু দিব তাহাতে আমার কি আপত্তি হইতে পারে? আমরা মূর্খ মানুষ, তোমাদের ন্যায় আইন কানুন দেখি নাই, কিন্তু বর্দ্ধমানে চাকুরি করিয়া আমার চুল পাকিয়া গিয়াছে, মকদ্দমাও বিস্তর দেখিয়াছি। মকদ্দমা করিয়া যে মল্লিক বংশের এজমালি সম্পত্তির এক অংশ ছাড়াইয়া লইতে পারিবে এমন বোধ হয় না, ইচ্ছা হয় চেষ্টা করিয়া দেখ। কিন্তু যদি সত্য সত্যই সে বুদ্ধি ছাড়িয়া দাও, যদি তোমাদের কালেজের ইংরাজী শিক্ষায় আত্মীয় সজনের সহিত বিবাদ করিতে না শিখাইয়া থাকে, যদি বুড়ো সুড়ো লোককে একটু শ্রদ্ধা করিয়া, তাহাদের একটু বশ হইয়া চলিতে শিখাইয়া থাকে, তবে সঙ্গত কথা বল, তাহাতে আমার কখনই অমত হইবে না। দেখ বাপু, আমি এক কথার মানুষ, ঘোর ফের বড় বুঝি ওনি ভালও বাসিনি, এক কথাই ভাল বাসি। যদি ৩০০ খানি

টাকা নিয়া এই জমী টুকুর সত্ব একেবারে ছাড়িয়া দাও তবে আমি সম্মত আছি। আমরা সামান্য বেতনের চাকুরি করি, ৩০০ টাকা করিতে অনেক মাথার ঘাম পায়ে পড়ে, টাকা বড় যত্নের ধন। তবে বিন্দু আমার ঘরের মেয়ে, তাকে হাতে করে মানুষ করেছি, তার বিয়ে দিয়েছি, তাকে টাকা দিব তাহাতে আর কথা কিসের? আমিই ত বিন্দুর বিয়ে দিয়েছি. না হয় আর একখানি ভাল গহনা দিলাম, তাতেও ত দুই তিন শত টাকা লাগিত। তা দেখ বাপু, বুড়োর এ কথায় যদি মত হয় ত দেখ, আর যদি মত না হয়, তোমরা ভাল লেখাপড়া শিখেছ, যেটা ভাল মনে হয় কর।"

হেম। "মহাশয় ৩০০ টাকা বড়ই অল্প বোধ হয়। সে জমীতে বৎসরে প্রায় ২০০ টাকার ধান হয়।"

তারিণী। "তাহার মধ্যে বিচ খরচ, জন খরচ, জমিদারের খাজনা, পথকর, বাজে খরচ ইত্যাদি দিয়া সালিয়ানা কত থাকে তাহা কি হিসাব করা হইয়াছে?"

হেম। "অল্পই থাকে বটে।"

তারিণী। "সে জমীটুকু রক্ষার্থ কত আমাকে খরচ করিতে হইয়াছে তাহা কি জানা আছে?"

হেম। "আজ্ঞে না, তা জানি নি।"

তারিণী। "তবে আর অল্প মূল্য হইল কি অধিক হইল তাহা কিরূপে বুঝিবে? দেখ বাপু, এ বিষয়ে আর তর্ক অনাবশ্যক, আমি এক কথার মানুষ ইহার উর্দ্ধ দিতে পারিব না। যদি ৩০১ টাকা চাহ তাহা দিতে পারিব না। আমি যাহা বলিলাম তাহাতে যদি মত না হয় অন্য পথ অবলম্বন কর।"

হেমচন্দ্র ক্ষণেক চিন্তা করিলেন। এরূপ মূল্য পাইয়া জমী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছেন মনে করিয়া তাঁহার মনে ক্ষোভ হইল; কিন্তু বিন্দুর সৎ পরামর্শ তাঁহার মনে পড়িল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—

"মহাশয় যাহা দিলেন তাহাই অনুগ্রহ, আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম।"

তারিণী বাবুর স্বাভাবিক প্রসন্ন মুখখানি সম্প্রতি কিছু রুক্ষ হইয়া আসিতেছিল, তাঁহার কথা হইতেই আমরা তাহা কিছু কিছু বুঝিয়াছি, কিন্তু

এক্ষণে সে মুখকান্তি সহসা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রসন্নতা লাভ করিল। হর্ষোৎফুল্ল লোচনে বলিলেন,

"তা বাবা, তুমি যে সম্মত হইবে তাহা ত জানাই আছে। তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলে কি আজ কাল আর দেখা যায়? কত দেখে শুনে তোমার সঙ্গে আমার বিন্দুর বিবাহ দিয়াছি, আমি কি না জেনে শুনেই কায করেছি? আর তুমি কালেজে লেখা পড়া শিখেছ, কালেজের ছেলে ভাল হইবে না কি আমাদের পাড়াগেঁয়ে ভূতেরা ভাল হবে? আজ তোমাকে দেখে যে কত আহ্লাদিত হইলাম তা আর তোমার সাক্ষাতে কি বলিব? আর দুটা পান খাও না।" "অরে হরে! বাড়ীর ভিতর থেকে দুটো পান এনে দেত।"

হেম। "আজ্ঞে না, আপনার ঘুমের সময় হইয়াছে আর বসব না।"

তারিণী। "কোথায় ঘুমের সময়? আমি দুই প্রহর রাত্রের পূর্ব্বে ঘুমাইতে যাই না। আবার কাল রাত্রিতে খুব ঘুম হইয়াছিল আজ একবারেই ঘুম পাইতেছে না।"

হেমচন্দ্র একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না।

তারিণী। "আর তুমি এত দিনের পর এলে, তোমাকে ফেলে ঘুম! দুটা কথাই কই। আর দেখ বাবু এই টাকাটা লইয়া একটা দলীল লিখিয়া দিলেই ভাল হয়। তোমরা কালেজের ছেলে তোমাদের কথাই দলীল, তবে কি জান একটা প্রথা আছে, সেটা অবলম্বন করিলেই ভাল হয়।"

হেম। "অবশ্য; যখন কোন কায করা যায়, নিয়ম অনুসারে করাই ভাল।"

তারিণী। "তাত বটেই, তোমরা ইংরাজী শিখিয়াছ তোমাদের কি আর এসব কথা বলিতে হয়। আর তোমরা যখন দলীল দিচ্ছ, বিন্দু যখন সই করিবে, আর তুমি যখন তাহাতেই সাক্ষী হইবে তখন রেজিষ্টরি করা বাহুল্য মাত্র। তবে একটা রীতি আছে।"

হেম। "অবশ্য আমি সাক্ষী হইব এবং দলীল রেজেষ্টরী হইবে; এরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে যাহা যাহা আবশ্যক তাহা সমস্তই হইবে।"

তারিণী। "তা বৈকি, তা কি তোমার মত ছেলেকে কি আর বুঝতে হয়? আর একটা কি জান দলীলের ষ্টাম্প খরচা আছে, রেজিষ্টরী আপিসে যাইতে গাড়ীভাড়া আছে, শেনাক্ত করে সাক্ষীর খরচা আছে, রেজেষ্টরী ফি আছে,

এ কাযটা যে ৮। ১০ টাকার কমে সম্পাদন হয় বোধ হয় না। তা বিন্দু আমার ঘরের ছেলে সে টাকা আর বিন্দুর কাছে লইতাম না তবে কি জান, এই ৩০০৲ টাকা দিতেই আমার ভারি কষ্ট হইবে, আর যে একটী পয়সা দিতে পারি আমার এমন বোধ হয় না।"

হেমচন্দ্র একটু হাসিলেন, মনে মনে করিলেন "তারিণী বাবু যাত্রায় এক রাত্রিতে একশত টাকা খরচ করেন, আমার দশ টাকা হইলে মাসের খরচা চলিয়া যায়!" প্রকাশ্যে বলিলেন "আজ্ঞে আচ্ছা, তাহাও দিতে আমি সম্মত হইলাম।"

তারিণী। "তা হবে বৈ কি, তোমার ন্যায় সুবোধ ছেলেকে কি আর এ সব কথা বলিতে হয়?"

আরও অনেকক্ষণ কথা হইল। বিষয়ী তারিণীবাবু একটী একটী করিয়া সমস্ত নিয়মগুলি আপনার সাপক্ষে স্থির করিয়া লইলেন, বিষয় বুদ্ধি হীন হেমচন্দ্র তাহাতে আপত্তি করিলেন না। রাত্রি দেড় প্রহরের পর তারিণীবাবু হেমচন্দ্রের অনেক প্রশংসা করিয়া এবং তাঁহাকে সত্বর বর্দ্ধমানে একটী চাকুরী করিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং তিনি কালে একজন ধনী জ্ঞানী মানী দেশের বড়লোক হইবেন আশ্বাস দিয়া হেমচন্দ্রকে বিদায় দিলেন। হেমচন্দ্রও শ্বশুর মহাশয়ের ভদ্রাচরণের অনেক স্তুতিবাদ করিয়া বাড়ী আসিতে লাগিলেন।

আমাদিগের লিখিতে লজ্জা হয় তারিণীবাবু ও হেমচন্দ্রের এই পরস্পরের প্রচুর মিষ্টালাপ ও স্তুতিবাদ তাঁহাদের হৃদয়ের প্রকৃতভাব ব্যক্ত করে নাই। হেমচন্দ্র বাড়ী আসিবার সময় মনে মনে ভাবিতেছিলেন, "শাইলককে পণের অল্প অংশ পরিত্যাগ করান যায় কিন্তু ধনী মানী বিষয়ী বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ কর্ম্মচারী তারিণীবাবুর পণ বিচলিত হয় না।" তারিণীবাবু ও তাঁহার গৃহিণীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া গৃহিণীকে বলিতেছিলেন "আজকাল কালেজের ছেলেগুলকি হারামজাদা; আর এই হেমই বা কি গোঁয়ার; বলে কি না] জাঠশ্বশুরের সঙ্গে মকর্দ্দমা করিবে! বলিতেও লজ্জা বোধ হয় না। শীঘ্র অধঃপতনে যাবে।" গৃহিণী এ কথাগুলি বড় শুনিলেন না, তিনি ধনবান কুটুম্বের কথা স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

কৃষ্ণচরিত্র।

আমরা এপর্য্যন্ত কৃষ্ণচরিত্র যতদূর সমালোচনা করিয়াছি, তাহাতে কৃষ্ণকে কোথাও বিষ্ণু বলিয়া পরিচিত হইতে দেখি নাই। কেহ তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধন বা বিষ্ণু জ্ঞানে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করে নাই। তাঁহাকেও এপর্য্যন্ত মনুষ্য শক্তির অতিরিক্ত শক্তিতে কোন কার্য্য করিতে দেখি নাই। তিনি বিষ্ণুর অবতার হউন বা না হউন, কৃষ্ণচরিত্রের স্থূল মর্ম্ম মনুষ্যত্ব, দেবত্ব নহে, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি।

কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হয়, যে মহাভারতের অনেক স্থানে তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধিত এবং পরিচিত হইতে দেখি। অনেকে বিষ্ণু বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে দেখি; এবং কদাচ কখন তাঁহাকে লোকাতীতা বৈষ্ণবী শক্তিতে কার্য্য করিতেও দেখি। এপর্য্যন্ত তাহা দেখি নাই, কিন্তু এখনই দেখিব। এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী কি না?

যদি কেহ বলেন, যে এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী নহে, কেন না যখন দৈব শক্তির বা দেবত্বের কোন প্রকার বিকাশের কোন প্রয়োজন নাই, তখন কাব্যে বা ইতিহাসে কেবল মনুষ্যভাব প্রকটিত হয়, আর যখন তাহার প্রয়োজন আছে, তখন দৈবভাব প্রকটিত হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব, যে এই উত্তর যথার্থ উত্তর হইল না। কেন না, নিষ্প্রয়োজনেই দৈবভাবের প্রকাশ অনেক সময়ে দেখা যায়। এই জরাসন্ধ বধ হইতেই দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

জরাসন্ধ বধের পর কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুন জরাসন্ধের রথ খানা লইয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেবনির্ম্মিত রথ, তাহাতে কিছুরই অভাব নাই। তবু খানখাই কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিলেন, স্মরণমাত্র

---

* কোথাও কোথাও কৃষ্ণার্জ্জুন নরনারায়ণ নামক প্রাচীন ঋষি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সে স্থানও প্রক্ষিপ্ত তাহাও দেখিয়াছি। এ সকল স্থলে ঋষির অর্থ কি? নরনারায়ণ একটা রূপক নহে কি?

গরুড় আসিয়া রথের চূড়ায় বসিলেন। গরুড় আসিয়া আর কোন কাজ করিলেন না, তাঁহাতে আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। কথাটারও আর কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, কেবল মাঝে হইতে কৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব সূচিত হয়। জরাসন্ধকে বধ করিবার সময় কোন দৈব শক্তির প্রয়োজন হইল না, কিন্তু রথে চড়িবার বেলা হইল!

আবার যুদ্ধের পূর্ব্বে, অমনি একটা কথা আছে। জরাসন্ধ যুদ্ধে স্থির-সঙ্কল্প হইলে, কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,

"হে রাজন্! আমাদের তিনজনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয় বল? কে যুদ্ধ করিতে সজ্জীভূত হইবে?" জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অথচ ইহার দুই ছত্র পূর্ব্বেই লেখা আছে যে, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার আদেশানুসারে স্বয়ং তাঁহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না!

এই ব্রহ্মার আদেশ কি, তাহা মহাভারতে কোথাও নাই। পরবর্ত্তী গ্রন্থে আছে। এখন পাঠকের বিশ্বাস হয় না কি, যে এইগুলি, আদিম মহাভারতের মূলের উপর পরবর্ত্তী লেখকেব কারিগরি? আর কৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব ভিতরে ভিতরে খাড়া রাখা ইহাব উদ্দেশ্য। আদিম স্তরের মূলে কৃষ্ণবিষ্ণুতে কোনরূপ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া হয় নাই, কেন না কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র, দেবচরিত্র নহে। যখন ইহাতে কৃষ্ণোপাসক দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত পড়িল, তখন এটা বড় ভুল বলিয়া বোধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী কবিকল্পনাটা তাঁহার জানা ছিল, তিনি অভাবটা পূরণ করিয়া দিলেন।

এইরূপ, যেখানে বন্ধনবিমুক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ কৃষ্ণকে "ধর্ম্মরক্ষার" জন্য ধন্যবাদ করিতেছেন, সেখানেও দেখি, কোথাও কিছু নাই, খানকা তাঁহারা কৃষ্ণকে "বিষ্ণো!" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। এখন, ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখা যায় না, যে তিনি বিষ্ণু বা তদর্থক অন্য নামে সম্বোধিত হইয়াছেন। যদি এমন দেখিতাম, যে ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণ এরূপ নামে মধ্যে মধ্যে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে বুঝিতাম যে ইহাতে অসঙ্গত বা অনৈসর্গিক কিছুই নাই, লোকের এমন বিশ্বাস আছে বলিয়াই

ইহা হইল। যদি এমন দেখিতাম, যে এই সময়ে কৃষ্ণ কোন অলৌকিক কাজ করিয়াছেন, তাহা দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের সাধ্য নহে, তাহা হইলেও হঠাৎ এ "বিষ্ণো!" সম্বোধনের সম্ভাবিতা বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু কৃষ্ণ তেমন কিছুই কাজ করেন নাই। তিনি জরাসন্ধকে বধ করেন নাই,—সর্ব্বলোক সমক্ষে ভীম তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। সে কার্য্যের প্রবর্ত্তক কৃষ্ণ বটে, কিন্তু কারাবাসী রাজগণ তাঁহার কিছুই জানেন না। অতএব কৃষ্ণে অকস্মাৎ রাজগণ কর্ত্তৃক এই বিষ্ণুত্ব আরোপ কখন ঐতিহাসিক বা মৌলিক হইতে পারে না। কিন্তু উহা ঐ গরুড় স্মরণ ও ব্রহ্মার আদেশ স্মরণের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গত, জরাসন্ধ বধের আর কোন অংশের সঙ্গে সঙ্গত নহে। তিনটি কথা এক হাতের কারিগরি—আর তিনটা কথাই মূলাতিরিক্ত। বোধ হয়, ইহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

যাঁহারা বলিবেন, তাহা হয় নাই, তাঁহাদিগের এ কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনের অনুবর্ত্তী হইবার আর কোন ফল দেখি না। কেন না, এ সকল বিষয়ে অন্য কোন প্রকার প্রমাণ সংগ্রহের সম্ভাবনা নাই। আর এই সমালোচনায় যাঁহাদের এমন বিশ্বাস হইয়াছে যে জরাসন্ধ বধ মধ্যে কৃষ্ণের এই বিষ্ণুত্ব সূচনা পরবর্ত্তী কবি প্রণীত ও প্রক্ষিপ্ত, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, তবে কৃষ্ণের ছদ্মবেশ ও কপটাচার বিষয়ক যে কয়েকটি কথা এই জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায়ে আছে, তাহাও ঐরূপ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিব না কেন? দুই বিষয়ই ঠিক একই প্রমাণের উপর নির্ভর করে।

বস্তুতঃ এই দুই বিষয় একত্র করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে, যে এই জরাসন্ধ বধ পর্ব্বাধ্যায়ে পরবর্ত্তী কবির বিলক্ষণ কারিগরি আছে, এবং এই সকল অসঙ্গতি তাহারই ফল। দুই কবির যে হাত আছে তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি।

জরাসন্ধের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে বিবৃত করিলেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই সঙ্গে, কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের কংসবধ জনিত যে বিরোধ তাহারও পরিচয় দিলেন। তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃতও করিয়াছি। তাহার পরেই মহাভারত-কার কি বলিতেছেন, শুনুন।

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহদ্রথ ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে তপোবনে

বহুদিবস তপোহনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহারা জরাসন্ধ ও চণ্ডকৌশিকোক্ত সমুদায় বর লাভ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ বাসুদেব কংস নরপতিকে সংহার করেন। কংসনিপাত নিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শত্রুতা জন্মিল।"

এ সকলই ত কৃষ্ণ বলিয়াছেন—আরও সবিস্তারে বলিয়াছেন—আবার সে কথা কেন? প্রয়োজন আছে। মূল মহাভারত প্রণেতা অদ্ভুত রসে বড় রসিক নহেন—কৃষ্ণ অলৌকিক ঘটনা কিছুই বলিলেন না। সে অভাব এখন পূরিত হইতে চলিল। বৈশম্পায়ন বলিতেছেন,

"মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ গিরিশ্রেণী মধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের বধার্থে এক বৃহৎ গদা একোনশত বার ঘূর্ণায়মান করিয়া নিক্ষেপ করিল। গদা মথুরাস্থিত অদ্ভুত কর্ম্মঠ বাসুদেবের একোনশত যোজন অন্তরে পতিত হইল। পৌরগণ কৃষ্ণ সমীপে গদা পতনের বিষয় নিবেদন করিল। তদবধি সেই মথুরার সমীপবর্ত্তী স্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল।"

এখনও যদি কোন পাঠকের বিশ্বাস থাকে, যে বর্ত্তমান জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায়ের সমুদায় অংশই মূল মহাভারতের অন্তর্গত এবং একব্যক্তি প্রণীত, এবং কৃষ্ণাদি যথার্থই ছদ্মবেশে গিরিব্রজে আসিয়াছিলেন, তবে তাঁহাকে অনুরোধ করি হিন্দুদিগের পুরাণেতিহাস মধ্যে ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া অন্য শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন। এদিগে কিছু হইবে না।

অতঃপর, জরাসন্ধ বধের অবশিষ্ট কথাগুলি বলিয়া এ পর্ব্বাধ্যায়ের উপসংহার করিব। সে সকল খুব সোজা কথা।

জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ ভীমকে মনোনীত করিলে, জরাসন্ধ "যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে বর্ম্ম ও কিরীট পরিত্যাগ পূর্ব্বক" যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। "তখন যাবতীয় পুরবাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বনিতা ও বৃদ্ধগণ তাঁহাদের সংগ্রাম দেখিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা সমাকীর্ণ হইল।" "চতুর্দ্দশ দিবস যুদ্ধ হইল।" (যদি সত্য হয়, বোধ হয় তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত যুদ্ধ হইত) চতুর্দ্দশ দিবসে "বাসুদেব জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

হে কৌন্তেয়! ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নহে: অধিকতর পীড্যমান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে। অতএব ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভারতর্ষভ! ইঁহার সহিত বাহুযুদ্ধ কর।” (অর্থাৎ যে শত্রুকে ধর্ম্মতঃ বধ করিতে হইবে, তাহাকেও পীড়ন কর্ত্তব্য নহে)। ভীম জরাসন্ধকে পীড়ন করিয়াই বধ করিলেন। তাই তখন বলিয়াছিলাম, ভীমের ধর্ম্মজ্ঞান দ্বিপাদ মাত্র।

তখন কৃষ্ণার্জ্জুন ও ভীম কারাবদ্ধ মহীপালগণকে বিমুক্ত করিলেন। তাহাই জরাসন্ধ বধের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব রাজগণকে মুক্ত করিয়া আর কিছুই করিলেন না, দেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা Annexationist ছিলেন না— পিতার অপরাধে পুত্রের রাজ্য অপহরণ করিতেন না, তাঁহারা জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়া জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সহদেব কিছু নজর দিল তাহা গ্রহণ করিলেন। কারামুক্ত রাজগণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

“এক্ষণে এই ভৃত্যদিগকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।”

কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কহিলেন, “রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্য-চিকীর্ষু ধার্ম্মিকের সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনা।”

যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্রস্থিত করিয়া ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপন করা, কৃষ্ণের এক্ষণে জীবনের উদ্দেশ্য। অতএব প্রতিপদে তিনি তাহার উদ্যোগ করিতেছেন।

এই জরাসন্ধ বধে কৃষ্ণচরিত্রের বিশেষ মহিমা প্রকাশমান—কিন্তু পরবর্ত্তী লেখকদিগের দৌরাত্ম্যে ইহা বড় জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর শিশুপাল বধ। সেখানে আরও গণ্ডগোল।

সীতারাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সীতারামের যেমন তিনজন সহায় ছিল, তেমনি তাঁহার এই মহৎ কার্য্যে একজন পরম শত্রু ছিল। শত্রু—তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী রমা।

বিবাদে রমার বড় ভয়। সীতারামের সাহসকে ও বীর্য্যকে রমার বড় ভয়। বিশেষ মুসলমান রাজা, তাহাদের সঙ্গে বিবাদে রমার বড় ভয়। তার উপর আবার রমা ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন যে, মুসলমানেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া তাঁহাকে এবং সীতারামকে ধরিয়া প্রহার করিতেছে। এখন রমা সেই অসংখ্য মুসলমানের দন্তশ্রেণীপ্রভাসিত বিশাল শশ্রুল বদনমণ্ডল রাত্রিদিন চক্ষে দেখিতে লাগিল। তাহাদের বিকট চীৎকার রাত্রিদিন কানে শুনিতে লাগিল। রমা সীতারামকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল যে ফৌজদারের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়—মুসলমান দয়া করিয়া ক্ষমা করিবে। সীতারাম সে কথায় কান দিলেন না—রমাও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। সীতারাম বুঝাইলেন, যে তিনি মুসলমানের কাছে কোন অপরাধ করেন নাই—রমা তত বুঝিতে পারিল না। শ্রাবণ মাসের মত, রাত্রি দিন রমার চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া সীতারাম, আর তত রমার দিগে আসিতেন না। কাজেই জ্যেষ্ঠা (শ্রীকে গণিয়া মধ্যমা) পত্নী নন্দার একাদশে বৃহস্পতি লাগিয়া গেল।

দেখিয়া, বালিকাবুদ্ধি রমা আরও পাকা রকম বুঝিল, যে মুসলমানের, সঙ্গে এই বিবাদে, তাঁহার ক্রমে সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব রমা উঠিয়া পড়িয়া সীতারামের পিছনে লাগিল। কাঁদাকাটি, হাতে ধরা পায়ে পড়া, মাথা খোঁড়াব জ্বালায় রমা যে অঞ্চলে থাকিত, সীতারাম আর সে প্রদেশ মাড়াইতেন না। তখন রমা, যে পথে তিনি নন্দার কাছে যাইতেন, সেই পথে লুকাইয়া থাকিত; সুবিধা পাইলেই সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইত; তার পর—সেই কাঁদাকাটি, হাতে ধরা, পায়ে পড়া মাথা খোঁড়া.—ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্—কখনও মূষলের ধার, কখন ইল্‌সে গুড়ুনি, কখনও কাল বৈশাখী, কখন কার্ত্তিকে ঝড়। ধুয়োটা সেই এক—মুসলমানের পায়ে কাঁদিয়া গিয়া পড়—নহিলে কি বিপদ ঘটিবে! সীতারামের হাড় জ্বালাতন হইয়া উঠিল।

তার পর যখন রমা দেখিল, মহম্মদপুর ভূষণের অপেক্ষাও শোভাময়ী জনাকীর্ণা রাজধানী হইয়া উঠিল, তাহার গড়খাই, প্রাচীর, পরিখা, তাহার উপর কামান সাজান, সেলেখানা গোলাগুলি কামান বন্দুক নানা অস্ত্রে পরি-

পূর্ণ, দলে দলে সিপাহী কাওয়াজ করিতেছে, তখন রমা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, বিছানা লইল। যখন একবার পূজাহ্নিকের জন্য, শয্যা হইতে উঠিত, তখন রমা ইষ্টদেবের নিকট নিত্য যুক্তকরে প্রার্থনা করিত—"হে ঠাকুর! মহম্মদপুর ছারে খারে যাক্—আমরা আবার মুসলমানের অনুগত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে দিনপাত করি! এ মহাভয় হইতে আমাদের উদ্ধার কর।" সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহার সম্মুখেই রমা দেবতার কাছে সেই কামনা করিত।

পাঠক দেখিয়াছেন, সীতারাম নন্দার অপেক্ষা রমাকেই ভাল বাসিতেন। বলা বাহুল্য রমার এই বিরক্তিকর আচরণে রমা তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। তখন সীতারাম মনে মনে বলিতেন, "হায়! এ দিনে যদি শ্রী আমার সহায় হইত!" শ্রী রাত্রিদিন তাঁহার মনে জাগিতেছিল। শ্রী স্মরণ-পাটস্থা মূর্ত্তির কাছে নন্দাও নয়, রমাও নয়। কিন্তু মনের কথা জানিতে পারিলে রমা কি নন্দা পাছে মনে ব্যথা পায়, এ জন্য সীতারাম কখন শ্রীর নাম মুখে আনিতেন না। তবে রমার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "হায়! শ্রীকে ত্যাগ করিয়া কি রমাকে পাইলাম!"

রমা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "তা শ্রীকে গ্রহণ কর না কেন? কে তোমায় নিষেধ করে?"

সীতারাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "শ্রীকে এখন আর কোথায় পাইব।" কথাটা রমার হাড়ে হাড়ে লাগিল। রমার অপরাধ যাই হৌক, স্বামীর প্রতি আত্যন্তিক স্নেহই তাহার মূল। পাছে স্বামীর কোন বিপদ ঘটে এই চিন্তাতেই সে এত ব্যাকুল। সীতারাম তাহা না বুঝিতেন, এমন নহে। বুঝিয়াও রমার প্রতি প্রসন্ন থাকিতে পারিলেন না—বড় ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্—বড় কাজের বিঘ্ন—বড় যন্ত্রণা! স্ত্রীপুরুষে পরস্পরে ভালবাসাই দাম্পত্য সুখ নহে, একাভিসন্ধি—সহৃদয়তা—ইহাই দাম্পত্য সুখ। রমা বুঝিল, বিনাপরাধে আমি স্বামীর স্নেহ হারাইয়াছি। সীতারাম ভাবিল, "গুরুদেব! রমার ভালবাসা হইতে আমায় উদ্ধার কর।"

রমার দোষে, সীতারামের হৃদয়স্থিত সেই চিত্রপট দিন দিন আরও উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট হইতে লাগিল। সীতারাম মনে করিয়াছিলেন, হিন্দুর রাজ্য

সংস্থাপন ভিন্ন আর কিছুকেই তিনি মনে স্থান দিবেন না—কিন্তু এখন শ্রী আসিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সিংহাসনের আধখানা জুড়িয়া বসিল। সীতারাম মনে করিলেন, আমি শ্রীর কাছে যে পাপ করিয়াছি, রমার কাছে তাহার দণ্ড পাইতেছি। ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত চাই।

কিন্তু এ মন্দিরে, এ প্রতিমা স্থাপনে যে রমাই একা ব্রতী, এমত নহে। নন্দাও তাহার সহায়—কিন্তু আর এক রকমে। মুসলমান হইতে নন্দার কোন ভয় নাই। যখন সীতারামের সাহস আছে, তখন নন্দার সে কথার আন্দোলনে প্রয়োজন নাই। নন্দা বিবেচনা করিত, সে কথার ভাল মন্দের বিচারক আমার স্বামী—তিনি যদি ভাল বুঝেন, তবে আমার সে ভাবনায় কাজ কি। তাই নন্দা সে সকল কথাকে মনে স্থান না দিয়া, প্রাণপাত করিয়া পতিপদ সেবায় নিযুক্তা। লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দিরে ফকির যে উপদেশ দিয়াছিলেন, নন্দা তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতেছিলেন। মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, দাসীর মত সেবা. সীতারাম সকলই নন্দার কাছে পাইতেছিলেন। কিন্তু সহধর্ম্মিণী কই? যে তাঁহার উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী, সে কই? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল, কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই? তাই নন্দার ভালবাসায়, সীতারামের পদে পদে শ্রীকে মনে পড়িত, পদে পদে সেই সংক্ষুব্ধ-সৈন্য-সঞ্চালিনীকে মনে পড়িত! "মার! মার! শত্রু মার! দেশের শত্রু, হিন্দুর শত্রু, আমার শত্রু, মার!"—সেই কথা মনে পড়িত। সীতারাম তাই মনে মনে সেই মহিমাময়ী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি পূজা করিতে লাগিলেন।

প্রেম কি, তাহা আমি জানি না। দেখিল আর মজিল, আর কিছু মানিল না, কই এমন দাবানল ত সংসারে দেখিতে পাই না। প্রেমের কথা পুস্তকে পড়িয়া থাকি বটে, কিন্তু সংসারে "ভালবাসা," স্নেহ ভিন্ন প্রেমের মত কোন সামগ্রী, দেখিতে পাই নাই, সুতরাং তাহার বর্ণনা করিতে পারিলাম না। প্রেম, যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশকুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে, যুবক যুবতীগণের মনোরঞ্জন জন্য কবিগণ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বোধ হয়। তবে একটা কথা স্বীকার করিতে হয়। ভালবাসা বা

স্নেহ, যাহা সংসারে এত আদরের, তাহা পুরাতনেরই প্রাপ্য, নূতনের প্রতি জন্মে না। যাহার সংসর্গে অনেক কাল কাটাইয়াছি, বিপদে সম্পদে, সুদিনে দুর্দ্দিনে, যাহার গুণ বুঝিয়াছি, সুখ দুঃখের বন্ধনে যাহার সঙ্গে বদ্ধ হইয়াছি, ভালবাসা বা স্নেহ তাহারই প্রতি জন্মে। কিন্তু নূতন, আর একটা সামগ্রী পাইয়া থাকে। নূতন বলিয়াই তাহার একটা আদর আছে। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও আছে। তাহার গুণ জানি না, কিন্তু চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারি। যাহা পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ; যাহা অপরীক্ষিত, কেবল অনুমিত, তাহার সীমা দেওয়া না দেওয়া মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই নূতনের গুণ অনেক সময়ে অসীম বলিয়া বোধ হয়। তাই সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময়ে ভাসিয়া যায়। শ্রী সীতারামের পক্ষে নূতন। শ্রীর প্রতি সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল। তাহার স্রোতে, নন্দা রমা ভাসিয়া গেল।

হায় নূতন! তুমিই কি সুন্দর? না, সেই পুরাতনই সুন্দর। তবে, তুমি নূতন! তুমি অনন্তের অংশ। অনন্তের একটু খানি মাত্র আমরা জানি। সেই একটু খানি আমাদের কাছে পুরাতন; অনন্তের আর সব আমাদের কাছে নূতন। অনন্তের যাহা অজ্ঞাত, তাহাও অনন্ত। তাই নূতন, তুমি অনন্তেরই অংশ। তাই তুমি এত উন্মাদকর। শ্রী, আজ সীতারামের কাছে —অনন্তের অংশ।

হায়! তোমার আমার কি নূতন মিলিবে না? তোমার আমার কি শ্রী মিলিবে না? মিলিবে বৈ কি? যে দিন সব পুরাতন ছাড়িয়া যাইব, সেই দিন সব নূতন পাইব, অনন্তের সম্মুখে মুখামুখী হইয়া দাঁড়াইব। নয়ন মুদিলে শ্রী মিলিবে। তত দিন, এসো, আমরা আশায় বুক বাঁধিয়া, হরিনাম করি। হরিনামে অনন্ত মিলে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

এই ত বৈতরণী! পার হইলে না কি সকল জ্বালা জুড়ায়? আমার জ্বালা জুড়াইবে কি?"

খরবাহিনী বৈতরণী সৈকতে দাঁড়াইয়া একাকিনী শ্রী এই কথা বলিতেছিল। পশ্চাতে অতি দূরে নীল মেঘের মত নীলগিরির * শিখরপুঞ্জ দেখা যাইতেছিল; সম্মুখে নীলসলিলবাহিনী বক্রগামিনী তটিনী রজতপ্রস্তরবৎ বিস্তৃত সৈকত মধ্যে বাহিতা হইতেছিল; পরে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলীর উপর সপ্তমাতৃকার মণ্ডপ শোভা পাইতেছিল; তন্মধ্যে আসীনা সপ্ত মাতৃকার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিও কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল, রাজশ্রীশোভা-সমান্বিতা ইন্দ্রাণী, মধুররূপিণী বৈষ্ণবী, কৌমারী, ব্রহ্মাণী, সাক্ষাৎ বীভৎস রসরূপধারিণী যমপ্রসূতী ছায়া, নানালঙ্কারভূষিতা বিপুলোরুকরচরণোরসী কম্বুকণ্ঠান্দোলিতরত্নহারা লম্বোদরা চীনাম্বরা বরাহবদনা বারাহী, বিশুষ্কাস্থিচর্ম্মমাত্রাবশেষা লুলিতকেশা নগ্নবেশা খণ্ডমুণ্ডধারিণী ভীষণা চামুণ্ডা, রাশি রাশি কুসুম চন্দন বিল্বপত্রে প্রপীড়িতা হইয়া বিরাজ করিতেছে। তৎপশ্চাতে বিষ্ণুমণ্ডপের উচ্চচূড়া নীলাকাশে চিত্রিত; তৎপরে নীলপ্রস্তরের উচ্চস্তম্ভোপরি আকাশমার্গে খগপতি গরুড় সমাসীন। অতিদূরে উদয়গিরি ও ললিতগিরির বিশাল নীল কলেবর আকাশ প্রান্তে শয়ান। † এই সকলের প্রতি শ্রী চাহিয়া দেখিল; বলিল,—"হায়! এই ত বৈতরণী! পার হইলে আমার জ্বালা জুড়াইবে কি?"

"এ সে বৈতরণী নহে—
যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী—
আগে যমদ্বারে উপস্থিত হও—তবে সে বৈতরণী দেখিবে।

---

* বালেশ্বর জেলার উত্তর ভাগস্থিত কতকগুলি পর্ব্বতকে নীলগিরি বলে। তাহাই কোন কোন স্থানে বৈতরিণী তীর হইতে দেখা যায়।

† পুরুষোত্তম যাইবার আধুনিক যে রাজপথ, এই সকল পর্ব্বত, তাহার বাম থাকে। নিকট নহে।

পিছন হইতে শ্রীর কথার কেহ এই উত্তর দিল। শ্রী ফিরিয়া দেখিল এক ভৈরবী।

শ্রী বলিল, "ও মা! সেই ভৈরবী! তা, মা, যমদ্বার বৈতরণীর এ পারে না ও পারে?"

ভৈরবী হাসিল; বলিল, "বৈতরণী পার হইয়া যমপুরে পৌছিতে হয়। কেন মা, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে? তুমি এ পারেই যমযন্ত্রণা ভোগ করিতেছ?"

শ্রী। যন্ত্রণা বোধ হয় দুই পারেই আছে।

ভৈরবী। না, মা, যন্ত্রণা সব এই পারেই। ওপারে যে যন্ত্রণার কথা শুনিতে পাও, সে আমরা এই পার হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই। আমাদের এ জন্মের সঞ্চিত পাপগুলি আমরা গাঁটরি বাঁধিয়া, বৈতরণীর সেই ক্ষেয়ারীর ক্ষেয়ায় বোঝাই দিয়া বিনা কড়িতে পার করিয়া লইয়া যাই। পরে যমালয়ে গিয়া গাঁটরি খুলিয়া ধীরে সুস্থে সেই ঐশ্বর্য্য একা একা ভোগ করি।

শ্রী। তা, মা, বোঝাটা এ পারে রাখিয়া যাইবার কোন উপায় আছে কি? থাকে ত আমায় বলিয়া দাও, আমি শীঘ্র শীঘ্র উহার বিলি করিয়া, বেলায় বেলায় পার হইয়া চলিয়া যাই, রাত করিবার দরকার দেখি না—

ভৈরবী। এত তাড়াতাড়ি কেন মা? এখনও তোমার সকাল বেলা।

শ্রী। বেলা হ'লে বাতাস উঠিবে।

ভৈরবীর আজিও তুফানের বেলা হয় নাই—বয়সটা কাঁচা রকমের। তাই শ্রী এই রকমের কথা কহিতে সাহস করিতেছিল। ভৈরবীও সেই রকম উত্তর দিল "তুফানের ভয় কর না! কেন তোমার কি তেমন পাকা মাঝি নাই?

শ্রী। পাকা মাঝি আছে, কিন্তু তাঁর নৌকায় উঠিলাম না। কেন তাঁর নৌকা ভারি করিব?

ভৈরবী। তাই কি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বৈতরিণী তীরে আসিয়া বসিয়া আছ?

শ্রী। আরও পাকা মাঝির সন্ধানে যাইতেছি। শুনিয়াছি শ্রীক্ষেত্রে যিনি বিরাজ করেন, তিনিই নাকি পারের কাণ্ডারী।

ভৈরবী। আমিও সেই কাণ্ডারী খুঁজিতে যাইতেছি। চল না দুই জনে একত্রে যাই। কিন্তু আজ তুমি একা কেন? সে দিন সুবর্ণরেখাতীরে তোমাকে দেখিয়াছিলাম। তখন তোমার সঙ্গে অনেক লোক ছিল—আজ একা কেন?

শ্রী। আমার কেহ নাই। অর্থাৎ আমার অনেক আছে কিন্তু আমি ইচ্ছাক্রমে সর্ব্বত্যাগী। আমি এক যাত্রীর দলে যুটিয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইতে-ছিলাম, কিন্তু যে যাত্রাওয়ালার (পাণ্ডা) সঙ্গে আমরা যাইতেছিলাম, তিনি আমার প্রতি কিছু কৃপাদৃষ্টি করার লক্ষণ দেখিলাম। কিছু দৌরাত্ম্যের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া কালি রাত্রে যাত্রার দল হইতে সরিয়া পড়িয়া-ছিলাম।

ভৈরবী। এখন?

শ্রী। এখন, বৈতরণী তীরে আসিয়া ভাবিতেছি, দুই বার পারে কাজ নাই। একবারই ভাল। জল যথেষ্ট আছে।

ভৈরবী। সে কথাটা না হয় তোমায় আমায় দুই দিন বিচার করিয়া দেখা যাইবে। তার পর বিচারে যাহা স্থির হয় তাহাই করিও। বৈতরণীত তোমার ভয়ে পলাইবে না। কেমন আমার সঙ্গে আসিবে কি?

শ্রীর মন টলিল। শ্রীর এক পয়সা পুঁজি নাই। দল ছাড়িয়া আসিয়া অবধি আহার হয় নাই। শ্রী দেখিতেছিল, ভিক্ষা এবং মৃত্যু, এই দুই ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই ভৈরবীর সঙ্গে যেন উপায়ান্তর হইতে পারে বোধ হইল। কিন্তু তাহাতেও সন্দেহ উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল,

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি মা? তুমি দিনপাত কর কিসে?"

ভৈরবী। ভিক্ষায়।

শ্রী। আমি তাহা পারিব না—বৈতরণী তাহার অপেক্ষা সহজ বোধ হইতেছিল।

ভৈরবী। তাহা তোমায় করিতে হইবে না—আমি তোমার হইয়া ভিক্ষা করিব।

শ্রী। বাছা, তোমার এই বয়স—তুমি আমার অপেক্ষা ছোট বৈ বড় হইবে না। তোমার এই রূপের রাশি—

ভৈরবী অতিশয় সুন্দরী—বুঝি শ্রীর অপেক্ষাও সুন্দরী। কিন্তু রূপ ঢাকিবার জন্য আচ্ছা করিয়া বিভূতি মাখিয়াছিল। তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়াছিল—ঘসা কাচের ভিতর আলোর মত রূপের আগুণ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীর কথার উত্তরে ভৈরবী বলিল, "আমরা উদাসীন, সংসার-ত্যাগী, আমাদের কিছুতেই কোন ভয় নাই। ধর্ম্ম আমাদের রক্ষা করেন।"

শ্রী। তা যেন হইল। তুমি ভৈরবী বলিয়া নির্ভয়। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে, বিল্বপত্রের সঙ্গে পোকার মত বেড়াইব কি প্রকারে? তুমিই বা লোকের কাছে এ পোকার কি পরিচয় দিবে? বলিবে কি যে উড়িয়া আসিয়া গায়ে পড়িয়াছে?

ভৈরবী হাসিল—ফুল্লাধরে সে মধুর হাসিতে বিদ্যুদ্দীপ্ত মেঘাবৃত আকাশের ন্যায়, সেই ভস্মাবৃত রূপমাধুরী প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। শ্রী ভাবিল "পুরুষ থাকিলে ভাবিত—এ ভৈরবীই বটে!"

ভৈরবী বলিল, "তুমিও কেন বাছা এই বেশ গ্রহণ কর না?"

শ্রী শিহরিয়া উঠিল,—বলিল, "সে কি? আমি ভৈরবী হইবার কে?"

ভৈরবী। আমি তাহা হইতে বলিতেছি না। আর তুমি যখন সর্ব্ব-ত্যাগী হইয়াছ বলিতেছ, তখন তোমার চিত্তে যদি পাপ না থাকে, তবে হইলেই বা দোষ কি? কিন্তু এখন সে কথা থাক—এখন তা বলিতেছি না। এখন এই ছদ্মবেশ স্বরূপ গ্রহণ কর না—তাতে দোষ কি?

শ্রী। মাথা মুড়াইতে হইবে? আমি সধবা।

ভৈরবী। আমি মাথা মুড়াই নাই দেখিতেছ।

শ্রী। জটা ধারণ করিয়াছ?

ভৈরবী। না, তাও করি নাই। তবে চুলগুলাতে কখন তেল দিই না, ছাই মাখিয়া রাখি, তাই কিছু জট পড়িয়া থাকিবে।

শ্রী। চুলগুলি যেরূপ কুণ্ডলী করিয়া ফণা ধরিয়া আছে, আমার ইচ্ছা করিতেছে একবার তেল দিয়া আঁচড়াইয়া, বাঁধিয়া দিই।

ভৈরবী। জন্মান্তরে হইবে,—যদি মানব দেহ পাই। এখন তোমায় ভৈরবী সাজাইব কি?

শ্রী। কেবল চুলে ছাই মাখাইলেই কি সাজ হইবে?

ভৈরবী। না—গৈরিক, রুদ্রাক্ষ, বিভূতি, সব আমার এই রাঙ্গা ঝুলিতে আছে। সব দিব।"

শ্রী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া সম্মত হইল। তখন নিভৃত এক বৃক্ষতলে বসিয়া সেই রূপসী ভৈরবী শ্রীকে আর এক রূপসী ভৈরবী সাজাইল। কেশদামে ভস্ম মাখাইল, অঙ্গে গৈরিক পরাইল, কণ্ঠে ও বাহুতে রুদ্রাক্ষ পরাইল, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন করিল, পরে রঙ্গের দিকে মন দিয়া শ্রীর কপালে একটি রক্ত চন্দনের টিপ দিয়া দিল। তখন ভুবনবিজয়াভিলাষী মধুমন্মথের ন্যায় দুইজনে যাত্রা করিয়া বৈতরণী পার হইয়া, সে দিন এক দেব মন্দিরের অতিথিশালায় রাত্রি যাপন করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া, খরস্রোতো * জলে যথাবিধি স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া শ্রী ও ভৈরবী, বিভূতি রুদ্রাক্ষাদি-শোভিতা হইয়া পুনরপি "সঞ্চারিণী দীপশিখা" দ্বয়ের ন্যায় শ্রীক্ষেত্রের পথ আলো করিয়া চলিল। তৎপ্রদেশ-বাসীরা সর্ব্বদাই নানাবিধ যাত্রীকে সেই পথে যাতায়াত করিতে দেখে, কোন প্রকার যাত্রী দেখিয়া বিস্মিত হয় না, কিন্তু আজ ইহাদিগকে দেখিয়া তাহারাও বিস্মিত হইল। কেহ বলিল, "কি পরি মাইকিনিয়া মানে যাউছন্তি পারা ?" কেহ বলিল, "সে মানে দ্যাবতা হ্যাব।" কেহ আসিয়া প্রণাম করিল; কেহ ধন দৌলত বর মাগিল। একজন পণ্ডিত, তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিল, "কিছু বলিও না; ইহারা বোধ হয় রুক্মিণী সত্যভামা স্বশরীরে স্বামীদর্শনে যাইতেছেন।" অপরে মনে করিল যে রুক্মিণী সত্যভামা শ্রীক্ষেত্রেই আছেন, তাঁহাদিগের গমন সম্ভব নহে, অতএব নিশ্চয়ই ইহারা শ্রীরাধিকা এবং চন্দ্রাবলী, গোপকন্যা বলিয়া পদব্রজেই যাইতেছেন। এই

---

* নদীর নাম।

দ কাস্ত স্থিরীকৃত হইলে, এক দুষ্টা স্ত্রী বলিল, "হউ হউ! যা! যা! সে ঠিরে তা ভঁউড়ী * অচ্ছি; তুমানঙ্কো মারি পাকাইব।"

এদিকে শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী আপন মনে কথোপকথন করিতে করিতে যাইতেছিল। ভৈরবী বৈরাগিনী, প্রব্রজিতা, অনেক দিন হইতে তাহার পক্ষে সুহৃৎ কেহ নাই; আজ একজন সমবয়স্কা প্রব্রাজিতাকে পাইয়া তাহার চিত্ত একটু প্রফুল্ল হইয়াছিল। এখনও তার জীবনস্রোতঃ কিছুই শুকায় নাই। বরং শ্রীর শুকাইয়া ছিল, কেন না শ্রী দুঃখ কি তাহা জানিয়াছিল, সন্ন্যাসী বৈরাগীর দুঃখ নাই। কথাবার্ত্তা যাহা হইতেছিল, তাহার মধ্যে গোটা দুই কথা কেবল পাঠককে শুনান আবশ্যক।

ভৈরবী। তুমি বলিতেছ, তোমার স্বামী আছেন। তিনি তোমাকে লইয়া ঘর সংসার করিতেও ইচ্ছুক। তাতে তুমি গৃহত্যাগিনী হইয়াছ কেন, তাও তোমায় জিজ্ঞাসা করি না। কেন না তোমার ঘরের কথা আমার জানিয়া কি হইবে? তবে এটা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, যে কখন ঘরে ফিরিয়া যাইবার তোমার ইচ্ছা আছে কি না?

শ্রী। তুমি হাত দেখিতে জান?

ভৈরবী। না। হাত দেখিয়া কি তাহা জানিতে হইবে?

শ্রী। না। তাহা হইলে আমি তোমাকে হাত দেখাইয়া, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, সে বিষয় স্থির করিতাম।

ভৈরবী। আমি হাত দেখিতে জানি না। কিন্তু তোমাকে এমন লোকের কাছে লইয়া যাইতে পারি, যে তিনি এ বিদ্যায় ও আর সকল বিদ্যাতেই অভ্রান্ত।

শ্রী। কোথায় তিনি?

ভৈরবী। ললিতগিরিতে হস্তী গুম্ফায় এক যোগী বাস করেন। আমি তাঁহার কথা বলিতেছি।

শ্রী। ললিতগিরি কোথায়?

ভৈরবী। আমরা চেষ্টা করিলে আজ সন্ধ্যার পর পৌঁছিতে পারি।

শ্রী। তবে চল।

---

* সুভদ্রা।

তখন দুই জনে ক্রতগতি চলিতে লাগিল। জ্যোতির্ব্বিদ্ দেখিলে বলিত, আজ বৃহস্পতি শুক্র উভয়গ্রহ যুক্ত হইয়া শীঘ্রগামী হইয়াছে।

নিষ্কামকর্ম্ম।

শি। মনুষ্যের কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং কোন কর্ম্মই বা কর্ত্তব্য নহে এই বিষয়ে এক্ষণে তোমাকে কিছু বলিতে চাই। কিন্তু এই বিষয়টি আমি যে তোমাকে বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারিব সেরূপ সাধ্য আমার নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন "গহনা কর্ম্মণোগতিঃ"। (৪র্থঅ, ১৭ গীতা) কর্ম্মের গতি বুঝিতে পারা অতি দুজ্ঞের্য়। যিনি কর্ম্মের গতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন এ জগতে তাঁহার আর কিছুই জানিতে বাকি নাই। যে কর্ম্ম-বিজ্ঞানবিৎ মহাত্মা কর্ম্মের গতি তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়াছেন জগতে সকল ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব সকলের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তিনি বুঝিয়াছেন কেননা কর্ম্ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াই এই জগৎ চক্র ঘুরিতেছে।

কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রথমে ইহা জানা উচিত যে তোমারও পক্ষে যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য আর একজনের পক্ষেও যে সেই সকল কর্ম্মই কর্ত্তব্য তাহা নহে। আজ তুমি যেরূপ অবস্থায় আছ তাহাতে তোমার পক্ষে যেরূপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, কাল হয়ত সেই কর্ম্মই তোমার কাছে অকর্ম্ম। অর্থাৎ দেশ কাল ও

---

* হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের Accelerated Motion কে শীঘ্রগতি বলে। দুইটি গ্রহকে পৃথিবী হইতে যখন এক রাশিস্থিত দেখা যায়, তখন তাহাদিগকে যুক্ত বলা যায়। সম্প্রতি সিংহরাশিতে এই দুই গ্রহের যোগ হইয়াছিল। আকাশের মধ্যে এই দুইটি গ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, এই জন্য তদুভয়ের যোগ দেখিতে পরম রমণীয়। সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়াই এ উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা সকলের দর্শনীয়। এ বৎসর আর বৃহস্পতি শুক্রের যোগ হইবে না। আগামী বৎসর কার্ত্তিক মাসে কন্যা রাশিতে চিত্রানক্ষত্রে আবার হইবে।

পাত্রানুযায়ী কর্ম্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা বিচার করিতে হইবে। আমার পক্ষে যাহা ধর্ম্ম তোমার পক্ষে হয়ত তাহাই অধর্ম্ম; সেই জন্যেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ"।

শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিটির অর্থ যত দূর বুঝাইতে পারি তাহাই আজি বুঝাইব।

ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রবৃত্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং জন্ম গ্রহণ করিয়া যে সকল বিশেষ বিশেষ দৈবঘটনা স্রোতে পতিত হইয়া থাকে তাহাও তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফল। আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে যে ঘটনার অধীন হইতে হয়, যে সকল ঘটনাকে অকস্মাৎ ঘটনা দৈবাৎ ঘটনা বলিয়া থাকি সেই সকল ঘটনায় যে আমাকে পতিত হইতে হয় ইহা আমার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফল জানিও; আমার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের সহিত ইহ জীবনের যে কর্ম্মশৃঙ্খলের একতান সম্বন্ধ (Harmony) আছে সেই কর্ম্মই আমার স্বধর্ম্ম। এবং এই স্বধর্ম্ম সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ॥

ছা। আপনি স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিলেন আমি তাহা বড় বুঝিতে পারিলাম না।

শি। আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, তুমি নিজের মনে সেই সকল কথা লইয়া সবিশেষ আলোচনা করিলে পর আমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিবে, যে, যে বিষয় লইয়া নিজে কখন ভাবে নাই সে বিষয়ক কথার ভাব সহজে তাহার মনে অঙ্কিত হয় না। স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে মোটা মুটী কথা তোমাকে প্রথমে বলি শুন।

আমি যে ঘটনাস্রোতে ভাসিতেছি, মূল প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্মদ্বারা সেই ঘটনাস্রোতে সন্তরণ দিয়া, কূল পাইবার চেষ্টা করাই স্বধর্ম্ম। ঈশ্বরপদ অর্থাৎ নিত্য সুখালয়—ঘটনাস্রোতের কূল। সর্ব্বদা সেইকূলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাঁতার দিতে যাইও, নচেৎ আবর্ত্তে পড়িয়া ডুবিয়া যাইবারই অধিক সম্ভাবনা।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতায় অর্জ্জুনকে যে জন্য যুদ্ধে রত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিলে স্বধর্ম্ম কথাটির অর্থ অনেকটা বুঝিতে পারিবে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া আত্মীয়-নাশ-জনিত শোকে মোহ প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুন যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন সেই সময়ে তাঁহার কি কর্ত্তব্য ইহা বিচার করিতে গিয়াই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গুহ্য কথা সকল ভগবদ্গীতায় প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা গীতার পাতা উল-টাইয়াই উহার মর্ম্ম সমস্ত বুঝিয়া লইয়াছেন মনে করেন তাঁহারা গীতাকে নানা কারণে অবজ্ঞা করিতে পারেন, কিন্তু গীতার গুহ্যভারের ভিতর যাঁহারা প্রবেশ কবিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সমস্ত রহস্য বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, গীতার কথঞ্চিৎ বসাস্বাদনেই তাঁহারা মোহিত হইয়া থাকেন। এই গীতা শাস্ত্রের সাহায্যে আমি এইরূপ বুঝি যে, যে ঘটনার অধীন হইয়াছি সেই ঘটনানুযায়ী এবং নিজের মূল প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্ম করাই মনুষ্যের স্বধর্ম্ম। অর্জ্জুনের মূল প্রবৃত্তি ক্ষত্রিয়বৃত্তি। কিন্তু ক্ষত্রিয়বৃত্তি হইলেই যে তাঁহাকে কেবল যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে তাহা কর্ত্তব্য নহে। কুরুক্ষেত্র সমরে অর্জ্জুনের যুদ্ধ করাই যে কেন কর্ত্তব্য তাহার প্রধান কারণ গীতার ২য় অধ্যায়ের ৩২ শ্লোক হইতে বুঝা যায়। শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে এই যুদ্ধ "যদৃচ্ছয়া উপপন্নং।"

শ্লোকটি এই—

> যদৃচ্ছয়া যোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং।
> সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশং॥

এই 'যদৃচ্ছয়া যোপপন্নং' কথাটির ভিতর যে কত গূঢ় রহস্য নিহিত রহি-য়াছে তাহা অনেকেই ভাবেন না। যদৃচ্ছয়া উপপন্ন অর্থাৎ যে ঘটনা আমি খুঁজি অথচ যাহা আমার সম্মুখে উপস্থিত, পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মই তাহার কারণ। এইরূপে অপ্রার্থিত ঘটনার সাহায্যে ইহজীবনের কর্ম্মদ্বারা পূর্ব্ব-জন্মকৃত কর্ম্মক্ষয় করাই স্বধর্ম্ম।

প্রবৃত্তির শান্তিতেই সুখ এবং প্রবৃত্তির শান্তি করাই ধর্ম্মকর্ম্ম। এবং যদৃচ্ছা-প্রাপ্ত বিষয়ের সাহায্য লইয়া প্রবৃত্তির শান্তিভাব আনয়ন করিতে

যাওয়াই স্বধর্ম্ম। যুদ্ধবিষয়ে অর্জ্জুনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কুরুক্ষেত্র সমরের সময়ে অর্জ্জুনের সেই প্রবৃত্তি শান্তভাব ধারণ করে নাই বলিয়াই তিনি কুরুক্ষেত্র সমর বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াই যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সুতরাং এইরূপ অযাচিত যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া, কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্য্য করাই অর্জ্জুনের পক্ষে কর্ত্তব্য; ইহাই গীতার অভিপ্রায়।

ছা। অর্জ্জুন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধবিষয় হইতে বিরত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার যুদ্ধে যে প্রবৃত্তি ছিল ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? পূর্ব্বে তিনি বন্ধুবধ-জনিত অনিষ্ট সম্বন্ধে কোন চিন্তা করেন নাই, সেই জন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই অনিষ্ট বিষয় চিন্তা দ্বারা তাঁহার যুদ্ধবিষয়ক প্রবৃত্তি শান্ত হওয়াতেই তিনি যুদ্ধে বিরত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন সুতরাং তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করা কিরূপে ধর্ম্ম হইতে পারে?

শি। মনুষ্যের প্রবৃত্তি অগ্নির স্বরূপ। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম এই অগ্নির ইন্ধন, বিষয় বায়ুর সংস্পর্শে এই অগ্নি জ্বলিতে থাকে। এই কর্ম্ম রূপ ইন্ধন সদাই জ্বলিতে চায়। যতক্ষণ না উহা ভস্মসাৎ হয় ততক্ষণ প্রবৃত্তির শান্তি সম্ভব নহে। প্রবৃত্তি অগ্নি কখন কখন ধূমাবৃত বা ভস্মাচ্ছাদিত হয় এবং সেই সময়ে উহার আভা বাহিরে প্রকাশ পায় না বটে কিন্তু আভা বাহিরে প্রকাশ না পাইলেই প্রবৃত্তি যে শান্ত হইয়াছে এরূপ বিবেচনা করা ভুল। মনে কর তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে, আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছ, এমন সময়ে কোন আত্মীয়ের বিপদ সম্বাদ আসিল। তোমার খাওয়া দাওয়া ঘুরে গেল; কিন্তু তাই বলিয়া তোমার ক্ষুধা যে উপশম হইল ইহা ঠিক কথা নহে। অর্জ্জুনের পক্ষেও সেইরূপ। বন্ধুনাশ-জনিত অনিষ্ট চিন্তায় তাঁহার যে মোহ উপস্থিত হইয়াছিল সেই মোহ-ধূমে তাঁহার ক্ষত্রিয় প্রবৃত্তির আভা আচ্ছাদিত হইয়াছিল মাত্র, তাঁহার প্রবৃত্তি উপশম হয় নাই। অর্জ্জুনের গুরু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই মোহ অপনোদন করিয়া তাঁহার মূল প্রবৃত্তির আভা তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেন। ইহাই ভবদ্গীতার আসল কথা। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু দান করিয়া স্পষ্ট দেখাইয়া দিলেন যে কালচক্রের বশে দুর্য্যোধনাদি নিহত হওয়াই নিশ্চয়, জগতের হিত সাধন জন্য

দুর্য্যোধনাদির নিধন সাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তখন অর্জ্জুনের মোহ দূর হইল, তাঁহার ক্ষত্রিয়বৃত্তির আভা পুনঃ প্রকাশিত হইল। তখন তিনি গুরুধর্ম্ম সাধনোদ্দেশে কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া প্রবৃত্তির নিবৃত্তি সাধন জন্যই কুরুক্ষেত্রের মহা সমরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গীতার মর্ম্ম যতই বুঝিতে চেষ্টা করিবে ততই নূতন নূতন ভাব সকল মনোমধ্যে উদয় হইবে। আমার নিকট হইতে মাঝে মাঝে গুটিকত গুটিকত কথা শুনিয়া কিছুই শিখিতে পারিবে না। নিজে না ভাবিতে শিখিলে কেহ কিছু শিখিতে পারে না। "পড়, দেখ, এবং নিজে ভাবিতে আরম্ভ কর" এই উপদেশটী, আমি যখন যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছি সেই সময় আমার একজন শিক্ষকের নিকট হইতে পড়িয়াছিলাম, আমিও তোমাকে এই উপদেশে উপদিষ্ট দেখিতে চাই। দেখ, কর্ম্ম সম্বন্ধে বুঝিবার অনেক কথা আছে এবং এই বিষয়ের প্রসঙ্গ আর একদিন উত্থাপন করা যাইবে।

কেতাব কীট।

গ্রন্থকর্ত্তা। দপ্তরি, এই পোকাগুলোকে মেরে ফেলত।

কে-কী। কেন বাপু, মার্ ধর্ করা কেন, পড়িতে আসিয়াছ পড়।

গ্র। আ গেল, এ পোকাটাত ভারি জেঠা দেখ্ছি।

কে-কী। সত্য কথা বলিলেই জেঠামি হয়!

গ্র। কীট-রত্ন! আপনিও কি কোন মহাসত্য আবিষ্কার করিয়াছেন নাকি? ক্ষুদ্র মানবের শিক্ষার্থ তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন্।

কে-কী। বিদ্রূপ! ভালই। তাহাতে আমার কিছুই হইবে না, তুমি যে কেবল দম্ভ-সর্ব্বস্ব তাহাই প্রকাশ হইবে। অসার দাম্ভিক বই আর কেহ বিদ্রূপ করে না।

গ্র। যে আজ্ঞে! এখন মহাসত্যটা কি বলুন।

কে-কী। বলির বই কি। ঠাট্টাই কর আর যাহাই কর, বলিব। বলি, পুস্তকাগারে পড়িতে আসিয়াছ পড়, আবার মারপিট্ করা কেন? মারপিট্ করা তোমাদের একটা রোগ বটে?

গ্র। আমাদের কত মারপিট্ করিতে দেখিয়াছ?

কে-কী। মারপিট্ ছাড়া তোমাদের কোন কাজইত দেখিতে পাই না। পাঁচজনের অন্ন না মারিয়া তোমরা আপনারা অন্ন করিয়া খাইতে পার না। পাঁচজনকে সর্ব্বস্বান্ত না করিয়া তোমরা আপনারা ধনবান হইতে পার না। পাঁচজন খ্যাতনামা ব্যক্তির অখ্যাতি না করিয়া তোমরা আপনারা খ্যাতি-লাভ করিতে পার না। এমন কি, পরকে না মারিয়া তোমরা জ্ঞানোপার্জ্জন করিতেও পার না—

গ্র। সে কেমন কথা?

কে-কী। এই তোমাদের Vivisection-এর কথা। জীয়ন্ত পশুপক্ষী-গুলাকে না মারিলে তোমাদের বিজ্ঞানের কলেবর বাড়ে না। পাঁচজনকে না মারিলে তোমরা আপনারা জীবনরক্ষা করিতে পার না। এমনি তোমা-দের ক্ষমতা আর এমনি তোমাদের ধর্ম্ম! তোমাদের জাতিকে ধিক্! তোমাদের মানব নামে ধিক্!

গ্র। এখন দপ্তরি তবে তোকে করে দিক্ ঠিক্। দপ্তরি! এই পোকাগুলোকে মেরে ফেলত।

কে-কী। মরিতে ভয় করি না। তোমাদের জাতির ঢের শ্রাদ্ধ করেছি, এখন মরিলে দুঃখ নাই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমাকে কি জন্য মারিবে? আমাকে মারিলে তোমার অন্নও বৃদ্ধি হবে না, ঐশ্বর্য্যও বৃদ্ধি হবে না, যশও বৃদ্ধি হবে না, সুখও বৃদ্ধি হবে না। তবে আমাকে কি জন্য মারিবে? মারপিট্ করা তোমাদের একটা রোগ বটে?

গ্র। তুই জানিস্ না, আমাদের কত লোকসান্ করিতেছিস্? এই সব বই কাটিয়া কাটিয়া তুই একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছিস্, তোকে অবশ্য মারিব।

কে-কী। আমি মরিলেই কি তোমাদের বই আর নষ্ট হবে না? তোমাদের সব বই অমর হবে?

গ্র। হবে বৈকি। তোরা না কাটিলে বই আর কেমন করে নষ্ট হবে?

কে-কী। গ্রন্থকারকুলভূষণ! গ্রন্থ কাকে বলে তাও জান না, পোকা কাকে বলে তাও জান না? এই দেখ দেখি—এই সেক্সপীয়র খানা, এই হোমরখানা, এই বাল্মীকিখানা, এই উপনিষদখানা, এই Wealth of Nations খানা—এসব গুলোত কাটিয়া কুঁচি কুঁচি করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু এসকল পুস্তকের কি কিছু করিতে পারিয়াছি? কিছু না। করিবার যো কি? এসব পুস্তক হয় মানব-প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে, নয় মানবাত্মার সুগভীর আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, নয় উন্নত নরনারীর প্রাণবায়ুস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে, নয় সমাজ-শরীর নিয়ামক মহাশক্তি হইয়া উঠিয়াছে, নয় সামাজিক আচার ব্যবহার প্রথা প্রক্রিয়ারূপে বিকসিত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব এ সকল পুস্তক আর পুস্তকে নাই, এ সকল পুস্তক আত্মারূপ, হৃদয়রূপ, সমাজ-রূপ, শক্তিরূপ ধারণ করিয়াছে। এসকল পুস্তক আর পুস্তকাগারে থাকে না। এ সকল পুস্তক যদি পড়িতে হয় ত এস্থানে আসিও না। এ সকল পুস্তক এখন মানবজীবনে আছে, মানব-সমাজে আছে, মানব-শক্তিতে আছে, মানব-জগতে আছে। এসকল পুস্তক পড়িবার ইচ্ছা হয় ত এস্থান হইতে চলিয়া গিয়া মানব-জগতে প্রবেশ কর। আমি, কেতাব-কীট, এ সকল পুস্তকের কি কবিতে পারি! এ সকল পুস্তক আমি যতই কাটি না কেন, ইহাদের উচ্ছেদ অসম্ভব। ইহাদের এত কাটিয়া খাই তবু আমাদের পেট ভরে না, মনে হয় যেন পেটে কিছুই যায় নাই।

গ্র। সব বইই কি এই বকমের? তুমি ত সব বইই কাট।

কে-কী। আমি সব বইই কাটি। কিন্তু এই সব বইয়ের ন্যায় যে সব বইয়ের আত্মা আছে সে সব বই আমি কাটিলেও কাটা পড়ে না, নষ্ট হয় না। যে সব বই শুধু বই নয়, মানবজাতির প্রকৃত বল; সে সব বইয়ের আমি, কেতাব-কীট, আমিও কাটিয়া কিছু করিতে পারি না, এবং তুমি, অসূয়ারূপী গ্রন্থকার, তুমিও নিন্দা করিয়া কিছু করিতে পার না। সে সব বইয়ের সম্বন্ধে তোমার ক্ষমতা দেখিতে যত বেশিই হউক প্রকৃত পক্ষে এই ক্ষুদ্র কেতাব-কীটের ক্ষমতা অপেক্ষা বেশী নয়!

গ্র। আবার জেঠামি ?

কে-কী। জেঠাদের কথা কইতে গেলেই জেঠামি হইয়া পড়ে, কি করিব বল। সে যা হউক। যে সব বইয়ের আত্মা নাই, সে সব বই কেবল বই মাত্র, মানবজাতির প্রকৃত বল নয়, সে সব বই আমি কাটিলেও নষ্ট হয়, না কাটিলেও নষ্ট হয়। সে সব বই থাকা না থাকা সমান। সে সব বই নষ্ট হওয়াই ভাল। সে সব বই কেবল অহঙ্কার বৃদ্ধি করে, হাঁকডাক বাড়ায়, মানুষকে আড়ম্বরে ভুলায়, সোজা পথকে বাঁকা করিয়া দেয়, শস্যের পরিবর্ত্তে খোসা খাইতে দেয়, জ্ঞানকে মত্ততায় বিলুপ্ত করে, সুস্থ আত্মাকে রোগগ্রস্থ করিয়া মারিয়া ফেলে। সে সব বই না থাকাই ভাল। তবে আর আমাকে মার কেন ?

গ্র। আচ্ছা, তুমি যদিও আমাদের কোন অপকার কর না, কিন্তু তোমা হইতে আমাদের কোন উপকারও ত হয় না। তবে তোমাকে মারিব না কেন ? তোমাকে রাখিয়া কি লাভ ?

কে-কী। হাঁ, এটা ঠিক্ ইংরেজের চেলার মতন কথা হইয়াছে বটে। যাহা দ্বারা কোন কাজ পাওয়া যায় না, যেমন বৃদ্ধ পিতা এবং বৃদ্ধ মাতা, তাহাকে রাখিয়া লাভ কি ? তাহাকে মারিয়া ফেলাই ভাল। যাহাকে লইয়া সুখ সম্ভোগ হয় না—যেমন নিঃসহায়া বৃদ্ধা কুটুম্বিনী বা নিরক্ষর উপার্জ্জনাক্ষম জ্ঞাতিপুত্র—তাহাকে রাখিয়া লাভ কি ? তাহাকে দূর করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। হিন্দুর ছেলে হইয়া তোমরা যেরকম পাকাপোক্ত ইংরাজের চেলা হইয়াছ তাহাতে তোমাদের বাহাদুর বলিতে হয়। ফলতঃ এখন তোমাদের জীবনে আর কোন লক্ষ্যই নাই—ধর্ম্ম বল, বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, উন্নতি বল, পরোপকার বল—কোন লক্ষ্যই নাই, এখন বাহাদুরী তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু, বাহাদুর সাহেব! আমি লোকের কিছু উপকারও করিয়া থাকি। শুনিবে কি ?

গ্র। বল, কিন্তু অত impertinence talk করিও না।

কে-কী। বাপ্‌রে! তোমার কাছে কি আমি impertinence talk করিতে পারি ? সে যে বড় স্পর্দ্ধার কাজ হবে। সে ভাবনা করিও না। এখন বলি শুন। তুমি ত একজন গ্রন্থকার। সকল গ্রন্থকারের ন্যায় তোমারও

পড়াশুনা খুব কম কিন্তু পড়াশুনার ভাণ খুব বেশী। তুমি সেক্সপীয়রের নাটক ৩খানা কি ৪ খানার বেশী পড় না, মিণ্টনের ৩সর্গের বেশী পড় না, বাল্মীকির রামায়ণের একটা শ্লোকও পড় না, কালিদাসের শকুন্তলার প্রথম অঙ্ক বই আর কিছুই পড় না। কিন্তু এমনি ভাণ করিয়া থাক, যেন সেক্স‌-পীয়র মিণ্টন বাল্মীকি কালিদাস প্রভৃতি সব দেশের সব গ্রন্থকারের সব রচনাই খাইয়া ফেলিয়াছ। এ গুমোর টুকু কেবল আমার প্রসাদাৎ করিতে পার কি না বল দেখি? আবার কখন কখন প্রকৃত বিদ্বন্মণ্ডলিকেও যে Alcuin, Thomas Aquinas, Paracelsus প্রভৃতির কথা বলিয়া তাক্ লাগাইয়া দেও, সেও কেবল আমি, কেতাবকীট, আমার জোরে কি না বল দেখি? তবেই ত আমি, ক্ষুদ্র কেতাব কীট, আমিও তোমার কিঞ্চিৎ উপকার করিয়া থাকি। আমার বাতাস একটু পাইলে তোমার ভাল হয় কি না বল দেখি?

গ্র। ঠিক্ বলেছ। তোমাকে কি মারিতে পারি! তুমি চিরকাল এই পুস্তকাগারে থাকিয়া পুস্তক কাট, আমি তোমায় কিছু বলিব না। কিন্তু এখন আমাকে Winckelmann-এর Troy সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইতে দুই চারিটা কথা বলিয়া দেও দেখি, আমি Gladstone এর বর্জিল সম্বন্ধীয় মতটা খণ্ড খণ্ড করিয়া Plevna নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া পৃথিবীতে একটা প্রকাণ্ড কীর্ত্তিপতাকা উড়াইয়া দি।

কে-কী। আঃ সে আর কোন্ কথা? এই বলিয়া দিতেছি লিখিয়া লও। দেখিতেছি, বই কাহাকে বলে এবং কেতাব কীট কাহাকে বলে তুমি যেমন বুঝিয়াছ তেমন আর কেহ বুঝে না। আহা! তুমি আমার শিক্ষার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিলে! তুমি বাহাদুরের গোষ্ঠীতে বাহাদুর! এখন যাও তুমি Gladstoneএর মাথা খাওগে—আমি তোমার গোষ্ঠীর মাথা খাইগে। দপ্তরি, ঐ বাঙ্গালা আল্মারিটায় আমাকে তুলিয়া দেও ত, দেখি, আমার উদরসাৎ হয়েও ওদের কয়জন বেঁচে থাকে। কেতাব-কীটকে চেনে না, আবার বই লিখ্তে চায়? হা কপাল!

[কুট্‌কাট্ কুট্‌কাট্ কুট্‌কাট্ কুট্‌কাট্—]

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাল্যকালের বন্ধু।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় হেমচন্দ্র বাটী আসিয়া দেখিলেন বিন্দু তাঁহার জন্য উৎসুক হইয়া পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হেমকে দেখিবা মাত্র সে শান্ত মুখ খানি স্ফূর্ত্তিপূর্ণ হইল, নয়ন দুটীতে একটু হাসি দেখা দিল, হেমের মুখের দিকে সস্নেহে চাহিয়া বিন্দু বলিলেন,

"কি ভাগ্যি তুমি এলে এতক্ষণে; আমি মনে করিলাম বুঝি বাড়ীর পথ ভুলিয়াই গিয়াছ। কিম্বা বুঝি উমাতারার কথা ঠেলিতে পারলে না, আজ জেঠা মহাশয়ের বাড়ী থেকে বুঝি আস্তে পারলে না।"

হেম। "কেন বল দেখি, এত ঠাট্টা কেন? অধিক রাত্রি হইয়াছে নাকি"?

বিন্দু আবার হাসিয়া বলিলেন, "না এই কেবল দুপুর রাত্রি। আর সন্ধ্যা থেকে তোমার একজন বন্ধু অপেক্ষা করিতেছেন"।

হেম। "কে? কে? কে?"

বিন্দু। "এই দেখ্‌বে এস না" এই বলিয়া বিন্দু আগে আগে গেলেন, হেম পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন।

বাড়ীর ভিতর যাইবা মাত্র একজন গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ উঠিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন; হেমচন্দ্র ক্ষণেক তাহাকে চিনিতে পারিলেন না, বিন্দু তাহা দেখিয়া মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর হেম বলিলেন "একি শরৎ! তুমি কলিকাতা হইতে কবে আসিলে? উঃ তুমি কি বদলাইয়া গিয়াছ; আমি তোমাকে তোমার দিদি কালীতারার বিবাহের সময় দেখিয়াছিলাম, তখন তুমি বর্দ্ধমানে পড়িতে, একবার বাড়ী আসিয়া-

ছিলে; তখন তুমি সাত আট বৎসরের বালক ছিলে মাত্র। এখন বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় যুবক হইয়াছ; তোমার দাড়ী গোঁপ হইয়াছে; তোমাকে কি সহসা চেনা যায়।"

শরৎ। "নয় বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হয় তাহার সন্দেহ কি? দিদির বের পরই বাবার মৃত্যু হইল, তাহার পর মাও গ্রাম হইতে বর্দ্ধমানে গিয়া রহিলেন, সেই জন্য আর বাড়ী আসা হয় নাই। আমি এণ্ট্রান্স পাস করিলে পর বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় যাইলাম, মাও বর্দ্ধমানের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় গ্রামে আসিয়া রহিয়াছেন, তাই আমাদের গ্রীষ্মের ছুটীতে গ্রামে আসিলাম। নয় বৎসরের পর আপনি আমাতে পরিবর্ত্তন দেখিবেন তাহাতে বিস্ময় কি? আমিই তখন কি দেখিয়াছি, আর এখন কি দেখিতেছি! বিন্দু দিদি আমার চেয়ে দুই বৎসরের বড়, সুতরাং আমরা ছেলে বেলা সর্ব্বদা একত্রে খেলা করিতাম, আমি মল্লিকদের বাড়ী যাইতাম, অথবা বিন্দু দিদি সুধাকে কোলে করিয়া আমাদের বাড়ী দেখিতে আসিত পেয়ারা তলায় সুধাকে রাখিয়া আঁকুসি দিয়া পেয়ারা পাড়িয়া খাইত; আজ কিনা বিন্দুদিদি সংসারে গৃহিণী, দুই ছেলের মা।"

বিন্দু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আর তুমি আর বলিও না, তোমার দৌরাত্ম্যে তালপুকুরের আঁব বাগানে আঁব থাকিত না, এখন কলিকাতায় গিয়ে লেখা পড়া শিখিয়া তুমি কালেজের ছেলেদের মধ্যে নাকি একজন প্রধান ছাত্র হয়েছ, তখন গেছোদের মধ্যে একজন প্রধান গেছো ছিলে।"

শরৎ। "বিন্দু দিদি সেও তোমাদের জন্য! তোমার জেঠাই মা কাঁচা আঁবগুলো খেতে বারণ করিতেন, আমি সন্ধ্যার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়া গলিয়ে তোমাদের রান্নাঘরে আঁব দিয়া আসিতাম কি না বলিও!"

হেম উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আর পরস্পরের গুণ ব্যাখার আবশ্যক কি, অনেক গুণ বেরিয়ে পড়েছে! আমিও তোমাদের বাড়ী যাইতাম, এবং সুধাকে তথায় কখন কখন দেখিতে পাইতাম, তখন সুধা ৪।৫ বৎসরের ছোট মেয়েটী। সুধা! ঘোষেদের বাড়ী যেতে মনে পড়ে? সেখানে তোমার দিদি তোমাকে কোলে করিয়া লইয়া যাইতেন মনে পড়ে, শরৎকে মনে পড়ে?"

সুধা। "শরৎ বাবুকে একটু একটু মনে পড়ে, দিদি আপনি পেয়ারা পাড়িয়া খাইত, আমি পাড়িতে পারিতাম না, শরৎ বাবু আমাকে কোলে করিয়া পেয়রা পাড়িয়া খাওয়াইতেন।" সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

হেমচন্দ্র তখন বিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়াছে? শরৎ খেয়েছে?"

শরৎ। হাঁ, বিন্দু দিদি আমাকে যেরূপ কচি আঁবের অম্বল খাইয়েছেন, সেরূপ কচি আঁব কখনও খাই নাই!"

বিন্দু। "কেন, নয় বৎসর পূর্ব্বে যখন গাছে গাছে বেড়াইতে, তখন?"

শরৎ। "হাঁ তখন খাইয়াছি বটে, কিন্তু তখন ত এরূপে রাঁধিয়া দিবার কেহ ছিল না।"

বিন্দু। "থাকবে না কেন? বেঁদে দিবার তর্ সইত না তাই বল।"

হে। "সুধার খাওয়া হইয়াছে? তোমার খাওয়া হইয়াছে?"

বিন্দু। "সুধা খেয়েছে, আমি এই যাই খাইগে। তুমি আর কিছু খাবে না।"

হেম। "না; তোমার জেঠা মহাশয়ের বাড়ীতে যেরূপ খাইয়া আসিয়াছি। আর কি খাইতে পারি? যাও তুমি যাও খাওয়া দাওয়া করো গিয়ে, অনেক রাত্রি হইয়াছে।"

বিন্দু রান্না ঘরে গেলেন। সুধা হেমচন্দ্রের জন্য এতক্ষণ জাগিয়াছিল, এখন রকের উপর একটী মাদুর পাতিয়া শুইল, চিন্তাশূন্য বালিকা শুইবা মাত্র সেই শীতল নৈশ বায়ুতে ও শুভ্রবর্ণ চন্দ্রালোকে তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িল। সমস্ত তালপুখুর গ্রাম এখন নিস্তব্ধ এবং সেই সুন্দর চন্দ্রকরে নিদ্রিত।

হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র সেই রকে উপবেশন করিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন। তালপুখুরের ঘোষ বংশ ও বসু বংশের মধ্যে বিবাহ সূত্রে সম্বন্ধ ছিল; হেম ও শরৎ বাল্যকালে পরস্পরকে জানিতেন, ও প্রীতি করিতেন। এক্ষণে ক্ষণেক কথাবার্ত্তার পর হেমচন্দ্র, উন্নত হৃদয়, বুদ্ধিমান, ধীর প্রকৃতি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শরচ্চন্দ্রের অন্তঃকরণ বুঝিতে পারিলেন; শরচ্চন্দ্রও হেমচন্দ্রের উন্নত, তেজোপূর্ণ অন্তঃকরণ জানিতে

পারিলেন। এ জগতে আমাদিগের অনেক আলাপী লোক আছে, মনের ঐক্য অতি অল্প লোকের সহিত ঘটে, সুতরাং হৃদয়ের অনুরূপ লোক দেখিলেই হৃদয় সহসা সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। হেমচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র যতই কথাবার্ত্তা করিতে লাগিলেন ততই তাঁহাদিগের হৃদয় পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল, হেম শরৎকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন, শরৎ হেমকে জ্যেষ্ঠের ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সে পরস্পর কথোপকথন হইতে হইতে বিন্দু আহারাদি সমাপন করিয়া তথায় আসিয়া বসিলেন; সুধাব মাথায় বালিশ ছিল না, সুপ্ত ভগ্নীর মস্তকটী আপন ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া তাহার সুন্দর গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ গুলি লইয়া সস্নেহে খেলা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন।

"শরৎ তুমি এবার "এল এর" জন্য পড়িতেছ। ছয় সাত মাস পরই তোমাদের পরীক্ষা, পরীক্ষায় তুমি যে প্রথম শ্রেণিতে হইবে এবং জলপানি পাইবে তাহার সন্দেহ নাই। তাহার পর কি কবিবে স্থির করিয়াছ কি?"

শরৎ। "কিছুই স্থিব নাই। আমার ইচ্ছা "বি এ" পর্য্যন্ত পড়িতে। কিন্তু মা গ্রামে থাকেন এবং আমাকে এই পরীক্ষা দেখিয়া গ্রামে আসিয়া বিষয়টী দেখিতে ও এখানে থাকিতে বলেন। তা দেখা যাউক কি হয়। আমাদের বিষয়ও অতি সামান্য, বৎসরে সাত, আট শত টাকার অধিক লাভ নাই, কোনও উপযুক্ত চাকুরি পাইলে করিতে ইচ্ছা আছে। মাও চাকুরি স্থানে আমার সহিত থাকিবেন; এখানে লোক জন বিষয় দেখিবে।

হেম। "তা যাহা হউক তোমার পরীক্ষার পর হইবে। এই কয়েক মাস কলিকাতায় থাকিয়া মনোযোগ করিয়া পড়া শুনা কর, "এণ্ট্রান্স" পরীক্ষা যেরূপ সম্মানের সহিত দিয়াছ এই পরীক্ষাটা সেইরূপ দাও।

শরৎ। "সেই রূপ ইচ্ছা আছে। শীঘ্র কলিকাতায় যাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিব। আমি মনে মনে এক এক বার ভাবি আপনারাও কেন এক বার কলিকাতায় আসুন না; আপনারা কি চিরকালই এই গ্রামে বাস করিবেন? আপনি নয় বৎসর পূর্ব্বে একবার কলিকাতায় কয়েক মাস ছিলেন, বিন্দু দিদি কখনও কলিকাতা দেখেন নাই; একবার উভয়েই

চলুন না কেন? এই চাষ দেওয়া ধান বুনা হইয়া গেলে আসুন, আমাদের বাড়ীতে থাকিবেন, আবার ইচ্ছা হইলে পুনরায় ভাদ্রমাসে ধান কাটিবার সময় আসিবেন।

হেম। "শরৎ তুমি আমাদের স্নেহ কর তাহাই এ কথা বলিতেছ। কিন্তু আমি কলিকাতায় গিয়া কি করিব বল? তুমি লেখা পড়া করিবে, পরীক্ষা দিবে, সম্ভবতঃ চাকুরি পাইবে;—আমি গিয়া কি করিব বল?"

শরৎ। "কেন, আপনি কি কোনও প্রকার চেষ্টা দেখিতে পারেন না। আপনি এ রূপ লেখা পড়া শিখিয়া কি চিরজীবন এইখানে কাটাইবেন? শুনিয়াছি আপনি কলেজ ছাড়িয়া বিস্তর বই পড়িয়াছেন, যাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে, "বি এ" দিগের মধ্যে অল্প লোকেরই আপনার ন্যায় সেটী আছে? আপনার শিক্ষায়, আপনার অধ্যবসায়ে, আপনার উন্নত সততায় কি কোনও এক প্রকার উপায় হইবে না?"

হেম। "শরৎ আমার শিক্ষা অধিক নহে, সামান্য; পুস্তক পড়িতে ইচ্ছা হয়, অন্য কায নাই, সেই জন্য দুই এক খানা করিয়া দেখি। আর কলিকাতার ন্যায় মহৎ স্থানে আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে উপযুক্ত লোক কর্ম্মের জন্য লালায়িত হইতেছে, কিছু হয় না, আমি যখন কলেজে ছিলাম তাহা দেখিয়াছি। গুণ থাকিলেও এত লোকের মধ্যে গুণের পরিচয় দেওয়া কঠিন, আমার ন্যায় নির্গুণ লোক তিন চারি মাসে কিছুই করিতে পারিবে না, ব্যর্থযত্ন হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে।"

শরৎ। "যদি তাহাই হয় তাহাতে ক্ষতি কি? আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাটীতে থাকিলে আপনাদিগের কিছু মাত্র ব্যয় হইবে না, একবার সকলের কলিকাতা দেখা হইবে, একবার উন্নতির চেষ্টা করিয়া দেখা যাইবে; আমার স্থির বিশ্বাস যে বিশাল মনুষ্য-সমুদ্রেও আপনার ন্যায় শিক্ষা, গুণ, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও অসাধারণ সততা অচিরেই পরিচিত ও পুরস্কৃত হইবে। আর যদি তাহা না হয়,—পুনরায় গ্রামে ফিরিয়া আসিবেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?"

হেমচন্দ্র ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন "শরৎ তুমি আমাদিগকে নিজ গৃহে স্থান দিতে চাহিলে এটী তোমার অতিশয় দয়া। কিন্তু আমরা

যদি সত্য সত্যই কলিকাতায় যাই তাহা হইলে নিজেরাই একটী বাসা করিয়া থাকিব, তোমার পড়ার অসুবিধা করিব না। সে যাহা হউক, এ কথা অদ্য রাত্রিতে নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নহে; তারিণীবাবু বর্দ্ধমানে যাইতে বলিতেছেন, তুমি কলিকাতায় যাইতে বলিতেছ, আমার ও ইচ্ছা কোথাও যাইয়া একবার উন্নতির চেষ্টা করিয়া দেখি। বিবেচনা করিয়া, তোমার পরামর্শ লইয়া একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া নিষ্পত্তি করিব।"

শরৎ। "বিন্দু দিদি! তোমার কি ইচ্ছা,—একবার কলিকাতা দেখিতে ইচ্ছা হয় না?"

বিন্দু। "ইচ্ছা ত হয় কিন্তু হইয়া উঠে কৈ? আর শুনিয়াছি সেখানে অতিশয় খরচ হয়,—আমরা গরিব লোক, এত টাকাই বা কোথা হইতে পাইব?"

শরৎ। "আপনারা ইচ্ছা করিয়া টাকা খরচ করিলেই খরচ হয়, নচেৎ খরচ নাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি আপনারা যদি আমাদের বাড়ীতে থাকেন, তাহা হইলে আমার লেখাপড়ার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না. অনেক সময় যখন পড়িতে পড়িতে মনটা অস্থির হয়, তখন আপনাদিগের লোকের সহিত কথা কহিলে মন স্থির হয়।

বিন্দু। "আবার অনেক সময় যখন পড়া শুনা করা উচিত, তখন বাড়ীর ভিতর আসিয়া ছেলে বেলার পেয়ারা পাড়ার গল্প করা হবে; তাহাতে খুব লেখা পড়া হবে!"

শরৎ। "আর অনেক সময় যখন ভাত খাইতে অরুচি হইবে তখন কচি কচি আঁবের অম্বল খাওয়া হইবে;—আমি দেখিতে পাইতেছি লাভের ভাগটাই অধিক।"

বিন্দু। "হাঁ তোমার এখন লাভেরই কপাল! ঐ যে শুনছিলুম অম্বল-রাঁদুনী একটী শীঘ্র আসিবে?"

শরৎ। "কে?"

বিন্দু। "কেন কিছু জান না নাকি? ঐ তোমার মা তোমার বের সম্বন্ধ স্থির কচ্চেন না?

শরৎ একটু লজ্জিত হইলেন,—বলিলেন "সে কোনও কাযের কথা নয়।"

হেম। "তোমার মাতা তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন না কি ?"

শরৎ "মা তত জেদ্ করেন না, কিন্তু দিদির বড় ইচ্ছা যে, আমার এখনই বিবাহ হয়, দিদিই নাকি বর্দ্ধমানে সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন এবং পরশু গ্রামে আসিয়া অবধি মাকে লওয়াইতেছেন। কিন্তু আমি মাকেও বলিয়াছি, দিদিকেও বলিয়াছি, এই পরীক্ষা না দিয়া এবং কোনও প্রকার চাকুরি বা অন্য অবলম্বন না পাইয়া আমি বিবাহ করিব না।"

বিন্দু। "আহা কালীতারার সঙ্গে আমার অনেক দিন দেখা হয় নাই। ছেলে বেলা আমি আর কালীতারা আর উমাতারা একত্রে খেলা করিতাম, কালী আমার চেয়ে ছয় মাসের ছোট, আর উমা আবার কালীর চেয়ে ছয় মাসের ছোট, আমরা তিনজন সর্ব্বদাই একত্রে থাকিতাম। কিন্তু এখন ছয়মাসে নয় মাসে একবারও দেখা হয় না! কাল একবার তোমাদের বাড়ী যাইব, আবার উমাতারার সঙ্গেও দেখা করিতে যাইব।"

শরৎ। "দিদি কাল উমার বাড়ী যাইবে, বিন্দুদিদি তুমিও সেইখানে গেলেই সকলের সহিত দেখা হইবে।"

বিন্দু। "তবে সেই ভাল। আহা কালীকে দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা করে। আমার বিয়ে হইবার আগে কালীর বিয়ে হইয়াছে, আহা সেই অবধি সে যে কত কষ্ট পাইয়াছে কে বলিতে পারে। আচ্ছা, শরৎ বাবু তোমার মা দেখিয়া শুনিয়া এমন ঘরে বিবাহ দিলেন কেন? বের সময় বরকে দেখিয়াছিলাম, লোকে বলে তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর ছিল!"

শরৎ। "বিন্দুদিদি সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না। মার ও সম্বন্ধে অধিক মত ছিল না, কিন্তু বরেদের কুল বড় ভাল, লোকে বলিল বর্দ্ধমান জেলায় এরূপ কুল পাওয়া দুষ্কর, পাড়ার ব্রাহ্মণ পুরোহিত সকলেই জেদ করিতে লাগিল, বাবা তাহাতে মত দিলেন, সুতরাং মা কি করিবেন। বিবাহ দিয়া অবধি মা সেই বিষয় দুঃখ করেন, বলেন মেয়েটীকে জলে ভাসাইয়া দিয়াছি। আমার ভগিনীপতির বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, তিনি রোগাক্রান্ত ও জীর্ণ, তাঁহার সংসারের অনেক দাস দাসীর মধ্যে দিদি একজন দাসী মাত্র। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ কর্ম্ম করেন, দুবেলা দুপেট খাইতে পান, দিদি তাহাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার সরল

চিত্তে অন্য কোনও আশা নাই। আমাদের সংসারে গৃহে গৃহে যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণা তাপসী আছে, পুর্ব্বকালে মুনিঋষিদিগের মধ্যেও সেরূপ ছিল কিনা জানি না।"

কালীতারার অবস্থা চিন্তা করিয়া বিন্দু ধীরে ধীরে এক বিন্দু অশ্রুজল মোচন করিলেন।

অনেকক্ষণ পরে শরৎ বলিলেন, 'বিন্দু দিদি, তবে আজ আমি আসি, অনেক রাত্রি হইয়াছে। আবার কাল দেখা হবে। যতদিন আমি গ্রামে আছি তোমার কচি আঁবের অম্বল এক একবার আস্বাদন করিতে আসিব। আর যদি অনুগ্রহ করিয়া তোমরা কলিকাতায় যাও, তবেত আর আমার সুখের সীমাই নাই"।

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন "তা আচ্ছা এস। কলিকাতায় যাওয়া না যাওয়া কাল স্থির করিব, কিন্তু যাওয়া হউক আর নাই হউক, কচি আঁবের অম্বল রাঁধিতে পারে এমন একজন রাঁধুনির বিষয় কাল তোমার দিদির সঙ্গে বিশেষ করিয়া পরামর্শ ঠিক করিব, সে বিষয় আর ভাবিতে হবে না"।

হাসিতে হাসিতে শরৎচন্দ্র, হেম ও বিন্দুর নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। সুধা তখনও নিদ্রিত ছিল, দ্বিপ্রহর রাত্রির নির্ম্মল চন্দ্রালোক সুধার সুন্দর প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় ওষ্ঠদ্বয়ে সুচিক্কণ কেশপাশে ও সুগোল বাহুতে বিরাজ করিতেছিল। বালিকা খেলার কথা বা বিড়াল বৎসের কথা বা বাল্যকালে পেয়ারা খাইবার কথা স্বপ্ন দেখিতেছিল!

বাটী হইতে নির্গত হইয়া শরৎচন্দ্র সেই নির্ম্মল আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন। "আমি বর্দ্ধমানে ও কলিকাতায় অনেক গৃহস্থ ও ধনাঢ্যের পরিবার দেখিয়াছি কিন্তু অদ্য এই পল্লিগ্রামের সামান্য গৃহে যেরূপ সরলতা, অমায়িকতা, অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রকৃত ধর্ম্ম দেখিলাম সেরূপ কুত্রাপি দেখি নাই। জগদীশ্বর! হেমচন্দ্রের পরিবার যেন সর্ব্বদা নিরাপদে থাকে, সর্ব্বদা সুখে ও ভালবাসায় পূর্ণ থাকে। বাল্যকাল হইতে একাকী থাকিয়া ও কেবল পাঠে রত থাকিয়া আমার এ জীবন শুষ্ক প্রায় হইয়াছে, আমার হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি শুখাইয়া গিয়াছে। হেমচন্দ্রের প্রণয় ও বিন্দুদিদির স্নেহে অদ্য আমার হৃদয় যেন

পুনরায় প্লাবিত হইল; জগদীশ্বর করুন যেন এই পবিত্র স্নেহপূর্ণ পরিবারের নিকট থাকিয়া আমি পুনরায় মনুষ্যোচিত স্নেহ ও প্রীতি লাভ করিতে পারি।" এই প্রকার নানা রূপ চিন্তা করিতে করিতে শরৎ বাড়ী গেলেন।

কৃষ্ণচরিত্র।

——০——

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হইল। নানাদিগদেশ হইতে আগত রাজগণ, ঋষিগণ, এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকে রাজধানী পূরিয়া গেল। এই বৃহৎ কার্য্য সুনির্ব্বাহ জন্য পাণ্ডবেরা আত্মীয়বর্গকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। দুঃশাসন ভোজ্যদ্রব্যের তত্ত্বাবধানে, সঞ্জয় রাজপরিচর্য্যায়, কৃপাচার্য্য রত্নরক্ষায় ও দক্ষিণাদানে, দুর্য্যোধন, উপায়ন প্রতিগ্রহে, ইত্যাদিরূপে সকলকেই নিযুক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন? দুঃশাসনাদির নিয়োগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগের কথাও লেখা আছে। তিনি ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন।

কথাটা বুঝা গেল না। শ্রীকৃষ্ণ কেন এই ভৃত্যোপযোগী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন? তাঁহার যোগ্য কি আর কোন ভাল কাজ ছিল না? না, ব্রাহ্মণের পা ধোয়ানই বড় মহৎ কাজ? তাঁহাকে আদর্শপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া কি পাচক ব্রাহ্মণঠাকুরদিগের পদ প্রক্ষালন করিয়া বেড়াইতে হইবে? যদি তাই হয়, তবে তিনি আদর্শপুরুষ নহেন, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

কথাটার অনেক রকম ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণগণের প্রচারিত এবং এখনকার প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের গৌরব বাড়াইবার জন্যই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এইটিতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ ব্যাখ্যা অতি অশ্রদ্ধেয় বলিয়া আমাদিগের বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য সম্মান করিতেন

বটে, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও ব্রাহ্মণের গৌরব প্রচারের জন্য বিশেষ ব্যস্ত দেখি না। বরং অনেক স্থানে তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে দেখি। যদি বনপর্ব্বে দুর্ব্বাসার আতিথ্য বৃত্তান্তটা মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তিনি রকম সকম করিয়া ব্রাহ্মণঠাকুরদিগকে পাণ্ডবদিগের আশ্রম হইতে অর্দ্ধ চন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ঘোরতর সাম্যবাদী। গীতোক্ত ধর্ম্ম যদি কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম হয়, তবে

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৫।১৭

তাঁহার মতে ব্রাহ্মণে, গরুতে, হাতিতে, কুকুরে, ও চাণ্ডালে সমান দেখিতে হইবে। তাহা হইলে ইহা অসম্ভব যে তিনি ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাহাদের পদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইবেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কৃষ্ণ যখন আদর্শ পুরুষ, তখন বিনয়ের আদর্শ দেখাইবার জন্যই এই ভৃত্যকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাস্য, তবে কেবল ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালনেই নিযুক্ত কেন? বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের ও পাদ প্রক্ষালনে নিযুক্ত নহেন কেন? আর ইহাও ব্যক্তব্য যে এইরূপ বিনয়কে আমরা আদর্শ বিনয় বলিতে পারি না। এটা বিনয়ের বড়াই!

অন্যে বলিতে পারেন, যে কৃষ্ণচরিত্র সময়োপযোগী। সে সময়ে ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তি বড় প্রবল ছিল; কৃষ্ণ ধূর্ত্ত, পশার করিবার জন্য এইরূপ অলৌকিক ব্রহ্মভক্তি দেখাইতেছিলেন।

আমি বলি, এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। কেন না, আমরা এই শিশুপাল বধপর্ব্বাধ্যায়ের অন্য অধ্যায়ে (চৌয়াল্লিশে) দেখিতে পাই, যে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদ প্রক্ষালনে নিযুক্ত না থাকিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়োচিত ও বীরোচিত কার্য্যান্তরে নিযুক্ত ছিলেন। তথায় লিখিত আছে, "মহাবাহু বাসুদেব শাঙ্গ চক্র ও গদা ধারণ পূর্ব্বক আরম্ভ হইতে সমাপন পর্য্যন্ত ঐ যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলেন।" তবে ব্রাহ্মণের পদ প্রক্ষালনে নিযুক্ত রহিলেন কখন? হয়ত, দুইটা কথাই প্রক্ষিপ্ত। আমরা একথার আর বেশী আন্দোলন আবশ্যক বিবেচনা করি না। কথাটা তেমন গুরুতর কথা নয়। কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে মহাভারতীয় উক্তি অনেক সময়েই পরস্পর অসঙ্গত, ইহা

দেখাইবার জন্যই আমি এতটা বলিলাম। নানা হাতের কাজ বলিয়া এত অসঙ্গতি।

এই রাজসূয় যজ্ঞের মহাসভায় কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা নিহত হয়েন। পাণ্ডবদিগের সংশ্লেষ মাত্রে থাকিয়া কৃষ্ণের এই একমাত্র অস্ত্র ধারণ বলিলেও হয়। খাণ্ডবদাহের ব্যাপারটা আমরা বড় মৌলিক বলিয়া ধরি নাই, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে।

শিশুপাল বধ পর্ব্বাধ্যায়ে একটা গুরুতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। বলিতে গেলে, তেমন গুরুতর ঐতিহাসিকতত্ত্ব মহাভারতের আর কোথাও নাই। আমরা দেখিয়াছি, যে জরাসন্ধ বধের পূর্ব্বে, কৃষ্ণ কোথাও মৌলিক মহাভারতে, দেবতা বা ঈশ্বরাবতার-স্বরূপ অভিহিত বা স্বীকৃত নহেন। জরাসন্ধ বধে, সে কথাটা অমনি অস্ফুট রকম আছে। এই শিশুপাল বধেই প্রথম কৃষ্ণের সমসাময়িক লোক কর্তৃক তিনি জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত। এখানে কুরুবংশের তাৎকালিক নেতা ভীষ্মই এ মতের প্রচারকর্ত্তা।

এখন ঐতিহাসিক স্থূল প্রশ্নটা এই যে, যখন দেখিয়াছি যে কৃষ্ণ তাঁহার জীবনের প্রথমাংশে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকৃত নহেন, তখন, জানিতে হইবে, কোন্ সময়ে তিনি প্রথম ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইলেন? তাঁহার জীবিতকালেই কি ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন? দেখিতে পাই বটে যে এই শিশুপাল বধে, এবং তৎপরবর্ত্তী মহাভারতের অন্যান্য অংশে তিনি ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইতেছেন। কিন্তু এমন হইতে পারে, যে শিশুপাল বধ পর্ব্বাধ্যায় এবং সেই সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত। এ প্রশ্নের উত্তরে কোন্ পক্ষ অবলম্বনীয়?

এ কথার আমরা এক্ষণে কোন উত্তর দিব না। ভরসা করি ক্রমশঃ উত্তর আপনিই পরিস্ফুট হইবে। তবে ইহা ব্যক্তব্য যে শিশুপালবধ পর্ব্বাধ্যায়, যদি মৌলিক মহাভারতের অংশ হয়, তবে এমন বিবেচনা করা যাইতে পারে, যে এই সময়েই কৃষ্ণ ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন। এবং এ বিষয়ে তাঁহার সপক্ষ বিপক্ষ দুই পক্ষ ছিল। তাঁহার পক্ষীয়দিগের প্রধান

ভীষ্ম, এবং পাণ্ডবেরা। তাঁহার বিপক্ষদিগের একজন নেতা শিশুপাল। শিশুপাল বধ বৃত্তান্তের স্থূল মর্ম্ম এই যে, ভীষ্মাদি সেই সভামধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা পান। শিশুপাল তাহার বিরোধী হন। তাহাতে তুমুল বিবাদের যোগাড় হইয়া উঠে। তখন কৃষ্ণ শিশুপালকে নিহত করেন, তাহাতে সব গোল মিটিয়া যায়। যজ্ঞের বিঘ্ন বিনষ্ট হইলে, যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হয়।

এ সকল কথার ভিতর যথার্থ ঐতিহাসিকতা কিছুমাত্র আছে কি না তাহার মীমাংসার পূর্ব্বে বুঝিতে হয়, যে এই শিশুপাল বধ পর্ব্বাধ্যায় মৌলিক কি না? এ কথাটার উত্তর বড় সহজ নহে। শিশুপাল বধের সঙ্গে মহাভারতের স্থূল ঘটনা গুলির কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তা না থাকিলেই যে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে এমন নহে। ইহা সত্য বটে যে ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থানে শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত একজন রাজার কথা দেখিতে পাই। পরভাগে দেখি, তিনি নাই। মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। পাণ্ডবসভায় কৃষ্ণের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, ইহার বিরোধী কোন কথা পাই না। আর রচনাপ্রণালী দেখিলেও পর্ব্বাধ্যায়কে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াই বোধ হয় বটে। মৌলিক মহাভারতের আর কয়টি অংশের ন্যায়, নাটকাংশে ইহার বিশেষ উৎকর্ষ আছে। অতএব ইহাকে অমৌলিক বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

তা না পারি, কিন্তু ইহাও স্পষ্ট বোধ হয়, যে যেমন জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায়ে দুই হাতের কারিগরি দেখিয়াছি, ইহাতেও সেই রকম দেখি। বরং জরাসন্ধ বধের অপেক্ষা সে বৈচিত্র্য শিশুপাল বধে বেশী। অতএব আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে শিশুপাল বধ স্থূলতঃ মৌলিক বটে, কিন্তু ইহাতে দ্বিতীয় স্তরের কবির বা অন্য পরবর্ত্তী লেখকের অনেক হাত আছে।

এক্ষণে শিশুপালবধ বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ সবিস্তারে বলিব।

আজিকার দিনেও আমাদিগের দেশে একটি প্রথা প্রচলিত আছে, যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে সভা হইলে সভাস্থ সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিকে স্রক্চন্দন দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাকে "মালাচন্দন" বলে। ইহা এখন

পাত্রের গুণ দেখিয়া দেওয়া হয় না, বংশমর্য্যাদা দেখিয়া দেওয়া হয়। কুলী-নের বাড়ীতে গোষ্ঠীপতিকেই মালা চন্দন দেওয়া হয়, কেননা কুলীনের কাছে, গোষ্ঠীপতি বংশজই বড় মান্য। কৃষ্ণের সময়ে প্রথাটা একটু ভিন্নপ্রকার ছিল। সভাস্থ সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তিকে অর্ঘ প্রদান করিতে হইত। বংশমর্য্যাদা দেখিয়া দেওয়া হইত না, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়াই দেওয়া হইত।

যুধিষ্ঠিরের সভায় অর্ঘ দিতে হইবে—কে ইহার উপযুক্ত পাত্র? ভারত-বর্ষীয় সমস্ত রাজাগণ সভাস্থ হইয়াছেন, ইহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? এইকথা বিচার্য্য। ভীষ্ম বলিয়াছেন, "কৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহাকে অর্ঘ প্রদান কর।

প্রথম যখন এই কথা বলেন, তখন ভীষ্ম যে কৃষ্ণকে দেবতা বিবেচনাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়াছিলেন, এমন ভাব কিছুই প্রকাশ নাই। কৃষ্ণ "তেজঃ বল, ও পরাক্রম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ" বলিয়াই তাঁহাকে অর্ঘ দান করিতে বলিলেন। ক্ষত্রগুণে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ, এইজন্যই অর্ঘ দিতে বলি-লেন। এখানে দেখা যাইতেছে ভীষ্ম কৃষ্ণের মনুষ্যচরিত্রই দেখিতেছেন।

এই কথানুসারে কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদত্ত হইল। তিনিও তাহাও গ্রহণ করিলেন। ইহা শিশুপালের অসহ্য হইল। শিশুপাল এককালীন ভীষ্ম, কৃষ্ণ, ও পাণ্ডবদিগকে তিরস্কার করিয়া যে বক্তৃতা করিলেন, বিলাতে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় উহা উক্ত হইলে উচিত দরে বিকাইত। তাঁহার বক্তৃতার প্রথমভাগে তিনি যাহা বলিলেন, তাহার বাগ্মিতা বড় বিশুদ্ধ অথচ তীব্র। কৃষ্ণ রাজা নহেন, তবে এত রাজা থাকিতে তিনি অর্ঘ পান কেন? যদি স্থবির বলিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাক, তবে তাঁর বাপ বসুদেবকে পূজা করিলেনা কেন? তিনি তোমাদের আত্মীয় এবং প্রিয়চিকীর্ষ বলিয়া কি তাঁর পূজা করিয়াছ? শ্বশুর দ্রুপদ থাকিতে তাঁকে কেন? কৃষ্ণকে আচার্য্য মনে করিয়াছ? দ্রোণাচার্য্য থাকিতে কৃষ্ণের অর্চ্চনা কেন? ইত্যাদি।

মহারাজ শিশুপাল কথা কহিতে কহিতে অন্যান্য বাগ্মীর ন্যায় গরম

---

* কৃষ্ণ, অভিমন্যু, সাত্যকি প্রভৃতি মহারথীর, এবং কদাপি স্বয়ং অর্জ্জুনেরও যুদ্ধবিদ্যার আচার্য্য।

হইয়া উঠিলেন। তখন লজিক ছাড়িয়া রেটরিকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়া দিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া কৃষ্ণকে ধরিলেন। অলঙ্কার শাস্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন,—প্রথমে "প্রিয়চিকীর্ষু" "অপ্রাপ্ত লক্ষণ" ইত্যাদি চুট্‌কিতে ধরিয়া, শেষ "ধর্ম্মভ্রষ্ট" "দুরাত্মা" প্রভৃতি বড় বড় গালিতে উঠিলেন। পরিশেষে Climax—কৃষ্ণ ঘৃতভোজী কুকুর, দারপরিগ্রহকারী ক্লীব, ইত্যাদি। গালির একশেষ করিলেন।

শুনিয়া, ক্ষমাগুণের পরমাধার, পরম যোগী আদর্শপুরুষ কোন উত্তর করিলেন না। কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল, যে তদ্দণ্ডেই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম—পরবর্ত্তী ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। কৃষ্ণও কখন যে এরূপ পরুষ বচনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এমন দেখা যায় না। তথাপি তিনি এ তিরস্কারে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। ইউরোপীয়দিগের মত ডাকিয়া বলিলেন না, "শিশুপাল! ক্ষমা ধর্ম্ম বড় ধর্ম্ম, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম।" নীরবে শত্রুকে ক্ষমা করিলেন।

কর্ম্মকর্ত্তা যুধিষ্ঠির আহূত রাজার ক্রোধ দেখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে গেলেন—যজ্ঞবাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তার যেমন দস্তর। মধুরবাক্যে কৃষ্ণের কুৎসাকারিকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুড়া ভীষ্মের সেটা বড় ভাল লাগিল না—বুড়ারা একটু খিট্‌খিটে, একটু স্পষ্টবক্তা হয়। বুড়া স্পষ্টই বলিল, "কৃষ্ণের অর্চ্চনা যাহার অনভিমত এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা অনুচিত।"

তখন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, সদর্থযুক্ত বাক্যপরম্পরায়, কেন তিনি কৃষ্ণের অর্চ্চনার পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন। আমরা সেই বাক্যগুলির সারভাগ উদ্ধৃত করিতেছি, কিন্তু তাহার ভিতর একটা রহস্য আছে, আগে দেখাইয়া দিই। কতকগুলি বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে আর সকল মনুষ্যের বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের যে সকল গুণ থাকে সে সকল গুণে কৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্য তিনি অর্ঘের যোগ্য। আবার তারই মাঝে কতকগুলি কথা আছে, তাহাতে ভীষ্ম বলিতেছেন, যে কৃষ্ণ স্বয়ং জগদীশ্বর এই জন্য কৃষ্ণ সকলের অর্চ্চনীয়। আমরা দুই রকম কথাই পৃথক্ পৃথক্ দেখাইতেছি, পাঠক তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করুন।

ভীষ্ম বলিলেন,

"এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দৃষ্ট হয় না, যাঁহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাজয় করেন নাই।"

এ গেল মনুষ্যত্ববাদ—তার পরেই দেবত্ববাদ—

"অচ্যুত কেবল আমাদিগের অর্চ্চনীয় এমত নহে, সেই মহাভুজ ত্রিলোকীর পূজনীয়। তিনি যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয় বর্গের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।"

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব,

"কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, লোকে মৎসন্নিধানে তাহা পুনঃ পুনঃ তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাঁহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য্য, বীর্য্য, কীর্ত্তি ও বিজয়, প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া"—

পরে, সঙ্গে সঙ্গে দেবত্ববাদ,

"সেই ভূতসুখাবহ জগদার্চ্চিত অচ্যুতের পূজা বিধান করিয়াছি।"

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব, পরিষ্কার রকম—

"কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে দুটি হেতু আছে; তিনি নিখিল বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী ও সমধিক বলশালী। ফলতঃ মনুষ্যলোকে তাদৃশ বলবান্ এবং বেদবেদাঙ্গসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া সুকঠিন। দান, দাক্ষ্য, শ্রুত, শৌর্য্য, লজ্জা, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায় গুণাবলি কৃষ্ণে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে। অতএব সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন আচার্য্য, পিতা ও গুরু স্বরূপ পূজার্হ কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি ঋত্বিক, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক, রাজা, এবং প্রিয়পাত্র। এই নিমিত্ত অচ্যুত অর্চ্চিত হইয়াছেন।"

পুনশ্চ দেবত্ববাদ,

"কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন কর্ত্তা, এবং সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, সুতরাং পরম পূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বুদ্ধি, মন, মহত্ত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, সমুদায়ই

একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্‌বিদিক্ সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। ইত্যাদি।"

প্রথমতঃ পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,* যে ভীষ্ম যে কৃষ্ণকে, বল, পরাক্রম ও শৌর্য্যাদিতে সকল ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, কিন্তু তদুচিত কৃষ্ণের কার্য্য আমরা মহাভারতে কোথায় দেখি? পাঠক মহাভারতে তাহা দেখিবেন না। মহাভারত কৃষ্ণের ইতিহাস নহে, পাণ্ডবদিগের ইতিহাস। পাণ্ডবদিগের ইতিহাস কথনে, প্রসঙ্গতঃ যেখানে কৃষ্ণের কথা আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানেই কেবল ভারতকার কৃষ্ণের কথা লিখিয়াছেন। কৃষ্ণ যেখানে পাণ্ডবদিগের সংশ্রবে থাকিয়া কোন কার্য্য করিয়াছেন, কেবল সেই কার্য্যই লিখিত হইয়াছে। নচেৎ কৃষ্ণের আনু-পূর্ব্বিক জীবনী ইহাতে নাই। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ নিরস্ত্র। এই শিশুপাল বধে, একবার মাত্র অস্ত্রধারী—তাও মুহূর্ত্ত জন্য। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী লিখিত হয় নাই বলিয়া, পরবর্ত্তী লেখকেরা ভাগবতাদি পুরাণে ও হরিবংশে সে অভাব পূরণের চেষ্টা পাইয়াছেন। আমাদেরও ইচ্ছা আছে যে ক্রমশঃ সে সকল হইতেও কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা করিব, ইহা প্রথমেই বলিয়াছি, নহিলে কৃষ্ণচরিত্র অসম্পূর্ণ থাকিবে। দুর্ভাগ্য বশতঃ যখন ঐ সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, তখন আসল বৃত্তান্ত সকল লোপ পাইয়াছিল—লেখকেরা উপন্যাসে ও রূপকের দ্বারাই অভাব পূরণ করিয়াছেন। সে সকলের ভিতর হইতে সত্যের উদ্ধার বড় কঠিন। মহাভারতই মৌলিক এবং কতকটা ঐতিহাসিক। ইহাতে আর কিছু না হৌক, তাঁহার সম-সাময়িকেরা তাঁহাকে কিরূপ বিবেচনা করিতেন, তাঁহার যশ ও কীর্ত্তি কিরূপ তাহার পরিচয় পাই। আর স্থানে স্থানে তাঁহার কৃত কার্য্যের ও কিছু কিছু প্রসঙ্গও আছে। উদ্যোগ পর্ব্বে স্বয়ং অর্জ্জুন কৃষ্ণের যুদ্ধ সকলের একটা তালিকা দিয়াছেন, আমরা তাহার চুম্বক দিতেছি।

(১) ভোজ রাজগণকে জয় করিয়া রুক্মিণীকে গ্রহণ।

(২) গান্ধার জয় ও রাজা সুদর্শনের বন্ধন মোচন।

(৩) পাণ্ড্যজয়।

(৪) কলিঙ্গজয়।

(৫) বারানশী জয়।

(৬) অন্যের অজেয় একলব্যের সংহার।

(৭) কংসনিপাত।

(৮) শাল্বজয়।

(৯) নরক বধ।

(৮) ও (৯) অনৈতিহাসিক বলিয়া বোধ হয়। আর সাতটি ঐতিহাসিক বোধ হয়। আমরা যখন গ্রন্থারম্ভের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তখন দেখাইব, যে এই কয়টিই ধর্ম্ম যুদ্ধ। ধর্ম্ম যুদ্ধ ভিন্ন কখন কৃষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিতেন না। অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে পারিলে কখনও গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু অস্ত্র গ্রহণ করিলে, অজেয় ছিলেন। ইহাই যোদ্ধার আদর্শ। যে যুদ্ধে একেবারে পরাঙ্মুখ, যে দুরাত্মার দমনার্থ ও যুদ্ধে অনিচ্ছুক, আপনার বা স্বজনের বা স্বদেশের রক্ষার্থ যুদ্ধেও অনিচ্ছুক, সে আদর্শ মনুষ্য নহে। এমন লোকের প্রশংসা করিতে যাহার প্রবৃত্তি হয়, হউক, আমি তাহাকে পাপাত্মা বলিব। যখন বিনা বলে ও বিনা যুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার পাপের দমন সম্ভব হইবে, একজন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট দুইটা ধর্ম্ম কথা শুনিতে পাইলেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সেণ্ট হেলেনায় বাস করিবে, একজন তৈমুরলঙ্গ একজন ব্রাহ্মণের পাকা দাড়ি দেখিলেই প্রণাম করিয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবে, এমন সময় কখন পৃথিবীতে আসিবে কিনা, বলিতে পারিনা। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখন আসে নাই, এবং ভবিষ্যতে আসিবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

ভীষ্ম বলিয়াছেন, কৃষ্ণের পূজার দুইটি কারণ (১) যিনি বলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, (২) তাঁহার তুল্য বেদ বেদাঙ্গপারদর্শী কেহ নহে। অদ্বিতীয় পরাক্রমের প্রমাণ কি, তাহা বলিলাম। কৃষ্ণের অদ্বিতীয় বেদজ্ঞতার প্রমাণ গীতা। যাহা আমরা ভগবদ্গীতা বলিয়া পাঠ করি, তাহা কৃষ্ণ-প্রণীত নহে। উহা ব্যাস প্রণীত বলিয়া খ্যাত—"বৈয়াসিকী সংহিতা" নামে পরিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া ঐ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভার-

তের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের ধর্ম্মমতের সঙ্কলন, ইহা আমার বিশ্বাস। তাঁহার মতাবলম্বী কোন মনিষী কর্ত্তৃক উহা এই আকারে সঙ্কলিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যথাকালে এ কথার সবিস্তারে বিচার করা যাইবে। এখন বলিবার কথা এই যে, গীতোক্ত ধর্ম্ম যাঁহার প্রণীত, তিনি স্পষ্টতই অদ্বিতীয় বেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বেদকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে বসাইতেন না—কখন বা বেদের একটু একটু নিন্দা করিতেন—যথা

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণো ভবার্জ্জুন।

কিন্তু তথাপি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ ব্যতীত অন্যের দ্বারা গীতোক্ত ধর্ম্ম প্রণীত হয় নাই, ইহা যে গীতা ও বেদ উভয়ই অধ্যয়ন করে, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে।

যিনি এইরূপ, পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্য্যে ও শিক্ষায়, কর্ম্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্ম্মে, দয়ায় ও ক্ষমায়, তুল্য রূপেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ পুরুষ।

সীতারাম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী, নীলবারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে।* গিরিশিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে নিম্নে সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ শোভিত,

---

* এখন বিরূপা অতিশয় বিরূপা। এখন তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ইংরেজের প্রতাপে বৈতরণী স্বয়ং বাঁধা—বিরূপাই বা কে—আর কেই বা কে?

ধানা বা হরিৎক্ষেত্র রঞ্জিত, পৃথ্বী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়—শিশু যেমন মার কোলে উঠিলে মাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখে, মনুষ্য পর্ব্বতারোহণ করিয়া পৃথিবী দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে। উদয়গিরি (বর্ত্তমান অল্‌তি-গিরি) বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি (বর্ত্তমান নাল্‌তিগিরি) বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ, এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখর দেশে চন্দনবৃক্ষ, আর মৃত্তিকা প্রোথিত ভগ্নগৃহাবশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তি রাশি। তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। হায়! এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডষ্ট্রীয়ল স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ্ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর শিল্প ছাড়িয়া, সাহেবদের চিনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে বলিতে পারি না।

আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারিদিকে—যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া—হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র,—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু যোজন বিস্তৃতা পীতাম্বরী সাটী। তাহার উপর, মাতার অলঙ্কার স্বরূপ, তালবৃক্ষশ্রেণী—সহস্র সহস্র, তার পর সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র সহস্র, তালবৃক্ষ; সরল, সুপত্র, শোভাময়! মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা, নীল পীত পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্র মধ্য দিয়া বহিতেছে —সুকোমল গালিচার উপর কে যেন নদী আঁকিয়া দিয়াছে। তা যাক —চারি পাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তর মূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্প মাল্যাভরণভূষিত, বিকম্পিত চেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সংমিলন স্বরূপ পুরুষ মূর্ত্তি, যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমগর্ব্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা পীবর-যৌবনভারাবনতদেহা—

তন্বীশ্যামাশিখরদশনাপক্কবিম্বাধরোষ্ঠী,
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণানিম্ননাভি—

এই সকল স্ত্রী মূর্ত্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পানিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

সেই ললিতগিরির পদতলে বিরূপা-তীরে গিরির শরীর মধ্যে, হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। গুহা বলিয়া আবার ছিল বলিতেছি কেন? পর্ব্বতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি আবার লোপ পায়? কাল বিগুণ হইলে সবই লোপ পায়। গুহাও আর নাই। ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—তলদেশে ঘাস গজাইতেছে। সর্ব্বস্ব লোপ পাইয়াছে, গুহাটার জন্য দুঃখে কাজ কি?

কিন্তু গুহা বড় সুন্দর ছিল। পর্ব্বতাঙ্গ হইতে খোদিত স্তম্ভ প্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল। চারিদিকে অপূর্ব্ব প্রস্তরে খোদিত নরমূর্ত্তি সকল শোভা করিত। তাহারই দুই চারিটি আজিও আছে। কিন্তু ছাতা পড়িয়াছে, রঙ্গ জলিয়া গিয়াছে, কাহারও নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে। পুতুল গুলাও আধুনিক হিন্দুর মত অঙ্গহীন হইয়া আছে।

কিন্তু গুহার এ দশা আজ কাল হইয়াছে। আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন এমন ছিল না—গুহা সম্পূর্ণ ছিল। তাহার ভিতর পরম যোগী মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী বাস করিতেন।

যথাকালে ভৈরবী শ্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গঙ্গাধর স্বামী তখন ধ্যানে নিমগ্ন। অতএব কিছু না বলিয়া, তাঁহারা সে রাত্রি গুহাপ্রান্তে শয়ন করিয়া যাপন করিলেন।

প্রত্যূষে ধ্যান ভঙ্গ হইলে, গঙ্গাধরস্বামী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, বিরূপায় স্নান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। পরে তিনি প্রত্যাগত হইলে ভৈরবী প্রণতা হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল; শ্রীও তাহাই করিল।

গঙ্গাধরস্বামী শ্রীর সঙ্গে তখন কোন কথা কহিলেন না, বা তৎসম্বন্ধে ভৈরবীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বৎসে! তোমার মঙ্গল? তোমার ব্রত সাঙ্গ হইয়াছে?"

ভৈরবী। এ জন্মে হইবার সম্ভাবনা নাই।

স্বামী। পাপ!

ভৈরবী চুপ করিয়া, মুখ নত করিল।

স্বামী। তবে এক্ষণে কি করিবে?

ভৈরবী। যাহা করিতেছি, তাহাই করিব। আমার কোন দুঃখ নাই। যদিই থাকে, তবে একটা দুঃখের ভার মরণ পর্য্যন্ত বহা যায় না?

স্বামী। একটা কেন, সহস্র দুঃখ ভার বহন করা যায়। যাহার সহস্র দুঃখ, সে সহস্র দুঃখেরই ভার মৃত্যু পর্য্যন্ত বহন করে। গর্দ্দভের পিঠে বোঝা চাপাইয়া দিলে, সে কি ফেলিয়া দেয়? যাহারা বহন করে, তাহারা মনুষ্য বেশে গর্দ্দভ। যে দুঃখ মোচন করে, সেই মানুষ। তুমি আপনার দুঃখ মোচন করিতেছ না কেন?

ভৈরবী। তাহার উপায় জানি না। স্ত্রীলোক বলিয়া, আপনি যোগাভ্যাস নিষেধ করিয়াছেন।

স্বামী। যোগ কি? জ্ঞানই যোগ। জ্ঞানে কে অনধিকারী? বেদে ভিন্ন কি জ্ঞান নাই? জ্ঞানই আনন্দ। তোমার ত জ্ঞানের অভাব নাই। দুঃখ কেন?

ভৈরবী। আমি উপদেশ লইয়াছি কিন্তু আমার শিক্ষা হয় নাই।

স্বামী। কর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান নাই।

ভৈরবী। আমার কর্ম্ম হয় নাই।

স্বামী। এখন কোথা যাইতেছ?

ভৈরবী। পুরুষোত্তম দর্শনে।

স্বামী। কেন?

ভৈরবী। আর কোন কাজ নাই।

স্বামী। কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর না কেন? তীর্থ দর্শন ত সকাম কর্ম্ম।

ভৈরবী। আমার ইহাতে কোন কামনা নাই। কেবল ভূত-তাড়িত হইয়া ফিরিতেছি।

স্বামী। ভাল, দর্শন করিয়া ফিরিয়া আইস। আমি তোমাকে উপযুক্ত কর্ম্ম বলিয়া দিব। এ স্ত্রী কে?

ভৈরবী। পথিক।

স্বামী। এখানে কেন?

ভৈরবী। প্রারব্ধ লইয়া গোলে পড়িয়াছি। আপনাকে কর দেখাইবার জন্য আসিয়াছে। উহার প্রতি ধর্ম্মানুরত আদেশ করুন।

শ্রী তখন নিকটে আসিয়া আবার প্রণাম করিল। স্বামী তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন,

"তোমার কর্কট রাশি।"

শ্রী তা কিছুই বুঝে না, চুপ করিয়া রহিল। আরও একটু দেখিয়া স্বামী বলিলেন,

"তোমার পুষ্যা নক্ষত্রস্থিত চন্দ্রে জন্ম।"

শ্রী নীরব।

"গুহার বাহিরে আইস—হাত দেখিব।"

তখন শ্রীকে বাহিরে আনিয়া, তাহার বাম হস্তের রেখা সকল, স্বামী নিরীক্ষণ করিলেন। খড়ি পাতিয়া জন্ম, শক, দিন, বার, তিথি, দণ্ড, পল সকল নিরূপণ করিলেন। পরে জন্মকুণ্ডলী অঙ্কিত করিয়া, গুহাস্থিত তালপত্রলিখিত প্রাচীন পঞ্জিকা দেখিয়া, দ্বাদশভাবে গ্রহগনের যথাযথ সমাবেশ করিলেন। পরে শ্রীকে বলিলেন,

"তোমার লগ্নে স্বক্ষেত্রস্থ পূর্ণচন্দ্র এবং সপ্তমে বুধ বৃহস্পতি শুক্র তিনটি শুভ গ্রহ আছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী কেন মা? তুমি যে রাজমহিষী।" †

শ্রী। শুনিয়াছি, আমার স্বামী রাজা হইয়াছেন। আমি তাহা দেখি নাই।

পরকনক-শরীরো দেব নম্র প্রকাশ্যঃ
ভবতি বিপুলবক্ষ কর্কটো যস্য রাশিঃ

কোষ্ঠীপ্রদীপে।

এইরূপ লক্ষণাদি দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা রাশি ও নক্ষত্র নির্ণয় করেন।

† জায়াস্থে চ শুভত্রয়ে প্রণয়িণী রাজ্ঞী ভবেদ্ভূপতেঃ।

স্বামী। তুমি তাহা দেখিবে না বটে। এই সপ্তমস্থ বৃহস্পতি নীচস্থ, এবং শুভ গ্রহত্রয় পাপ গ্রহের ক্ষেত্রে ‡ পাপদৃষ্ট হইয়া আছেন। তোমার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ নাই।

শ্রী। আর কিছু দুর্ভাগ্য দেখিতেছেন?

স্বামী। চন্দ্র শনির ত্রিংশাংশগত।

শ্রী। তাহাতে কি হয়?

স্বামী। তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হইবে।

শ্রী আর বসিল না—উঠিয়া চলিল। স্বামী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ফিরাইলেন। বলিলেন,

"তিষ্ঠ। তোমার অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে। তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলে স্বামী সন্দর্শনে গমন করিও।"

শ্রী। কবে সে সময় উপস্থিত হইবে?

স্বামী। এখন তাহা বলিতে পারিতেছি না। অনেক গণনার প্রয়োজন। সে সময়ও নিকট নহে। তুমি কোথা যাইতেছ?

শ্রী। পুরুষোত্তম দর্শনে যাইব, মনে করিয়াছি।

স্বামী। যাও। সময়ান্তরে, আগামী বৎসরে, তুমি আমার নিকট আসিও। সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলিব।

তখন ভৈরবী বলিল,

"পিতঃ, আমারও প্রতি ঐরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন—আমি কবে আসিব?"

স্বামী। দুইজনে এক সময়েই আসিও।

তখন গঙ্গাধরস্বামী বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। ভৈরবীদ্বয় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গুহা হইতে বহির্গত হইল।

---

‡ মকরে

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার সেই যুগল ভৈরবীমূর্ত্তি উড়িষ্যার রাজপথ আলো করিয়া পুরুষোত্তমাভিমুখে চলিল। উড়িয়ারা পথে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। কেহ আসিয়া তাহাদের পায়ের কাছে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, "মো মুণ্ডেরে চরড় দিবারে হউ!" কেহ বলিল, "টিকে' ঠিয়া হৈকিরি ম দুঃখ শুনিবারে হউ।" সকলকে যথাসম্ভব উত্তরে প্রফুল্ল করিয়া সুন্দরীদ্বয় চলিল।

চঞ্চলগামিনী শ্রীকে একটু স্থির করিবার জন্য ভৈরবী বলিল,

"ধীরে যা গো বহিন্! একটু ধীরে যা—ছুটিলে কি অদৃষ্ট ছাড়াইয়া যাইতে পারিবি।"

স্নেহ সম্বোধনে শ্রীর প্রাণ একটু জুড়াইল। দুই দিন ভৈরবীর সঙ্গে থাকিয়া, শ্রী ভৈরবীকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এ দুই দিন, মা! বাছা! বলিয়া কথা হইতেছিল,—কেননা ভৈরবী শ্রীর পূজনীয়া। আজ ভৈরবী সে সম্বোধন ছাড়িয়া বহিন্ সম্বোধন করায় শ্রী বুঝিল যে ভৈরবীও ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রী ধীরে চলিল।

ভৈরবী বলিতে লাগিল—"আর মা বাছা সম্বোধন তোমার সঙ্গে পোষায় না—আমরা দুইজনেই সমান বয়স, বুঝি সমান দুঃখে এই পৃথিবীতে ঘুরিতে থাকিব। আমরা দুইজনে ভগিনী।

শ্রী। আমার এমনই অদৃষ্ট যে যে আমার সংসর্গে আসে সেই দুঃখী। তুমিও কি আমার মত দুঃখে সংসার ত্যাগ করিয়াছ?

ভৈরবী। সে দুঃখ একদিন তোমাকে বলিব। তোমারও দুঃখের কথা শুনিব। সে এখনকার কথা নয়। তোমার নাম এখনও পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয় নাই—কি বলিয়া তোমায় ডাকিব?

শ্রী। আমার নাম শ্রী। তোমায় কি বলিয়া ডাকিব?

ভৈরবী। আমার নাম জয়ন্তী। আমাকে তুমি নাম ধরিয়াই ডাকিও। এখন তোমাকে আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করি, স্বামী যাহা বলিলেন, তাহা

শুনিলে? এখন বোধ হয় তোমার আর ঘরে ফিরিবার ইচ্ছা নাই। দিন কাটাইবারও অন্য উপায় নাই। দিন কাটাইবে কি প্রকারে কখন কি ভাবিয়াছ?

শ্রী। না। ভাবি নাই। কিন্তু এতদিন ত কাটিয়া গেল।

জয়ন্তী। কিরূপে কাটিল?

শ্রী। বড় কষ্টে—পৃথিবীতে এমন দুঃখ বুঝি আর নাই।

জয়ন্তী। ইহার এক উপায় আছে—আর কিছুতে মন দাও।

শ্রী। কিসে মন দিব?

জয়ন্তী। এত বড় জগৎ--কিছুই কি মন দিবার নাই?

শ্রী। পাপে?

জয়ন্তী। না। পুণ্যে।

শ্রী। স্ত্রীলোকের পুণ্য একমাত্র স্বামী-সেবা—যখন তাই ছাড়িয়া আসিয়াছি—তখন আমার আবার পুণ্য কি আছে?

জয়ন্তী। স্বামির একজন স্বামী আছেন।

শ্রী। তিনি স্বামীর স্বামী—আমার নন। আমার স্বামীই আমার স্বামী—আর কেহ নহে।

জয়ন্তী। যিনি তোমার স্বামীর স্বামী, তিনি তোমারও স্বামী—কেননা তিনি সকলের স্বামী।

শ্রী। আমি ঈশ্বরও জানি না—স্বামীই জানি।

জয়ন্তী। জানিবে? জানিলে এত দুঃখ থাকিবে না।

শ্রী। না। স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহি না। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ, ইহার মধ্যে আমার স্বামী বিরহ দুঃখই আমি ভালবাসি।

জয়ন্তী। যদি এত ভালবাসিয়াছিলে—তবে ত্যাগ করিলে কেন?

শ্রী। আমার কোষ্ঠীর ফল শুনিলে না? কোষ্ঠীর ফল শুনিয়াছিলাম।

জয়ন্তী। এত ভাল বাসিয়াছিলে কিসে?

শ্রী তখন সংক্ষেপে আপনার পূর্ব্ববিবরণ সকল বলিল। শুনিয়া জয়ন্তীর চক্ষু দিয়া ফোঁটা দুই চারি জল পড়িল। জয়ন্তী বলিল—

"তোমার সঙ্গে তাঁর ত দেখা সাক্ষাৎ নাই বলিলেও হয়— এত ভাল বাসিলে কিসে?"

শ্রী। তুমি ঈশ্বর ভাল বাস—কয় দিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে?

জয়ন্তী। আমি ঈশ্বরকে রাত্রি দিন মনে মনে ভাবি।

শ্রী। যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রি দিন ভাবিয়াছিলাম।

জয়ন্তী শুনিয়া রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া উঠিল। শ্রী বলিতে লাগিল, "যদি একত্রে ঘর-সংসার করিতাম, তাহা হইলে বুঝি এমনটা ঘটিত না। মানুষ মাত্রেরই দোষ গুণ আছে। তাঁরও দোষ থাকিতে পারে। না থাকিলেও আমার দোষে আমি তাঁর দোষ দেখিতাম। কখন না কখন, কথান্তর, মনভার, অকুশল ঘটিত। তা হইলে, এ আগুণ এত জ্বলিত না। কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি। চন্দন ঘষিয়া, দিয়ালে মাখাইয়া লেপন করিয়া মনে করিয়াছি, তাঁর অঙ্গে মাখাইলাম। বাগানে বাগানে ফুল চুরি কবিয়া তুলিয়া, দিন ভোর কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া অনেক পরিশ্রমে মনের মত মালা গাঁথিয়া, ফুলময় গাছের ডালে ঝুলাইয়া মনে করিয়াছি তাঁর গলায় দিলাম। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়া পরিপাটি করিয়া রন্ধন করিয়া, নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছি, তাঁকে খাইতে দিলাম। ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া কখন মনে হয় নাই যে ঠাকুর প্রণাম করিতেছি—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি। তার পর জয়ন্তী—তাঁকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ডাকিলেন, তবু ছাড়িয়া আসিয়াছি।"

শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।

জয়ন্তীও কাঁদিল। এমন ভৈরবী কি ভৈরবী?

———

বেদের ঈশ্বরবাদ।

প্রবাদ আছে হিন্দুদিগের তেত্রিশ কোটি দেবতা, কিন্তু বেদে বলে মোটে তেত্রিশটি দেবতা। এ সম্বন্ধে আমরা প্রথম প্রবন্ধে যে সকল ঋক্ উদ্ধৃত করিয়াছি, পাঠক তাহা স্মরণ করুন। আমরা দেখিয়াছি, বেদে বলে এই তেত্রিশটি দেবতা তিন শ্রেণীভুক্ত; এগারটি আকাশে, এগারটি অন্তরিক্ষে, এগারটি পৃথিবীতে।

ইহাতে যাস্ক কি বলেন শুনা যাউক। তিনি অতি প্রাচীন নিরুক্তকার— আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিত নহেন। তিনি বলেন,

"তিস্রো এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বা ইন্দ্রো বা অন্তরিক্ষস্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাদ্ একৈকস্যাপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি। অপি বা কর্ম্মপৃথকত্বাৎ যথা হোতা অধ্বর্য্যুব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যপ্যেকস্য সতঃ।" ৭। ৫।

অর্থাৎ "নৈরুক্তদিগের মতে বেদের দেবতা তিন জন। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূর্য্য। তাঁহাদের মহাভাগত্ব কারণ এক এক জনের অনেক গুলি নাম। অথবা তাঁহাদিগের কর্ম্মের পার্থক্য জন্য, যথা হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা, এক জনেরই নাম হয়।

তেত্রিশ কোটির স্থানে গোড়ায় তেত্রিশ পাইয়াছিলাম, এখন নিরুক্তের মতে, তেত্রিশের স্থানে মোটে তিনজন দেখিতেছি—অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র, এবং সূর্য্য। বহুসংখ্যক পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য দ্বারা যে জগৎ শাসিত হয় না—জাগতিকী শক্তি এক, বহুবিধা নহে, পৃথিবীতে সর্ব্বত্র এক নিয়মের শাসন, অন্তরিক্ষ সর্ব্বত্র এক নিয়মের শাসন, এবং আকাশে সর্ব্বত্র এক নিয়মের শাসন এখন তাঁহারা দেখিতেছেন। পৃথিবীতে আর এগারটি পৃথক্ দেবতা নাই—এক দেবতা, তাঁহার কর্ম্মভেদে অনেক নাম, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি এক, অনেক দেবতা নহেন। তেমনি অন্তরিক্ষেও এক দেবতা, আকাশেও এক দেবতা।

এখনও প্রকাশ পাইতেছে না, যে ঋষিরা জাগতিক শক্তির সম্পূর্ণ ঐক্য অনুভূত করিয়াছেন। এখন পৃথিবীর এক দেবতা, অন্তরিক্ষের অন্য দেবতা, আকাশের তৃতীয় দেবতা। জীব, উদ্ভিদাদির উৎপত্তি ও রক্ষা হইতে বায়ু বৃষ্টি প্রভৃতি অন্তরিক্ষের ক্রিয়া এত ভিন্নপ্রকৃতি, আবার সে সকল হইতে আলোকাদি আকাশব্যাপার সকল এত ভিন্ন, যে এই তিনের ঐক্য এবং একনিয়মাধীনত্ব অনুভূত করা আরও কাল সাপেক্ষ। কিন্তু অসীম প্রতিভা সম্পন্ন বৈদিক ঋষিদিগের নিকট তাহাও অধিক দিন অস্পষ্ট থাকে নাই। ঋগ্বেদসংহিতাতেই পাওয়া যায়, "মূর্দ্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ সূর্য্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।" (১০। ৮৮) অগ্নি রাত্রে পৃথিবীর মস্তক; প্রাতে তিনি সূর্য্য হইয়া উদয় হন।" পুনশ্চ "যদেনমদধুর্য্যজ্ঞিয়াসে দিবি দেবাঃ সূর্য্যমাদিতেয়ম্।" ইহাতে "এনং অগ্নিং সূর্য্যং আদিতেয়ং" ইত্যাদি বাক্যে অগ্নিই সূর্য্য বুঝাইতেছে।

এই সূক্তের ব্যাখ্যায় যাস্ক বলেন, "ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ" অর্থাৎ শাকপূণি (পূর্ব্বগামী নিরুক্তকার), বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে, এবং আকাশে তিন স্থান অগ্নি আছেন।" ভৌম, অন্তরিক্ষ, ও দিব্য, এই ত্রিবিধ দেবই তবে অগ্নি।

অগ্নি সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক কথা পাওয়া যায়। ক্রমে জগতের একশক্ত্যধীনত্ব ঋষিদিগের মনে আরও স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু রথো দিব্য স সুপর্ণ গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি। অগ্নিং যমং মাতরিশ্বন্।" ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি বল, বা দিব্য সুপর্ণ গরুত্মান্ বল, এক জনকেই বিপ্রগণে অনেক বলেন, যথা, অগ্নি যম মাতরিশ্বন্।" পুনশ্চ, অথর্ব্ব বেদে, "স বরুণঃ সায়মগ্নির্ভবতি স মিত্রোভবতি প্রাতরুদ্যন্। স সবিতাভূত্বা অন্তরিক্ষেণ যাতি, স ইন্দ্রোভূত্বা তপতি মধ্যতো দিবং" সেই অগ্নিই সায়ংকালে বরুণ হয়েন। তিনিই প্রাতঃকালে উদয় হইয়া মিত্র হয়েন। তিনিই সবিতা হইয়া অন্তরিক্ষে গমন করেন, এবং ইন্দ্র হইয়া মধ্যাকাশে তাপ বিকাশ করেন।

এইরূপে ঋষিরা বুঝিতে লাগিলেন, যে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবীর দেবগণ অন্তরিক্ষের দেবগণ, এবং আকাশের দেবগণ, সব এক। অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা

পৃথিবী শাসিত হয়, যে শক্তির দ্বারা অন্তরিক্ষের প্রক্রিয়া সকল শাসিত হয়, আর যে শক্তির দ্বারা আকাশের প্রক্রিয়া সকল শাসিত হয়, সবই এক। জগৎ একইনিয়মের অধীন। একই নিয়ন্তার অধীন। "মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্" (ঋগ্বেদ সংহিতা ৩।৫৫) এইরূপে বেদে একেশ্বরবাদ উপস্থিত হইল। অতএব বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম তেত্রিশ দেবতারও উপাসনা নহে, তিন দেবতারও উপাসনা নহে, এক ঈশ্বরের উপাসনাই বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম। বেদে যে ইন্দ্রাদির উপাসনা আছে, তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য কি তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। স্থূলতঃ উহা জড়ের উপাসনা। সেইটি বেদের প্রাচীন এবং অসংস্কৃতাবস্থা। সূক্ষ্মতঃ উহার ঈশ্বরের বিবিধ শক্তি এবং বিকাশের উপাসনা—ঈশ্বরেরই উপাসনা। ইহাই বৈদিক ধর্ম্মের পরিণাম, এবং সংস্কৃতাবস্থা। সাধারণ হিন্দু যদি জানিত যে বেদে কি আছে, তাহা হইলে কখন আজিকার হিন্দুধর্ম্ম এমন কুসংস্কারাপন্ন এবং অবনত হইত না; মনসা মাকালের পূজায় পৌঁছিত না। জ্ঞান, চাবি তালার ভিতর বদ্ধ থাকাই, উন্নতিপ্রাপ্ত সমাজের অবনতির কারণ। ভারতবর্ষে সচরাচর জ্ঞান চাবি তালার ভিতর বদ্ধ থাকে; যাঁহার হাতে চাবি তিনি কদাচ কখন সিন্ধুক খুলিয়া, এক আধ টুকরা কোন প্রিয় শিষ্যকে বখ্‌শিষ করেন। তাই, ভারতবর্ষ অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার হইলেও সাধারণ ভারতসন্তান অজ্ঞান। ইউরোপের পুঁজি পাটা অপেক্ষাকৃত অল্প, কিন্তু ইউরোপীয়েরা জ্ঞান বিতরণে সম্পূর্ণ মুক্তহস্ত। এইজন্য ইউরোপের ক্রমশঃ উন্নতি, আর এই জন্য ভারতবর্ষের ক্রমশঃ অবনতি। বেদ এতদিন চাবিতালার ভিতর ছিল, তাই বেদমূলক ধর্ম্মের ক্রমশঃ অবনতি। সৌভাগ্যক্রমে, বেদ এখন সাধারণ বাঙ্গালির বোধগম্য হইতে চলিল। বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুবাদ সকল প্রচার হইতেছে। বাবু মহেশচন্দ্র পাল উপনিষদ্ ভাগের সানুবাদ প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতা প্রভৃতির অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন। এই তিনজনেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

---

* এস্থলে বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

এই রূপে বৈদিক ঋষিরা ক্রমে ক্রমে এক দেবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জানিলেন যে একজনই সব করিয়াছেন ও সব করেন। যাস্ক বলেন—"মাহাত্ম্যাদ্দেবতায়াঃ এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে। একস্যাত্মনোহন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানিভবন্তি।"

ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ অতি গুরুতর ব্যাপার। রমেশ বাবু যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতা, বিশুদ্ধি, এবং সর্ব্বাঙ্গীনতার সহিত এই কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতেছেন, ইউরোপে হইলে এত দিন বড় জয় জয়কার পড়িয়া যাইত। আমাদের সমাজে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া, ভরসা করি, তিনি ভগ্নোৎসাহ হইবেন না। আমরা যত দূর বুঝিতে পারি, এবং প্রথম অষ্টকের অনুবাদ দেখিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাঁহার ভূয়োভূয়ো প্রশংসা করিতে আমরা বাধ্য। পাঠকেরা বোধ করি জানেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক স্থানে সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, যে রমেশ বাবু সর্ব্বত্রই সায়নের অনুগামী হইয়াছেন।

বেদ সম্বন্ধে কতকগুলি বিলাতী মত আছে। অনেক স্থলে সেই মতগুলি অশ্রদ্ধেয়, অনেক স্থলে তাহা অতি শ্রদ্ধেয়। শ্রদ্ধেয় হউক অশ্রদ্ধেয় হউক, হিন্দুর সেগুলি জানা আবশ্যক। জানিলে বৈদিক তত্ত্ব সমুদায়ের তাঁহারা সুমীমাংসা করিতে পারেন। আমার যাহা মত, তাহার প্রতিবাদীরা কেন তাহার প্রতিবাদ করে, তাহা না জানিলে আমার মতের সত্যাসত্য কখনই আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না। অতএব সেই সকল মত সঙ্কলন করিয়া টীকাতে উহা সন্নিবেশিত করাতে রমেশ বাবুর অনুবাদ বিশেষ উপকারক হইয়াছে। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে রমেশ বাবু ৩০০ পৃষ্ঠ পুস্তকের ৷৶০ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, বোধ করি ইহা কেবল ছাপার খরচেই বিক্রীত হইতেছে।

যিনি যাহাই বলুন, রমেশচন্দ্রের এই কীর্ত্তিটি চিরস্মরণীয় হইবে। ইউরোপে যখন বাইবেল প্রথম ইংরেজি প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হয়, তখন রোমকীয় পুরোহিত এবং অধ্যাপক সম্প্রদায়, অনুবাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। রমেশ বাবুর প্রতিও সেই রূপ অত্যাচার হওয়াই সম্ভবে। কিন্তু যেমন বাইবেলের সেই অনুবাদে, ইউরোপ উপধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় উন্নতির পথ অনর্গল হইল, রমেশ বাবুর এই অনুবাদে এ দেশে তদ্রূপ সুফল ফলিবে। বাঙ্গালী ইহাঁর ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিবে না।

মাহাত্ম্যপ্রযুক্ত এক আত্মা বহু দেবতা স্বরূপ স্তুত হন। দেবতা সকলেই একই আত্মার প্রত্যঙ্গমাত্র। অতএব ঈশ্বর এক ইহা স্থির।

(১) তিনি একাই এই বিশ্ব নির্ম্মিত করিয়াছেন, এই জন্য বেদে তাঁহার এক নাম **বিশ্বকর্ম্মা**। ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ৮১ ও ৮২ সূক্তে জগৎকর্ত্তার এই নাম—পুরাণেতিহাসে বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদের প্রধান শিল্পকর মাত্র। সূক্তে আছে যে তিনি আকাশ ও পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছেন (১০।৮১।২ বিশ্বময় (বিশ্বতঃ) তাঁহার চক্ষু, মুখ, বাহু, পদ (ঐ,৩) ইত্যাদি।

(২) তিনি **হিরণ্যগর্ভ**। এই হিরণ্যগর্ভের নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার ব্যাখ্যা আছে। হেমতুল্য নারায়ণসৃষ্ট অণ্ড হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রহ্মাকে মনুসংহিতায় হিরণ্যগর্ভ বলা হইয়াছে এবং পুরাণেতিহাসে ও হিরণ্যগর্ভ শব্দের ঐ রূপ ব্যাখ্যা আছে। ঐ দশমণ্ডলের ১২১ সূক্তে হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বাগ্রে জাত, সর্ব্বভূতের একমাত্র পতি, সর্গ মর্ত্ত্যের সৃষ্টি কর্ত্তা, আত্মদ, বলদ, বিশ্বের উপাসিত, জগতের একমাত্র রাজা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৩) তিনি **প্রজাপতি**। তাঁহা হইতে সকল প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে। স্থানে স্থানে সূর্য্য বা সবিতাকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে। কিন্তু পরিশেষে যাঁহাকে ঋষিরা জগতের একমাত্র চৈতন্য বিশিষ্ট সর্ব্বস্রষ্টা বলিয়া বুঝিলেন তখন তাহাকেই এই নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক দিনে ব্রহ্মাই এই নাম প্রাপ্ত হইলেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় ব্রহ্মা শব্দ নাই।

প্রথম অষ্টকের অনুবাদ একখণ্ড আমাদিগের নিকট সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। প্রচারে কোন গ্রন্থের সমালোচনা হয় না, এবং বর্ত্তমান লেখকও গ্রন্থ সমালোচনার কার্য্যে হস্তক্ষেপকরণে পরাঙ্মুখ। এজন্য প্রচারে উহার সমালোচনার সম্ভাবনা নাই। তবে, যে উদ্দেশ্যে প্রচারে এই বৈদিক প্রবন্ধগুলি লিখিত হইতেছে, এই অনুবাদ সেই উদ্দেশ্যের সহায় ও সাধক। এই জন্য এই অনুবাদ সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলা প্রয়োজন বিবেচনা করিলাম। বেদে কি আছে, তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে বেদের অনুবাদ পাঠ করিতে হইবে—আমরা বেশী উদাহরণ উদ্ধৃত করি—প্রচারে এত স্থান নাই।

(৪) ব্রহ্ম শব্দ ও আমি ঋগ্বেদ সংহিতায় কোথাও দেখিতে পাই নাই। অথচ বেদের যে পর ভাগ, উপনিষদ, এই ব্রহ্ম নিরূপণ তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ ভাগে ও বাজসনেয় সংহিতায় ও অথর্ব বেদে ব্রহ্মকে দেখা যায়। সে সকল কথা পরে হইবে।

(৫) ঋগ্বেদসংহিতার ৯০ সূক্তকে পুরুষ সূক্ত বলে। ইহাতে সর্ব্বব্যাপী পুরুষের বর্ণনা আছে। এই পুরুষ শত পথ ব্রাহ্মণে নারায়ণ নামে কথিত হইয়াছেন। অদ্যাপি বিষ্ণু পূজার পুরুষ সূক্তের প্রথম ঋক ব্যবহৃত হয়—

সহস্র শীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ

সভূমিং বিশ্বতোবৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং

কথিত হইয়াছে যে এই পুরুষকে দেবতারা হবির সঙ্গে যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞ ফলে সমস্ত জীবের উৎপত্তি। এই পুরুষ "সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্য"—সমস্ত বিশ্ব ইহার এক পাদ মাত্র। বিশ্বকর্ম্মা হিরণ্য গর্ভ ও প্রজাপতির সঙ্গে, এই পুরুষ একীভূত হইলে, বৈদান্তিক পরব্রহ্মে প্রায় উপস্থিত হওয়া যায়।

অতএব অতি প্রাচীন কালেই বৈদিকেরা জড়োপাসনা হইতে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিছু দিন সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাদি বহুদেবের উপাসনা রহিল। ক্রমে ক্রমে দেখিব, যে সেই ইন্দ্রাদিও পর-মাত্মায় লীন হইলেন। দেখিব যে হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম একমাত্র জগদীশ্বরের উপাসনা। আর সকলই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র।

যেঽপ্যন্য দেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ

তেপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকং। গীতা ৯। ২৩

আমরা ঋগ্বেদ হইতেই আরম্ভ করি, আর রামপ্রসাদের শ্যামা বিষয় * হইতেই আরম্ভ করি, সেই কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মেই উপস্থিত হইতে হইবে। বুঝিব —এক ঈশ্বর আছেন, অন্য কোন দেবতা নাই। ইন্দ্রাদি নামেই ডাকি, সেই একজনকেই ডাকি। ইহাই কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম।

---

* রামপ্রসাদ কালী নামে পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন।

প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি।

এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি।

গঙ্গার স্তোত্র।

(হরিদ্বারের নিকট গঙ্গাদর্শনে।)

বন্দে গিরিবালে।
নগরাজ-কোল-শোভিনি,
কল কল কলভাষিনি,
সপ্তধার-হারধারিণি,
বিমলে।
বন্দে গিরিবালে॥
হরিদ্বার-দ্বারচারিণি,
জাহ্নবী-নামধারিণি,
গিরি নীলে-নীলবরণি,
মা মঙ্গলে।
বন্দে গিরিবালে॥
বন্দে গিরিবালে।
অবিরাম-গতি-গঙ্গে,
চির-নীর-হার-অঙ্গে,
দ্রুমরাজি চলে সঙ্গে,
তটভঙ্গি কত ভঙ্গে,
মাতঃ গঙ্গে।
তব তীরে কুশকাশ,
তব নীরে কত ভাষ,
কভু ধীরে মৃদু হাস,
কভু ভীষণ গতি ভঙ্গে।
মাতঃ গঙ্গে॥
মাতর্গঙ্গে, তব নীরকুশলে
জম্বুদ্বীপ খ্যাত মহীমণ্ডলে
নির্ম্মল সলিলে ভারতমেখলে
মা গঙ্গে।
পুণ্য-শরীরে তব নীরতীরে
যুগ যুগান্তে কত কত বীরে
কত মহামতি তব তীর্থে ধীরে,
অস্থিভস্ম নিজ মিশায়েছে অঙ্গে
মাতর্গঙ্গে॥
ধন্য জীবন তব ভূতলচারিনি
যোজন যোজন বর্ত্মবিহারিনি
কাল মাহাত্ম্যে মা শৃঙ্খলধারিণি
বদ্ধ সুড়ঙ্গে।*
নৃত্য করিতে আগে সিংহের অঙ্গে,
কাল-প্রলয়ে মাতঃ সেহ আজি রঙ্গে
সুড়ঙ্গ † দ্বার ধরে বিকট বিভঙ্গে
তব কপালে।
বন্দে গিরিবালে।
মাতঃ শৈলজে তব স্রোত মালে
কে পারে ভুবনে রোধিতে স্ববলে,
ধূর্জ্জটি লজ্জিত বাঁধি জটজালে
বিপুলে।
বন্দে গিরিবালে।
সুন্দর হিমধাম হিমগিরি অঙ্গে,
পদতল-বাহিনি শ্বেত তরঙ্গে;
বেষ্টিত উভতট হিমকূট জালে
বন্দে তরঙ্গিনি গিরিরাজবালে।
বন্দে গিরিবালে॥

---

* মায়াপুর হইতে রুড়কি পর্য্যন্ত "গ্যাঞ্জেস কনালের" সুড়ঙ্গ।

† রুড়কির নিকটে "গ্যাঞ্জেস কেনালের" চারিধারে চারিটী ভীষণ মূর্ত্তি সিংহ স্থাপিত আছে।

ব্রহ্ম ও ঈশ্বর।

ছাত্র। আপনি ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এই দুইটি কথা এক অর্থেই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু ঐ দুইটি কথার অর্থ কি একই রকম?

শিক্ষক। আজকাল ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এই দুই কথাতেই অনেকে একইরূপ অর্থ বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী এই দুটি কথায় বড় প্রভেদ আছে, এবং এই প্রভেদটি সকলের জানা আবশ্যক। এই প্রভেদটি বুঝিলে সাংখ্যকার কপিলদেবকে আর কেহ নাস্তিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। বেদান্তশাস্ত্রের 'একমেবাদ্বিতীয়ং' কথাটির একং' কথাটি যে অর্থ বুঝায়, তাহারই নাম ব্রহ্ম। সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ যে পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন নিত্য পদার্থ নাই তাঁহারই নাম ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম পদার্থটি কি ইহাই অন্বেষণ করা সকল দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই জগতে নিত্য পদার্থ এক ব্যতীত আর দুই নাই ইহাই বেদান্তের মত এবং নিত্য পদার্থের নামই ব্রহ্ম। সাংখ্যকার যাহাকে পুরুষ বলেন তিনিই ব্রহ্ম। ইনি নির্গুণ; সত্ব রজ তম এই তিন গুণের অতীত। ইনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন কিন্তু ইহাঁর আভা প্রকৃতির ক্ষেত্রে পতিত হইয়া জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য চলিতেছে। হিন্দুদর্শনশাস্ত্র সকলের মতে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহই নাই. ব্রহ্ম এবং প্রকৃতি উভয়েই অনাদি; ব্রহ্ম নিত্য পদার্থ, আর প্রকৃতি অনিত্য পদার্থ, কেননা কালের বশে প্রকৃতির অনবরত পরিবর্ত্তন হইতেছে কিন্তু ব্রহ্মের কখনও কোন পরিণাম নাই। আমি তোমাকে বিশ্বের সমষ্টি-*শক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি সেই সমষ্টি শক্তিই ব্রহ্ম। এইবারে ঈশ্বর* কথাটিতে দার্শনিকগণ কি অর্থ করেন তাহা বলি শুন। যোগী পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের নামই সেশ্বর সাংখ্য শাস্ত্র; তিনি ঈশ্বর কথাটির এইরূপ অর্থ করেন।

ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্ট পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।
স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনাবচ্ছেদাৎ॥
প্রণবস্তস্যবাচকঃ॥

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয়কর্তৃক যিনি পরামৃষ্ট হন না এরূপ পুরুষ বিশেষের নাম ঈশ্বর।

তিনি জগতের আদিগুরু, কাল কর্তৃক তাঁহার অবচ্ছেদ হয় না। প্রণব মন্ত্র সেই ঈশ্বরের বাচক।

এক্ষণে দেখ পাতঞ্জলির ঈশ্বর কথায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বুঝায় না। যিনি অজ্ঞান জীবগণের গুরু স্বরূপ, যিনি জীবের মোক্ষের পথ দেখাইয়া দেন সেই জগৎগুরুর নাম ঈশ্বর। হিন্দুদর্শনকারগণ বলেন যে অজ্ঞান হইতেই জীবের সৃষ্টি হয় এবং এই অজ্ঞান দূর হইলেই জীব তাহার প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হয়; যাঁহার আলোকে এই অজ্ঞান তিমির দূর হয় সেই সূর্য্যস্বরূপ পুরুষ বিশেষের নাম ঈশ্বর।

সাংখ্যকার কপিলদেবের সাংখ্যক শাস্ত্রকে নিরীশ্বর সাংখ্য বলে; কিন্তু কেন যে তাঁহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য বলা হয়, তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। পাতঞ্জলি ঈশ্বর কথার যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, সাংখ্যকারও ঈশ্বর কথার সেইরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন; তিনি বলেন যে সকল পুরুষ অজ্ঞানমুক্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন, যাঁহারা পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ ছিলেন কিন্তু মুক্ত হইয়া যাঁহারা একাত্মা হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে (তাঁহাদিগকে না বলিয়া তাঁহাকে বলাই যুক্তিযুক্ত হয়) ঈশ্বর নাম দেওয়া যায়। ইনি মুক্তাবস্থা-প্রাপ্ত সুতরাং ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক এবং আশয় কর্তৃক অপরামৃষ্ট; সুতরাং পাতঞ্জলি যাঁহাকে ঈশ্বর বলেন কপিলদেব ঈশ্বর কথাতে সেই অর্থই বুঝিতেন তথাপি তাঁহার শাস্ত্রকে নিরীশ্বর সাংখ্য কেন বলা হইয়াছে তাহা বলি শুন।

পাতঞ্জলি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য যে সাধন-প্রণালী দেখাইয়া দিয়াছেন ঈশ্বর প্রণিধান তাহার একটি অঙ্গ। কিন্তু কপিলদেব এই কথা বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ জন্য ঈশ্বর প্রণিধান অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। কপিলদেব বলেন যে ঈশ্বর অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণের আভা চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইলে মনুষ্য মোক্ষের পথ কি তাহা বুঝিতে পারে, চিত্ত নির্ম্মল করিতে পারিলে ঈশ্বরের আভা তাহাতে পতিত হইবেই হইবে, সুতরাং যে কোন উপায়ে হউক চিত্ত নির্ম্মল করিতে পারিলেই মুক্তির পথ দেখিতে পাওয়া যায়; ঈশ্বর প্রণিধান ব্যতীত

যে অন্য উপায়ে চিত্ত নির্ম্মল হয় না এ কথা তিনি বলেন না; যোগী পাতঞ্জলিও তাহা বলেন না বটে, তবে পাতঞ্জলির সাধন প্রণালীতে ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ প্রণবার্থ চিন্তা এবং প্রণব জপ একটি প্রধান অঙ্গ কপিলের মতানুযায়ী ঈশ্বর প্রণিধানের বেশী দরকার নাই। এই জন্যই কপিলের শাস্ত্রকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়।

আমাদের দর্শনশাস্ত্র সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবে যে প্রকৃত পক্ষে আসল কথায় সকল শাস্ত্রের মধ্যে কোন মতভেদ নাই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় করিয়াছেন।

ঈশ্বর অর্থে জগৎগুরু, আদি গুরু। যখন দেখিবে যে মোক্ষ লাভের জন্য অন্তর ব্যাকুল হইতেছে তখন জানিও যে তোমার চিত্তে ঈশ্বরের আভা পড়িবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বেদান্তশাস্ত্রানুসারে সাধক শম দম উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা সমাধান এই ষট্ গুণে ভূষিত হইলে তবে তাঁহার মুমুক্ষত্ব জন্মে। যাঁহার এই মুমুক্ষত্ব জন্মে নাই তিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী নহেন।

যে উপায় অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মায় তাহার নাম যোগ। এই যোগ আবার প্রধানতঃ দুই প্রকারের। এক অব্যক্তের উপাসনা এবং অন্যটি ঈশ্বরোপাসনা। এই দুই প্রকার উপাসনারই প্রশংসা গীতাশাস্ত্রে কথিত আছে। অধিকারী ভেদে এক প্রকার উপাসনা অন্য প্রকার উপাসনা অপেক্ষা প্রশস্ত।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে

ক্লেশোধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

যাহারা দেহাভিমান পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই তাঁহারা অব্যক্তাসক্তচেতা হইলে অধিকতর কষ্ট পান, যাহা ব্যক্ত নহে এরূপ বিষয়ে দেহাভিমানীগণের চিত্ত প্রবণতা সহজে জন্মে না, সুতরাং অব্যক্ত উপাসনা দ্বারা তাহারা দুঃখই পাইয়া থাকে। দেখ আমরা এইরূপ দেহাভিমানী লোক সুতরাং আমাদের পক্ষে অব্যক্ত উপাসনা বড় দুরূহ ব্যাপার সেই জন্য ঈশ্বর উপাসনাই আমাদের পক্ষে প্রশস্ত।

হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের মতে জগৎগুরু ঈশ্বর অব্যক্তভাবে সদাই বিরাজমান আছেন কিন্তু অব্যক্তের আভা সাধারণের চিত্তে প্রতি-বিম্বিত হয় না বলিয়া সময়ে সময়ে কোন দেহ আশ্রয় করিয়া তিনি সাধারণ জনকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কথা গীতায় বলিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধগণের এইরূপ বিশ্বাস যে ধ্যানীবুদ্ধ সময়ে সময়ে কোন মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া জীবগণের মোক্ষের পথ দেখাইয়া দেন। ঈশ্বর যখন এইরূপ কোন দেহাশ্রয়ী হন তখন তিনি ব্যক্তভাবে মনুষ্যজন সমীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলা যায়। এইরূপ ব্যক্ত ঈশ্বরের সাহায্যে মোক্ষের পথ অনুসন্ধানের নাম ব্যক্ত উপাসনা।

একটি কথা তোমাকে এইখানে বলা কর্ত্তব্য যে ঈশ্বর কোন দেহ আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত ভাব ধারণ করেন বলিয়া সেই দেহকে যেন ঈশ্বর বলিয়া বুঝিও না। শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব ইঁহারা ব্যক্তভাবাপন্ন ঈশ্বরাবতার কিন্তু যদি কৃষ্ণ-উপাসক বা বুদ্ধ উপাসক হইত চাও তবে তাঁহাদের দেহের রূপকেই যেন ঈশ্বর জ্ঞান করিও না! ঈশ্বর, দেবকীপুত্রের শরীরে অবতীর্ণ হইলেও দেবকীপুত্রের মনুষ্যরূপকে ঈশ্বরের রূপ মনে করিও না। দেবকী-পুত্রের বিশ্বব্যাপী আত্মাকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিও। এইটি শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন।

ঈশ্বরের বিশ্বরূপ অন্তরে ধারণা করিতে শিখ তবেই ঈশ্বর তোমাকে মোক্ষের পথ দেখাইয়া দিবেন, ব্রহ্ম কি পদার্থ তখন বুঝিতে পারিবে।

ঈশ্বরের বিশ্বরূপ অন্তরে ধারণা করা কথাটির অর্থ একটু স্পষ্ট করিয়া বলি শুন।

স এব পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনাবচ্ছেদাৎ।

ঈশ্বর সম্বন্ধে এই কথাটি সতত স্মরণ রাখিও, তাহার পর যে অবতারের নামে তোমার সহজেই ভক্তি আসে, তাঁহাকেই গুরু জানিয়া, জ্ঞান উপার্জ্জ-নের চেষ্টা কর ক্রমে সেই গুরুকে বিশ্বরূপ জানিয়া বিশ্বকেই গুরু স্বরূপ

দেখিতে শিখ। যত দিন না গুরুকে বিশ্বব্যাপি বলিয়া অন্তরের প্রত্যয় জন্মিবে ততদিন তোমার বিশ্বরূপ দর্শন হয় নাই জানিও।

যিনি আমাকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন, তিনিই আমার গুরু। জগতের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন; ফলে ফুলে, নদীতে সমুদ্রে, মনুষ্যদেহে মনুষ্যচিত্তে সর্ব্বত্রই আমার গুরু বিদ্যমান আছেন। গাছের ফলটি আমায় শিক্ষা দিয়া থাকে, ফুলটির নিকট হইতে ঢের শিখিতে পারি, একটি পাঁচ মাসের শিশুর নিকট হইতে কত জ্ঞান পাই, যে দিকে দেখি সেই দিকেই সকলে আমাকে জ্ঞান দান করিবার জন্য প্রবৃত্ত রহিয়াছে। এইরূপ প্রত্যয় চিত্তে জন্মিলে তবেই গুরুদেব ঈশ্বরের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। জ্ঞান লাভের প্রকৃত ইচ্ছা যদি অন্তরে জন্মিয়া থাকে তবে যে কোন পদার্থই চিত্তের অবলম্বন হউক না তাহা হইতেই সত্য তথ্য কত জানিতে পারা যায়। যখন দুই বৎসরের একটি ছেলের দিকে জ্ঞান লাভের উদ্দেশে চাহিয়া দেখি, তখন সেই দুই বৎসরের ছেলেই আমার গুরু; কেননা তীব্র জ্ঞানলালসাবশতঃ সেই ছেলের দেহেই তখন ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু সকলে তাহা দেখিতে পায় না। জ্ঞানলালসার তীব্র সংবেগ উপস্থিত হইলে আমাদের এমন একটি ইন্দ্রিয় স্ফুরিত হয় যাহার সাহায্যে জগৎগুরু ঈশ্বরকে সর্ব্ব ভূতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

একই পদার্থকে যখন যে ভাবে দেখিবে তখন উহা সেই অনুযায়ী আকার ধারণ করে। ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যখন একটি সুপক্ক ফলের দিকে দৃষ্টি কর তখন উহা তোমার ক্ষুধা শান্তির উপযোগীতা আকার ধারণ করে; আবার যখন জ্ঞান পিপাসায় কাতর হইয়া ঐ ফলের দিকে দৃষ্টি কর তখন উহাই জ্ঞান-দাতার আকার প্রাপ্ত হয়। জগতে শত্রু নাই, মিত্র নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, কেহ নাই, কেবল গুরু আছেন এই প্রত্যয় দৃঢ় করিতে চেষ্টা কর তবেই প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা করিতে শিখিবে। যদি প্রকৃত জ্ঞানলালসা জন্মিয়া থাকে তবে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে তোমার পরম শত্রু যে তোমার শত্রুতা-চরণ করিতেছে, তাহার ভিতর হইতে একজন তোমাকে জ্ঞান দান করিতেছে।

দেখ, আমার গুরুর রূপ তোমাকে বলি শুন। অব্যক্ত ব্রহ্ম আমার গুরুর আত্মা, আদিত্যলীন ঋষিগণ তাঁহার চিত্ত, এই পৃথিবীতে যে সকল

মহাত্মারা ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের গুহাভার বহন করিতেছেন তাঁহারই তাঁহার মুখ, বৃক্ষলতামনুষ্যসমাকীর্ণ ভূতল তাঁহার দেহ কর্ম্মীগণ তাঁহার হাত ইত্যাদি।

ছা। মহাশয় ঈশ্বরকে যদি বিশ্বব্যাপী বলিয়াই বুঝিতে হইবে, তবে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব ইহাদের ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মানিবার প্রয়োজন কি?

শি। শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব মোক্ষাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জগতের হিতসাধন জন্য যে সকল জ্ঞান বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, সেই জ্ঞানলাভেচ্ছায় তাঁহাদের শরণাপন্ন হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রে উপদেশ দেয়। মানুষ মরে না এটা জানিয়া রাখিও। শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধদেব স্থূল দেহ ছাড়িয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহারা আমাদের ছাড়িতে পারেন নাই। তাঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্বভূতস্থ দেখিতে শিখিয়াছিলেন, তাই স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতস্থ হইয়া আছেন। সাধারণ মানুষে মানুষকে যত ভাল বাসিতে পারে, অন্য কোন পদার্থ কিম্বা অব্যক্ত পদার্থকে তত ভাল বাসিতে পারে না; সেই জন্যই ঈশ্বর সময়ে সময়ে মনুষ্য দেহ আশ্রয় করিয়া—মোহিনী শক্তি আশ্রয় করিয়া—সাধারণের মন মুগ্ধ করিয়া মনুষ্য বিশেষের প্রতি তাঁহাদের মন আকৃষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সেই উন্নত মনুষ্যের মুখ দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণ অমৃতময়ী বাক্য সকল বাহির করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন; অবতার বিশেষের প্রতি ভক্তি সংস্থাপন করিয়া সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সুতরাং ব্যক্তভাবাপন্ন ঈশ্বরের উপাসকগণকে ঘৃণা করিও না, বরং অধিকারীভেদে এইরূপ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়া জানিও। কেন না

অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভি রবাপ্যতেঃ।

কিন্তু একটি কথা সতত স্মরণ রাখিও যে, যে অবতার বিশেষে মানুষের ভক্তি সহজেই উদয় হয়, তাঁহার মনুষ্য মূর্ত্তিকেই ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলিয়া মনে করিও না। ঈশ্বরের মূর্ত্তি বিশ্বরূপ, নিরাকার, তিনি জ্ঞান উপদেশ দিবার জন্য অবতার বিশেষের শরীর আশ্রয় করিয়াছিলেন মাত্র। আসল কথা এই যে যাঁহার চিত্তে ঐশ্বরিক আলোকের আভা নির্ম্মলভাবে প্রতিবিম্বিত হইতে পায়, তাঁহাতেই ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিতে পারা যায়।

ছা। কোন ব্যক্তির চিত্ত পূর্ণ নির্ম্মলতা পাইয়াছে এবং কোন ব্যক্তির তাহা হয় নাই ইহা কেমন করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে?

শি। ইহাত তোমায় একবার পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যিনি "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি" আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারাই চিত্ত প্রকৃত নির্ম্মলতা পাইয়াছে। যিনি

'ব্রাহ্মণ।'

আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারক।

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীযুক্ত তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

১৮০ নং অপার চিৎপুর রোড, নন্দিরাম যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। শাস্ত্র ও যথাসম্ভব যুক্তির সহিত আর্য্যধর্ম্মের তত্ত্বগুলিন ইহাতে গত দুই বৎসর হইতে বিশেষ দক্ষতার সহিত ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে। আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা পণ্ডিতগণ একথা বলিয়া থাকেন। ইহার মূল্য খুব সস্তা। ডাকমাশুল সমেত ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। যাঁহারা ধর্ম্মানুসন্ধায়ী, 'ব্রাহ্মণ' তাঁহাদের সহায়তা করিয়া থাকেন।

সীতারাম।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সীতারামের হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন করা হইল না, কেন না তাহাতে তাঁহার আর মন নাই। মনের সমস্ত ভাগ হিন্দু সাম্রাজ্য যদি অধিকৃত করিত, তবে সীতারাম তাহা পারিতেন। কিন্তু শ্রী, প্রথমে হৃদয়ের তিল পরিমিত অংশ অধিকার করিয়া, এখন হৃদয়ের প্রায় সমস্ত ভাগই ব্যাপ্ত করিয়াছে। শ্রী যদি নিকটে থাকিত, অন্তঃপুরে রাজমহিষী হইয়া বাস করিত, রাজধর্ম্মের সহায়তা করিত, তবে প্রেয়সী মহিষীর যে স্থান প্রাপ্য, সীতারামের হৃদয়ে তাহার বেশী পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু শ্রীর অদর্শনে বিপরীত ফল হইল। বিশেষ শ্রী, পরিত্যক্তা, উদাসিনী। বোধ হয় ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতেছে নয়ত কষ্টে মরিয়া গিয়াছে, এই সকল চিন্তায় সে হৃদয়ে শ্রীর প্রাপ্যস্থান বড় বাড়িয়া গিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তিল তিল করিয়া, শ্রী সীতারামের সমস্ত হৃদয় অধিকৃত করিল। হিন্দু সাম্রাজ্যের আর সেখানে স্থান নাই। সুতরাং হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপনের বড় গোল-যোগ। শ্রীর অভাবে, সীতারামের মনে আর সুখ নাই, রাজ্যে সুখ নাই, হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপনেও আর সুখ নাই। কাজেই আর হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন হয় না।

সীতারাম প্রথমাবধিই শ্রীর বহুবিধ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। মাসের পর মাস গেল, বৎসরের পর বৎসর গেল। এই কয় বৎসর সীতারাম ক্রমশঃ শ্রীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তীর্থে তীর্থে নগরে নগরে তাঁহার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই। অন্য লোকে শ্রীকে

চিনে না বলিয়া সন্ধান হইতেছে না, এই শঙ্কায় গঙ্গারামকেও কিছু দিনের জন্য রাজকর্ম্ম হইতে অবসৃত করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গঙ্গারামও বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া শেষে নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

তখন সীতারাম হিন্দু সাম্রাজ্যে জলাঞ্জলি দেওয়া স্থির করিলেন। একবার নিজে তীর্থে তীর্থে নগরে নগরে শ্রীর সন্ধান করিবেন। যদি শ্রীকে পান, ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য করিবেন; না পান সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য করিবেন। সীতারাম বিবেচনা করিলেন, "যে রাজধর্ম্ম আমি রীতিমত পালন করিতে, চিত্তের অস্থৈর্য্য বশতঃ সক্ষম হইয়া উঠিতেছি না, তাহাতে আর লিপ্ত থাকা লোকের পীড়ন মাত্র। নন্দার গর্ভজ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, নন্দা ও চন্দ্রচূড়ের হাতে রাজ্য সমর্পণ করিয়া আমি স্বয়ং সংসার ত্যাগ করিব।"

এ সকল কথা সীতারাম আপন মনেই রাখিলেন, মনের ভাব কাহারও কাছে ব্যক্ত করেন নাই। শ্রীর যে সন্ধান করিয়াছিলেন, তাহাও অতিশয় গোপনে এবং অপ্রকাশিত ভাবে। যাহারা শ্রীর সন্ধানে গিয়াছিল, তাহারা ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারে নাই, যে শ্রীকে তাঁহার আজিও মনে আছে।

কেহ কিছু জানিতে না পারুক, তাঁহার মনের যে ভাবান্তর হইয়াছে, তাহা নন্দা ও রমা উভয়েই জানিতে পারিয়াছিল। নন্দা ভাব বুঝিয়া, কায়-মনোবাক্যে ধর্ম্মতঃ মহিষীধর্ম্ম পালন করিয়া সীতারামের প্রফুল্লতা জন্মাইবার চেষ্টা করিত। অনেক সময়েই সফল হইত। কিন্তু রমা সকল সময়েই স্বামির অনাস্থা ও অন্য মন দেখিয়া ক্ষুণ্ণ ও বিমর্ষ থাকিত; সীতারামের তাহা বিশেষ অপ্রীতিকর হইত। রমা ভাবিত "আর আমাকে ভাল বাসেন না কেন?" নন্দা ভাবিত, "তিনি ভাল বাসুন না বাসুন, ঠাকুর করুন আমার যেন কোন ত্রুটি না হয়। তাহা হইলেই আমার সুখ।"

শেষে সীতারাম, ভার্য্যাদ্বয় এবং চন্দ্রচূড় প্রভৃতি অমাত্যবর্গের নিকট প্রকাশ করিলেন, যে তিনি এপর্য্যন্ত প্রকৃত রাজা হয়েন নাই, কেন না দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে সনন্দ দেন নাই। সনন্দ পাইবার অভিলাষ হইয়াছে। সেই অভিপ্রায়ে তিনি অচিরে দিল্লী যাত্রা করিবেন।

সময়টা বড় অসময়। মহম্মদপুরে সীতারামের অধিকার নির্ব্বিঘ্নে সংস্থাপিত হইয়াছিল বটে। তোরাব খাঁ, রুষ্ট হইয়াও কোন বিরোধ উপস্থিত করে নাই। তাহার একটি বিশেষ কারণ ছিল। তখন বাঙ্গালার সুবেদার বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশজ পাপিষ্ঠ মুসলমান মুরশিদ কুলি খাঁ। তখনও বাঙ্গালা দিল্লীর অধীন। তোরাব খাঁ, দিল্লীর প্রেরিত লোক, সেইখানে তাঁর মুরব্বীর জোর। সুবেদারের সঙ্গে তাঁহার বড় বনিবনাও ছিল না। এখন তিনি যদি বলে ছলে, সীতারামকে ধ্বংস করেন, তবে সুবেদার কি বলিবেন। সুবেদার বলিতে পারেন, এ বেচারা নিরপরাধী, কিস্তি কিস্তি বিনা ওজর আপত্তি খাজানা দাখিল করে, বকেয়া বাকির ঝঞ্ঝট রাখে না—ইহার উপর অত্যাচার কেন? তখন মুরশিদ কুলি খা তাঁহাকে লইয়া একটা গোলযোগ বাধাইতে পারেন। তাই, সুবেদারের অভিপ্রায় কি জানিবার জন্য তোরাব খাঁ, তাঁহার নিকট সীতারামের বৃত্তান্ত সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইলেন। মুরশিদ কুলি খাঁ—অতি শঠ। তিনি বিবেচনা করিলেন, যে এই উপলক্ষে তোরাব খাঁকে পদচ্যুত করিবেন। যদি তোরাব সীতারামকে দমন করেন, তাহা হইলে, মুরশিদ বলিবেন, নিরপরাধীকে নষ্ট করিলে কেন? যদি তোরাব তাহাকে দমন না করেন, তবে বলিবেন, বিদ্রোহী কাফেরকে দণ্ডিত করিলে না কেন? অতএব তোরাব যাহা হয় একটা করুক, তিনি কোন উত্তর দিবেন না। মুরশিদ কুলি কোন উত্তর দিলেন না, তোরাব ও কিছু করিলেন না।

কিন্তু বড় বেশী দিন এমন সুখে গেল না। কেন না, হিন্দুর হিন্দুয়ানি বড় মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল, মুসলমানের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। নিজ মহম্মদপুর উচ্চচূড় দেবালয় সকলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নিকটে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে, গৃহে গৃহে দেবালয় প্রতিষ্ঠা, দৈবোৎসব, নৃত্য গীত, হরিসংকীর্ত্তনে, দেশে সঙ্কুল হইয়া উঠিল। আবার এই সময়ে, মহাপাপিষ্ঠ মনুষ্যাধম মুরশিদ কুলি খাঁ * মুরশিদাবাদের মসনদে আরূঢ়

---

* ইংরেজ ইতিহাসবেত্তৃগণের পক্ষপাত এবং কতকটা মূর্খতা নিবন্ধন সেরাজ উদ্দৌলা ঘৃণিত, এবং মুরশিদ কুলি খাঁ প্রশংসিত। মুরশিদের তুলনায় সেরাজ উদ্দৌলা দেবতা বিশেষ ছিলেন।

থাকায়, সুবে বাঙ্গালার আর সকল প্রদেশে হিন্দুর উপর অতিশয় অত্যাচার হইতে লাগিল—বোধ হয়, ইতিহাসে তেমন অত্যাচার আর কোথাও লেখে না। মুরশিদ কুলি খাঁ শুনিলেন, সর্ব্বত্র হিন্দু ধুল্যবলুণ্ঠিত, কেবল এই খানে তাহাদের বড় প্রশ্রয়। তখন তিনি তোরাব খাঁর প্রতি আদেশ পাঠাইলেন—"সীতারামকে বিনাশ কর।"

অতএব ভূষণায় সীতারামের ধ্বংসের উদ্যোগ হইতে লাগিল। তবে উদ্যোগ কর, বলিবা মাত্র উদ্যোগটা হইয়া উঠিল না। কেন না মুরশিদ কুলি খাঁ সীতারামের বধের জন্য হুকুম পাঠাইয়াছিলেন, ফৌজ পাঠান নাই। ইহাতে তিনি তোরাবের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই, মুসলমানের পক্ষে তাঁহার অবিচার ছিল না। তখনকার সাধারণ নিয়ম এই ছিল—যে সাধারণ 'শান্তি রক্ষার' কার্য্য ফৌজদারেরা নিজ ব্যয়ে করিবেন,—বিশেষ কারণ ব্যতীত নবাবের সৈন্য ফৌজদারের সাহায্যে আসিত না। একজন জমীদারকে শাসিত করা, সাধারণ শান্তি রক্ষার কার্য্যের মধ্যে গণ্য—তাই নবাব কোন শিপাহী পাঠাইলেন না। এ দিগে ফৌজদার হিসাব করিয়া দেখিলেন, যে যখন শুনা যাইতেছে যে সীতারাম রায়, আপনার এলাকার সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগকে অস্ত্র বিদ্যা শিখাই-য়াছে, তখন ফৌজদারের যে কয় শত শিপাহী আছে, তাহা লইয়া মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে যাওয়া বিধেয় হয় না। অতএব ফৌজদারের প্রথম কার্য্য শিপাহী সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সেটা দুই একদিনে হয় না। বিশেষ তিনি পশ্চিমে মুসলমান—দেশী লোকের যুদ্ধ করিবার শক্তির উপর তাঁহার কিছু মাত্র বিশ্বাস ছিল না। অতএব মুরশিদাবাদ, বা বেহার, বা পশ্চিমা-ঞ্চল হইতে সুশিক্ষিত পাঠান আনাইতে নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ তিনি শুনিয়াছিলেন যে সীতারামও অনেক শিক্ষিত রাজপুত ও ভোজপুরী (বেহারবাসী) আপনার সৈন্যমধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। কাজেই তদুপ-যোগী সৈন্য সংগ্রহ না করিয়া সীতারামকে ধ্বংস করিবার জন্য যাত্রা করিতে পারিলেন না। তাহাতে একটু কাল বিলম্ব হইল। ততদিন যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল।

তোরাব খাঁ বড় গোপনে গোপনে এই সকল উদ্যোগ করিতেছিলেন।

সীতারাম অগ্রে যাহাতে কিছুই না জানিতে পারে, হঠাৎ গিয়া তাহার উপর ফৌজ লইয়া পড়েন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু সীতারাম, সমুদয়ই জানিতেন। চতুর চন্দ্রচূড় জানিতেন গুপ্তচর ভিন্ন রাজ্য নাই—রামচন্দ্রেরও দুর্ম্মুখ ছিল। চন্দ্রচূড়ের গুপ্তচর ভূষণার ভিতরেও ছিল। অতএব সীতারামকে রাজধানী সহিত ধ্বংস করিবার আজ্ঞা যে মুরশিদাবাদ হইতে আসিয়াছে, এবং তজ্জন্য বাছা বাছা শিপাহী সংগ্রহ হইতেছে ইহা চন্দ্রচূড় জানিলেন। সীতারামকেও জানাইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সময়েই সীতারাম দিল্লী যাওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

অসময় হইলেও তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্রচূড় তাহাতে অসম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "যুদ্ধে জয় পরাজয় ঈশ্বরের হাত। প্রাণপাত করিয়া যুদ্ধ করিলে ফৌজদারকে পরাজয় করিতে পারিবেন, ইহা না হয় ধরিয়া লইলাম। কিন্তু ফৌজদারকে পরাজয় করিলেই কি লেঠা মিটিল! ফৌজদার পরাভূত হইলে সুবাদার আছে; সুবাদার পরাভূত হইলে দিল্লীর বাদশাহ আছে। অতএব যুদ্ধটা বাধাই ভাল নহে। এমন কোন ভরসা নাই, যে আমরা মুরশিদাবাদের নবাব বা দিল্লীর বাদশাহকে পরাভূত করিতে পারিব। অতএব দিল্লীর বাদশাহের সনন্দ ইহার ব্যবস্থা। যদি দিল্লীর বাদশাহ আপনাকে এই পরগণার রাজ্য প্রদান করেন, ফৌজদার কি সুবেদার কেহই আপনার রাজ্য আক্রমণ করিবে না। হিন্দুরাজ্য স্থাপন, এক দিন বা এক পুরুষের কাজ নহে। মোগলের রাজ্য একদিনে বা এক পুরুষে স্থাপন হয় নাই। এই পত্তনে মাত্র, বাঙ্গালার সুবেদার বা দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ হইলে, সব ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতএব এখন অতি সাবধানে চলিতে হইবে। দিল্লীর সনন্দ ব্যতীত ইহার আর উপায় দেখি না, তুমি আজি দিল্লী যাত্রা কর। সেখানে কিছু খরচ পত্র করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে; কেন না এখন দিল্লীর আমীর ওমরাহ, কি বাদশাহ স্বয়ং, কিনিবার বেচিবার সামগ্রী। তোমার মত চতুর লোক অনায়াসে এ কাজ সিদ্ধ করিতে পারিবে। যদিই ইতিমধ্যে মুসলমান মহম্মদপুর আক্রমণ করে, তবে মৃন্ময় রক্ষা করিতে পারিবে, এমন ভরসা করি। মৃন্ময় যুদ্ধে অতিশয় দক্ষ, এবং সাহসী। আর কেবল তাহার বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিতে তোমাকে বলি

না। আমার এমন ভরসা আছে, যে যত দিন না তুমি ফিরিয়া আস, তত দিন আমি ফৌজদারকে স্তোক বাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে পারিব। তুমি দুই চারি মাসের জন্য আমার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পার। আমি অনেক কল কৌশল জানি।"

এই সকল বাক্যে সীতারাম সন্তুষ্ট হইয়া সেই দিনই কিছু অর্থ এবং রক্ষকবর্গ সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। নামে দিল্লী যাত্রা কিন্তু কোথায় যাইবেন, তাহা সীতারাম ভিন্ন আর কেহই জানিত না।

গমনকালে সীতারাম রাজ্য রক্ষার ভার চন্দ্রচূড়, মৃণ্ময়, ও গঙ্গারামের উপর দিয়া গেলেন। মন্ত্রণা ও কোষাগারের ভার চন্দ্রচূড়ের উপর; সৈন্যের অধিকার মৃণ্ময়কে, নগর রক্ষার ভার গঙ্গারামকে, এবং অন্তঃপুরের ভার নন্দাকে দিয়া গেলেন। কাঁদাকাটির ভয়ে সীতারাম রমাকে বলিয়া গেলেন না। সুতরাং রমা কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কান্নাকাটি একটু থামিলে রমা একটু ভাবিয়া দেখিল। তাহার বুদ্ধিতে এই উদয় হইল, যে এসময়ে সীতারাম দিল্লী গিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। যদি এ সময় মুসলমান আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলেও সীতরাম বাঁচিয়া গেলেন। অতএব রমার যেটা প্রধান ভয়, সেটা দূর হইল। রমা নিজে মরে, তাহাতে রমার তেমন কিছু আসিয়া যায় না। হয়ত, তাহারা বর্ষা দিয়া খোঁচাইয়া রমাকে মারিয়া ফেলিবে, নয়ত তরবারি দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে. নয়ত বন্দুক দিয়া গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবে. নয়ত খোঁপা ধরিয়া ছাদের উপর হইতে ফেলিয়া দিবে। তা যা করে, করুক, রমার তাতে তত ক্ষতি নাই, সীতারাম ত নির্ব্বিঘ্নে দিল্লীতে বসিয়া থাকিবেন। তা, সে একরকম ভালই হইয়াছে। তবে কিনা, রমা তাঁকে আর এখন দেখিতে পাইবে না, তা না পাইল আর জন্মে দেখিবে।

ক্বই মহম্মদপুরেওত এখন আর বড় দেখা শুনা হইত না। তা দেখা না হউক, সীতারাম ভাল থাকিলেই হইল।

যদি এক বৎসর আগে হইত, তবে এতটুকু ভাবিয়াই রমা ক্ষান্ত হইত; কিন্তু বিধাতা তার কপালে শান্তি লিখেন নাই। এক বৎসর হইল রমার একটি ছেলে হইয়াছে। সীতরাম যে আর তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না, ছেলের মুখ দেখিয়া রমা তাহা একরকম সহিতে পারিয়াছিল। রমা আগে সীতারামের ভাবনা ভাবিল—ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইল। তারপর আপনার ভাবনা ভাবিল—ভাবিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল। তার পর ছেলের ভাবনা ভাবিল—ছেলের কি হইবে? "আমি যদি মরি, আমায় যদি মারিয়া ফেলে, তবে আমার ছেলেকে কে মানুষ করিবে? তা ছেলে না হয়, দিদিকে দিয়া যাইব। কিন্তু সতীনের হাতে ছেলে দিয়া যাওয়া যায় না, সৎমায় কি সতীনপোকে যত্ন করে? ভাল কথা, আমাকেই যদি মুসলমানে মারিয়া ফেলে, তা আমার সতীনকেই কি রাখিবে? সেওত আর পীর নয়। তা, আমিও মরিব, আমার সতীনও মরিবে তা ছেলে কাকে দিয়ে যাব?"

ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ রমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল একটা ভয়ানক কথা মনে পড়িল, মুসলমানে ছেলেই কি রাখিবে? সর্ব্বনাশ! রমা এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল? মুসলমানেরা ডাকাত, চুয়াড়, গরু খায়, শত্রু—তাহারা ছেলেই কি রাখিবে? সর্ব্বনাশের কথা! কেন সীতারাম দিল্লী গেলেন! রমা এ কথা কাকে জিজ্ঞাসা করে? কিন্তু মনের মধ্যে এ সন্দেহ লইয়াওত শরীর বহা যায় না। রমা আর ভাবিতে চিন্তিতে পারিল না। অগত্যা নন্দার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে গেল।

গিয়া বলিল, "দিদি আমার বড় ভয় করিতেছে—রাজা এখন কেন দিল্লী গেলেন?"

নন্দা বলিল, 'রাজার কাজ রাজাই বুঝেন—আমরা কি বুঝিব বহিন্!,

রমা। তা এখন যদি মুসলমান আসে, তা কে পুরী রক্ষা করিবে?

নন্দা। বিধাতা করিবেন। তিনি না রাখিলে কে রাখিবে?

রমা। তা মুসলমান কি সকলকেই মারিয়া ফেলে?

নন্দা। যে শত্রু সে কি আর দয়া করে?

রমা। তা, না হয়, আমাদেরই মারিয়া ফেলিবে—ছেলেপিলের উপর দয়া করিবে না কি?

নন্দা। ও সকল কথা কেন মুখে আন, দিদি? বিধাতা যা কপালে লিখেছেন, তা অবশ্য ঘটিবে। কপালে মঙ্গল লিখিয়া থাকেন, মঙ্গলই হইবে। আমরা ত তাঁর পায়ে কোন অপরাধ করি নাই—আমাদের কেন মন্দ হইবে? কেন তুমি ভাবিয়া সারা হও। আয়, পাশা খেলিবি। তোর নথের নূতন নোলক জিতিয়া নিই আয়।

এই বলিয়া নন্দা, রমাকে অন্যমনা করিবার জন্য পাশা পাড়িল। রমা অগত্যা এক বাজি খেলিল, কিন্তু খেলায তার মন গেল না। নন্দা ইচ্ছা-পূর্ব্বক বাজি হারিল—রমার নাকের নোলক বাঁচিয়া গেল। কিন্তু রমা আর খেলিল না—এক বাজি উঠিলেই রমাও উঠিয়া গেল।

রমা, নন্দার কাছে আপন জিজ্ঞাস্য কথার উত্তর পায় নাই—তাই সে খেলিতে পারে নাই। কতক্ষণে সে আর একজনকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিবে সেই ভাবনাই ভাবিতেছিল। রমা, আপনার মহলে ফিরিয়া আসিয়াই আপনার একজন বর্ষীয়সী দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ গা—মুসলমানেরা কি ছেলে মারে?"

বর্ষীয়সী বলিল, "তারা কাকে না মারে? তারা গরু খায়, নেমাজ করে, তারা ছেলে মারে না ত কি।"

রমার বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। রমা তখন যাহাকে পাইল, তাহাকেই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল, পুরবাসিনী আবাল বৃদ্ধা সকলকেই জিজ্ঞাসা করিল। সকলেই মুসলমান ভয়ে ভীত, কেহই মুসল-মানকে ভাল চক্ষে দেখে না—সকলই প্রায় বর্ষীয়সীর মত উত্তর দিল। তখন রমা, সর্ব্বনাশ উপস্থিত মনে করিয়া, বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িয়া, ছেলে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এ দিকে তোরাব খাঁ সম্বাদ পাইলেন যে সীতারাম মহম্মদপুরে নাই, দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, এই শুভ সময়, এই সময়ে মহম্মদপুর পোড়াইয়া ছারখার করাই ভাল। তখন তিনি সসৈন্যে মহম্মদপুর যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

সে সম্বাদও মহম্মদপুরে পৌছিল। নগরে একটা ভারি হুলস্থুল পড়িয়া গেল। গৃহস্থেরা যে যেখানে পাইল পলাইতে লাগিল। কেহ মাসীর বাড়ী, কেহ পিশীর বাড়ী, কেহ খুড়ার বাড়ী, কেহ মামার বাড়ী, কেহ শ্বশুর বাড়ী, কেহ জামাই বাড়ী, কেহ বেহাই বাড়ী, বোনাই বাড়ী, সপরিবারে, ঘটি বাটি সিন্ধুক পেটারা, তক্তপোষ সমেত গিযা দাখিল হইল। দোকানদার দোকান লইয়া পলাইতে লাগিল, মহাজন গোলা বেচিয়া পলাইতে লাগিল, আড়তদার আড়ত বেচিয়া পলাইল, শিল্পকর যন্ত্র তন্ত্র মাথায় করিয়া পলাইল। বড় হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

নগররক্ষক গঙ্গারাম রায়, চন্দ্রচূড়ের নিকট মন্ত্রণার জন্য আসিলেন। বলিলেন,

"এখন ঠাকুর কি করিতে বলেন? সহরত ভাঙ্গিয়া যায়।"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ যে পলায় পলাক নিষেধ করিও না। বরং তাহাতে প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু তোরাব খাঁ আসিয়া যদি গড় ঘেরাও করে, তবে গড়ে যত খাইবার লোক কম থাকে, ততই ভাল, তা হলে দুই মাস ছয় মাস চালাইতে পারিব। কিন্তু যাহারা যুদ্ধ শিখিয়াছে, তাহাদের একজনকে যাইতে দিবে না, যে যাইবে তাহাকে গুলি করিবার হুকুম দিবে। অস্ত্র শস্ত্র একখানি সহরের বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না। আর খাবার সামগ্রী এক মুঠাও বাহিরে লইয়া যাইতে দিবে না।"

সেনাপতি মৃণ্ময় রায় আসিয়া চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন "এখানে পড়িয়া মার খাইব কেন? যদি তোরাব খাঁ আসিতেছে, তবে সৈন্য লইয়া অর্দ্ধেক পথে গিয়া তাহাকে মারিয়া আসিনা কেন?"

চন্দ্রচূড় বলিলেন, "এই প্রবলা নদীর সাহায্য কেন ছাড়িবে? যদি অৰ্দ্ধপথে তুমি হার, তবে আর আমাদের দাঁড়াইবার উপায় থাকিবে না; কিন্তু তুমি যদি এই নদীর এ পারে, কামান সাজাইয়া দাঁড়াও, কার সাধ্য এ নদী পার হয়? এ হাঁটিয়া পার হইবার নদী নয়। সংবাদ রাখ, কোথায় নদী পার হইবে। সেইখানে সৈন্য লইয়া যাও, তাহা হইলে মুসলমান এ পারে আসিতে পারিবে না। সব প্রস্তুত রাখ, কিন্তু আমায় না বলিয়া যাত্রা করিও না।"

চন্দ্রচূড় গুপ্তচরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। গুপ্তচর ফিরিলেই তিনি সম্বাদ পাইবেন, কখন কোন পথে তোরাব খাঁর সৈন্য যাত্রা করিবে। তখন ব্যবস্থা করিবেন।

এ দিগে অন্তঃপুরে সম্বাদ পৌছিল, যে তোরাব খাঁ সসৈন্যে মহম্মদপুর লুঠিতে আসিতেছে। বহির্ব্বাটীর অপেক্ষা অন্তঃপুরে সম্বাদটা কিছু বাড়িয়া যাওয়াই রীতি। বাহিরে "আসিতেছে" অর্থে বুঝিল, আসিবার উদ্যোগ করিতেছে। ভিতর মহলে "আসিতেছে" অর্থে বুঝিল, "প্রায় আসিয়া পৌছিয়াছে।" তখন সে অন্তঃপুর মধ্যে কাঁদাকাটার ভারি ধূম পড়িয়া গেল। নন্দার বড় কাজ বাড়িয়া গেল—কয়জনকে একা বুঝাইবে, কয়জনকে থামাইবে! বিশেষ রমাকে লইয়াই নন্দাকে বড় ব্যস্ত হইতে হইল—কেন না রমা ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল। নন্দা মনে মনে ভাবিতে লাগিল "সতীন মরিয়া গেলেই বাঁচি—কিন্তু প্রভু যখন আমাকে অন্তঃপুরের ভার দিয়া গিয়াছেন, তখন আমাকে আপনার প্রাণ দিয়াও সতীনকে বাঁচাইতে হইবে।" তাই নন্দা সকল কাজ ফেলিয়া রমার সেবা করিতে লাগিল।

এ দিগে পৌরস্ত্রীগণ নন্দাকে পরামর্শ দিতে লাগিল—"মা! তুমি এক কাজ কর—সকলের প্রাণ বাঁচাও। এই পুরী মুসলমানকে বিনা যুদ্ধে সমর্পণ কর—সকলের প্রাণ ভিক্ষা মাগিয়া লও। আমরা বাঙ্গালী মানুষ আমাদের লড়াই ঝগড়া কাজ কি মা! প্রাণ বাঁচিলে আবার সব হবে। সকলের প্রাণ তোমার হাতে—মা, তোমার মঙ্গল হোক—আমাদের কথা শোন।"

নন্দা, তাহাদিগকে বুঝাইলেন। বলিলেন, "ভয় কি মা! পুরুষ

মানুষের চেয়ে তোমরা কি বেশী বুঝ। তাঁরা যখন বলিতেছেন, ভয় নাই, তখন ভয় কেন? তাঁদের কি আপনার প্রাণে দরদ নাই—না আমাদের প্রাণে দরদ নাই?"

এই সকল কথার পর রমা আর বড় মূর্চ্ছা গেল না। উঠিয়া বসিল। কি কথা ভাবিয়া মনে সাহস পাইয়াছিল, তাহা পরে বলিতেছি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গারাম নগররক্ষক। এ সময়ে রাত্রে নগর পরিভ্রমণে তিনি বিশেষ মনোযোগী। যে দিনের কথা বলিলাম, সেই রাত্রে, তিনি নগরের অবস্থা জানিবার জন্য, পদব্রজে, সামান্য বেশে, গোপনে, একা নগর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে, ক্লান্ত হইয়া, তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিবার বাসনায়, গৃহাভিমুখী হইতেছিলেন, এমত সময়ে কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিল।

গঙ্গারাম পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, একজন স্ত্রীলোক। রাত্রি অন্ধকার, রাজপথে আর কেহ নাই—কেবল একাকিনী সেই স্ত্রীলোক। অন্ধকারে স্ত্রীলোকের আকার, স্ত্রীলোকের বেশ, ইহা জানা গেল—কিন্তু আর কিছুই বুঝা গেল না। গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

স্ত্রীলোক বলিল "আমি যে হই" তাতে আপনার কিছু প্রয়োজন করে না। আমাকে বরং জিজ্ঞাসা করুন, যে আমি কি চাই।"

কথার স্বরে বোধ হইল যে এই স্ত্রীলোকের বয়স বড় বেশী নয়। তবে কথা গুলা জোর জোর বটে। গঙ্গারাম বলিল "সে কথা পরে হইবে। আগে বল দেখি তুমি স্ত্রীলোক এত রাত্রে একাকিনী রাজপথে কেন বেড়াইতেছ? আজ কাল কিরূপ সময় পড়িয়াছে তাহা কি জান না?"

স্ত্রীলোক বলিল, "এত রাত্রে একাকিনী আমি এই রাজপথে, আর কিছু করিতেছি না—কেবল আপনারই সন্ধান করিতেছি।"

গঙ্গারাম। মিছা কথা। প্রথমতঃ তুমি চেনই না যে আমি কে?

স্ত্রীলোক। আমি চিনি যে আপনি গঙ্গারাম রায় মহাশয়, নগররক্ষক।

গঙ্গারাম। ভাল, চেন দেখিতেছি। কিন্তু আমাকে এখানে পাইবার সম্ভাবনা, ইহা তুমি জানিবার সম্ভাবনা নাই, কেন না আমিই জানিতাম না যে আমি এখন এ পথে আসিব।

স্ত্রীলোক। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনাকে গলিতে গলিতে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। আপনার বাড়ীতেও সন্ধান লইয়াছি।

গঙ্গারাম। কেন?

স্ত্রীলোক। সেই কথাই আপনার আগে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। আপনি একটা দুঃসাহসিক কাজ করিতে পারিবেন?

গঙ্গা। কি? ছাদের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িতে হইবে? না আগুণ খাইতে হইবে?

স্ত্রীলোক। তার অপেক্ষাও কঠিন কাজ। আমি আপনাকে যেখানে লইয়া যাইব, সেই খানে এখনই যাইতে পারিবেন?

গঙ্গা। কোথায় যাইতে হইবে?

স্ত্রীলোক। তাহা আমি আপনাকে বলিব না। আপনি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না। সাহস হয় কি?

গঙ্গা। আচ্ছা তা না বল, আর দুই একটা কথা বল। তোমার নাম কি? তুমি কে? কি কর? আমাকেই বা কি করিতে হইবে?

স্ত্রীলোক। আমার নাম মুরলা, ইহা ছাড়া আর কিছুই বলিব না। আপনি আসিতে সাহস না করেন, আসিবেন না। কিন্তু যদি এই সাহস না থাকে, তবে মুসলমানের হাত হইতে নগর রক্ষা করিবেন কি প্রকারে? আমি স্ত্রীলোক সেখানে যাইতে পারি, আপনি নগররক্ষক হইয়া সেখানে এত কথা নহিলে যাইতে পারিবেন না?

কাজেই গঙ্গারামকে মুরলার সঙ্গে যাইতে হইল। মুরলা আগে আগে চলিল, গঙ্গারাম পাছু পাছু। কিছু দূর গিয়া গঙ্গারাম দেখিলেন, সম্মুখে উচ্চ অট্টালিকা। চিনিয়া, বলিলেন,

"এ যে রাজবাড়ী যাইতেছ?"

মুরলা। তাতে দোষ কি?

গঙ্গারাম। সিংহ-দরজা দিয়া গেলে দোষ ছিল না। এ যে খিড়কী। অন্তঃপুরে যাইতে হইবে নাকি?

মুরলা। সাহস হয় না?

গঙ্গা। না—আমার সে সাহস হয় না, এ আমার প্রভুর অন্তঃপুর। বিনা হুকুমে যাইতে পারি না।

মুরলা। কার হুকুম চাই?

গঙ্গা। রাজার হুকুম।

মুরলা। তিনি ত দেশে নাই। রাণীর হুকুম হইলে চলিবে?

গঙ্গা। চলিবে।

মুরলা। আসুন, আমি রাণীর হুকুম আপনাকে শুনাইব।

গঙ্গা। কিন্তু পাহারাওয়ালা তোমাকে যাইতে দিবে?

মুরলা। দিবে।

গঙ্গা। কিন্তু আমাকে না চিনিলে ছাড়িয়া দিবে না। এ অবস্থায় পরিচয় দিবার আমার ইচ্ছা নাই।

মুরলা। পরিচয় দিবারও প্রয়োজন নাই। আমি আপনাকে লইয়া যাইতেছি।

দ্বারে প্রহরী দণ্ডায়মান। মুরলা তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"কেমন পাঁড়ে ঠাকুর দ্বার খোলা রাখিয়াছ ত?"

পাঁড়ে ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ, রাখিয়াছি। এ কে?"

প্রহরী গঙ্গারামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই কথা বলিলেন। মুরলা বলিল, "এ আমার ভাই।"

পাঁড়ে। পুরুষ মানুষের যাইবার হুকুম নাই।

মুরলা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ইঃ কার হুকুম রে? তোর আবার কার হুকুম চাই? আমার হুকুম ছাড়া তুই কার হুকুম খুঁজিস্? খ্যাংরা মেরে দাড়ি মুড়িয়ে দেব জানিস্ না?"

প্রহরী জড় সড় হইল, আর কিছু বলিল না। মুরলা গঙ্গারামকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া,

দোতালায় উঠিল। সে একটি কুঠারির ঘর দেখাইয়া দিয়া, বলিল, "ইহার ভিতর প্রবেশ করুন। আমি নিকটেই রহিলাম, কিন্তু ভিতরে যাইব না।"

গঙ্গারাম, কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কুঠারির ভিতর প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, মহামূল্য দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত গৃহ; রজত পালঙ্কে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক—উজ্জ্বল দীপাবলির স্নিগ্ধ রশ্মি তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে. সে অধোবদনে চিন্তা করিতেছে। আর কেহ নাই। গঙ্গারাম মনে করিলেন, এমন সুন্দর পৃথিবীতে আর জন্মে নাই। সে রমা।

সংসার।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিন্দুর বন্ধুগণ।

পরদিন প্রত্যূষে বিন্দু গাত্রোত্থান করিয়া ঘর দ্বার প্রাঙ্গন ঝাট দিলেন এবং গৃহের পশ্চাতের পুখুরে বাসন মাজিতেছিলেন এমন সময় বাহিরের দ্বারে কে আঘাত করিল। হেমচন্দ্র ও সুধা তখনও উঠেন নাই অতএব বিন্দু বাসন রাখিয়া শীঘ্র আসিয়া কবাট খুলিয়া দিলেন, দেখিলেন সনাতনের স্ত্রী। বিন্দু বাল্যাবস্থায় তাহাকে কৈবর্ত্ত দিদি বলিয়া ডাকিতেন, এখনও সেই নাম ভুলেন নাই। বলিলেন,

"কি কৈবর্ত্ত দিদি, এত সকালে কি মনে করে? তোর হাতে ও কি লো?"

সনাতনের পত্নী। "না কিছু নয় দিদি; মনে করনু আজ সকালে তোমাদের দেখে যাই, আর সুধা দিদি চিনি পাতা দৈ বড় ভাল বাসে তাই কাল রেতে দৈ পেতে রেখেছিনু, সুধাদিদির জন্য এনেছি। সুধা দিদি উঠেছে?"

বিন্দু। "না এখনও উঠে নাই। তা তোরা বোন্ গরিব লোক, রোজ রোজ দুদ দৈ দিস কেন বল দিকি? তোরা এত পাবি কোথা থেকে ব'ন্?

স-প। "না এ আর কি দিদি, বাড়ীর গরুর দুদ বৈত নয়, তা দু এক দিন আন্‌দুই বা। গরুও তোমাদের, আমাদের ঘর দোরও তোমাদের, তোমাদের দুটো খেয়েই আমরা আছি, তা তোমাদের জিনিষ তোমরা খাবে না ত কে খাবে?"

বিন্দু। "তা দে ব'ন, এখন শিকেয় তুলে রেখে দি, ভাত খাবার সময় ভাতের সঙ্গে খাব এখন। কৈবর্ত্ত দিদি তুই বেশ দৈ পাতিস, সুধা তোর দৈ বড় ভাল বাসে। ও কি লো? তোর চোকে জল কেন? তুই কাঁদ্‌চিস্ নাকি?"

সত্য সত্যই সনাতনের পত্নী ঝর ঝর করিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া উঁ হুঁ হুঁ করিয়া কাঁদিতে বসিয়াছিল। সনাতন অনেক কষ্ট করিয়া আপন প্রেয়সী গৃহিণীর শরীরের অনুরূপ কাপড় যোগাইতেন, কিন্তু সেই কাপড়ে অতনঙ্গী রূপসীর বিশাল অবয়ব আচ্ছাদন করিয়া তাহার আঁচলে আবার চক্ষুর জল মুছিতে কুলায় না! যাহা হউক কষ্টে চক্ষুর জল অপনীত হইল, কিন্তু সে ফোয়ারা একবার ছুটিলে থামে না, কৈবর্ত্ত রমণী আবার উচ্চতর স্বরে উঁ হুঁ হুঁ করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন।

বিন্দু। "বলি ও কি লো? কাঁদচিস্ কেন লো? সনাতন ভাল আছে ত?"

স প। "আছে বৈকি, সে মিন্‌সের আবার কবে কি হয়? উঁ, হুঁ, হুঁ।"

বিন্দু। "তোর ছেলেটি ভাল আছে ত?"

স-প। "তা তোমাদের আশীর্ব্বাদে বাছা ভাল আছে।"

বিন্দু। "তবে সুধু সুধু সকাল বেলা চখের জল ফেল্‌চিস কেন? কি হয়েছে কি?"

স-প। "এই সকালে ঘোষেদের বাড়ী গিছ্‌নু গো তা সেখানে— উঁ হুঁ হুঁ।

বিন্দু। সেখানে কি হয়েছে, কেউ কিছু বলেছে, কেউ গাল দিয়েছে?"

স-প। "না গাল দেবে কে গা দিদি? কারউ কিছু খাই না কারউ কিছু ধারি যে গাল দেবে। তেমন ঘর করিনি গো দিদি যে কেউ গাল দেবে। মিন্‌সে পোড়ামুখো হোক্, হতভাগা হোক্ গতর খেটে খায়, আমাকে খেতে পরতে দিতে পারে, আমরা গরিব গুরবো লোক কিন্তু আপনাদের মানে আছি। গাল আবার কে দেবে গা দিদি?"

বিন্দু কৃষকপত্নীর এই স্বামী-ভক্তিসূচক এবং দর্পপূর্ণ কথা শুনিয়া একটু মুচ্‌কে হাসিলেন, বলিলেন--

"তা তাইত ব'ন জিগ্‌গেস করচি, তবে তুই কাঁদচিস কেন? সনাতন কিছু বলেছে নাকি?"

রমণীর বিশাল কৃষ্ণ কলেবর একবার কম্পিত হইল, নয়ন দুটী ঘূর্ণিত হইল, ক্রোধ-কম্পিত স্বরে যে কথা গুলি উচ্চারিত হইল তাহার মধ্যে এই মাত্র বোধগম্য হইল—

"ডেক্‌রা, পোড়ামুখো, হতভাগা, সে আবার বল্‌বে! তার প্রাণের ভয় নেই? কোন্ মুখে বল্‌বে? তার ঘর কব্‌চে কে? সংসার চালিয়ে নিচ্চে কে? আমি না থাক্‌লে সে কোন্ চুলোয় যেত? বল্‌বে! প্রাণে ভয় নেই"—ইত্যাদি।

বিন্দু আর একবার হাস্য সম্বরণ করিয়া একটু তীব্র স্বরে বলিলেন,

"তবে তুই সুধু সুধু সকাল বেলা চখের জল ফেলচিস কেন বলতো? তোর হয়েছে কি?"

স-প। "না দিদি কিছু নয়, কিছু হয় নি, তবে ঘোষেদের বাড়ী আজ সকালে শুন্‌লুম, উঁ, হুঁ হুঁ।"

বিন্দু। "নে, তোর নেকরা করতে হয় কর ব'ন, আমি আর দাঁড়াতে পারি নি, আমার বাসন কোসন সব মাজতে পড়ে রয়েছে, উনুন ধরাতে হবে, এখনই ছেলে দুটী উঠ্‌লেই দুদ চাইবে।"

এইরূপ কথা হইতে হইতে সুধা প্রাতঃকালের প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় ঈষৎ রঞ্জিত বদনে, চক্ষু দুটী মুছিতে মুছিতে শয়ন ঘর হইতে আসিয়া দাঁড়াইল। বিন্দু বলিলেন—

"এই যে সুধা উঠেছে, এত সকালে যে?"

সুধা। "দিদি আজ খুব সকালেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। একটা বড় মজার স্বপ্ন দেখিলাম, সেজন্য ঘুম ভেঙ্গে গেল।"

বিন্দু। কি স্বপ্ন?"

সুধা "বোধ হোলো যেন আমরা ছেলেবেলার মত আবার শরৎ বাবুর বাড়ী পেয়ারা খেতে গিয়াছি। যেন তুমি পেড়ে পেড়ে খাচ্চ, আর শরৎ বাবু আমাকে কোলে করিয়া পেয়ারা পাড়িয়া দিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ পা ফস্‌কে পড়ে গেলেন, আমিও পড়ে গেলুম। উঃ এমনি লেগেছে।"

বিন্দু। "সে কি লো! স্বপ্নে পড়িয়া গেলে কি লাগে?"

সুধা। "হেঁ দিদি, বোধ হল যেন বড় লেগেছে, শরৎ বাবু যেন গাছতলায় সেই গর্ত্তটাতে পড়ে গেলেন।"

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, "আহা! এমন দুরবস্থা। আজ শরৎ বাবু এলে তাঁর পা'য় বেথা হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করিব এখন! পা টা ভেঙ্গে যায়নি ত?"

সুধা। "না দিদি ভেঙ্গে যায়নি।"

বিন্দু। "তুমি কেমন করে জানলে।"

সুধা। "আবার যে তখনই উঠিয়া আবার আমাকে নিয়া পেয়ারা পাড়িতে লাগ্‌লেন।"

বিন্দু উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন "সাবাস ছেলে বাবু! আজ তাঁকে তাঁহার গুণের কথা বলিব এখন।"

হাস্য সম্বরণ করিয়া পরে বলিলেন, "সুধা, কৈবর্ত্তদিদি তোমার জন্য আজ চিনিপাতা দৈ এনেছে, ভাতের সঙ্গে খাবে এখন। দৈখানা শিকেয় ঝুলিয়ে রেখে এস্ত ব'ন। আর যখন উঠেছ, ঘাটে খানকত বাসন আছে মেজে নিয়ে এসত ব'ন। আমি উনুন ধরাইগে, এখনই ছেলেরা উঠিবে।"

বালিকা মাথার কেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে দৈ লইয়া গেল, দৈ শিকের উপর তুলিয়া রাখিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে হাস্যবদনে ঘাটের দিকে ছুটিয়া গেল। বিন্দুও রান্নাঘরের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়

কৈবর্ত্তপত্নী আর একবার চক্ষুর জল অপমার্জ্জন করিয়া একবার গলা সাড়া দিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"বলি দিদিঠাকরুণ, কথাটা কি সত্তি ?"

বিন্দু। "কি কথা লো ?"

স-প। "এ যা শুন্‌লুম ?"

বিন্দু। "কি শুন্‌লি রে ?"

স-প। "তবে বুঝি সত্তি। আহা এতদিন পরে এই কি কপালে ছিল! আহা সুধাদিদির কচি মুখখানি একদিন না দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়"—এবার অবারিত ক্রন্দনের রোল উঠিল, কৈবর্ত্ত সুন্দরীর সেই বিশাল কৃষ্ণ শরীর-খানি—যাহা সনাতন সভয়ে দৃষ্টি করিতেন ও সশঙ্কচিত্তে পূজা করিতেন,—সেই শরীরখানি ক্রন্দনের বেগে কম্পিত হইতে লাগিল। গৃহে হেমচন্দ্র নিদ্রিত ছিলেন, ঈষৎ ভূমিকম্প তিনি বোধ করিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু কৈবর্ত্ত সুন্দরীর তারস্বর যখন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল তখন নিদ্রা আর অসম্ভব। তিনি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া উচ্চস্বরে কহিলেন,

"বাড়ীতে কাঁদচে কে গা ?"

এই বলিয়া হেমচন্দ্র ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। বিন্দুকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকালবেলা বাড়ীতে কাঁদচে কে গা ?"

বিন্দু। "ও কেউ নয়, কৈবর্ত্তদিদি কি অমঙ্গলের কথা শুনে এসেছে তাই মনের দুঃখে কাঁদ্‌চে ?"

হেমচন্দ্র বলিলেন " কেও সনাতনের স্ত্রী, কেন কি হয়েছে গা, বাড়ীতে কোনও অমঙ্গল হয়নি ত, কোনও ব্যারাম সেরাম হয়নি ত ?"

সনাতনের গৃহিণী বাবুকে দেখিয়া কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করিয়া, অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া, কাপড়খানি টানিয়া কষ্টে স্বষ্টে কোনও রকমে মাথায় একটু ঘোমটা দিয়া, ঢিপ্ করিয়া একটী প্রণাম করিয়া, আবার গায়ের কাপড়টা ভাল করিয়া দিয়া, আবার ঘোমটা একটু টানিয়া গলার সাড়া দিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া, আবার চক্ষুর জল মুছিয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন,

"না গো কিছু অমঙ্গল নয়, তবে একটা কথা শুনিলাম তাহা দিদি ঠাকরুণকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।"

বিন্দু। "আর সেই কথাটা কি আমি এক দণ্ড থেকে বার করতে পারলুম না! তুমি পার ত কর।"

হেম। "না মেয়ে মানুষদের কথা মেয়ে মানুষেই বুঝে, আমরা তত বুঝি না। আমি শরতের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে হেম বাড়ীর বাহিরে গেলেন।

স-প। "ঐ গো ঐ! তবে ত আমি যা শুনিয়াছি তাই ঠিক!"

বিন্দু। "বলি তোকে আজ কিছু পেয়েছে নাকি, তুই অমন করচিস কেন, আবার কান্না, কেন কি শুনেছিস বল না।"

স-প। "ঐ যে শরৎ বাবুদের বাড়ীতে আমি সকালে যা শুনুনু।"

বিন্দু। "কি শুনলি।"

স প। "তবে বলি দিদি ঠাকরুন, গরিবের কথায় রাগ করো না,। সত্যি মিথ্যে জানি নি, ঐ ঘোষেদের বাড়ীর চাকর মিনসে আমাকে বল্লে, মিনসের মুখে আগুন, সেই অবধি আমার বুকটা যেন ধড়াস ধড়াস করচে, দিদি-ঠাকরুণ একবার হাত দিয়ে দেখ।"

বিন্দু। "আমার দেখবার সময় নেই আমি কাজে যাই" বলিয়া বিন্দু রান্নাঘরের দিকে ফিরিলেন।

তখন কৈবর্ত্তবধূ বিন্দুর আঁচল ধরিয়া তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া বলিল,

"না দিদি রাগ করিও না, তোমাদের জন্য মনটা কেমন করে তাই এনু, না হলে কি অন্যের জন্যে আসতুম, তা নয়, আহা সুধাদিদিকে এক দিন না দেখলে আমার মনটা কেমন করে। (বিন্দুর পুনরায় রান্নাঘরের দিকে পদক্ষেপ।) না না বলছিনু কি, বলি ঐ ঘোষেদের বাড়ীর হতভাগা চাকর মিনসে বল্লে কি,—তার মুখে আগুন, তার বেটার মুখে আগুন, তার বৌয়ের মুখে আগুন, তার বাড়ীতে যেন ঘুঘু চরে। (বিন্দুর রান্নাঘরের দিকে এক পদ অগ্রসর হওন।) না না বলছিনু কি, সেই মিনসে বল্লে কি, উঃ এমন কথা কি মুখে আনে গা, এও কি হয় গা, তোমাদের শরীরে মায়া দয়া ও ত আছে। (বিন্দুর রান্নাঘরের ভিতর গমন, সনাতন পত্নীর পশ্চাদ্গমন ও দ্বারদেশে উপবেশন।) না না বলেছিনু কি, সেই হতভাগা চাকর মিনসে বল্লে কি না, দিদিঠাকরুণ তোমরা নাকি সকলে আমাদের ছেড়ে কলকেতায়

চলে যাচ্চ? আহা দিদিঠাকরুণ তোমাকে ছেলেবেলা মানুষ করেছি, তোমাকে আর দেখ্‌তে পাব না? সুধাদিদি আমাকে এত ভাল বাসে, সে সুধাদিদিকে কোথায় নিয়ে যাবে গা?"—রোদন।

বিন্দু একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন—"হে লা কৈবর্ত্তদিদি এই কথা বল্‌তে এই এতক্ষণ থেকে এমন করছিলি? তা কাঁদিস কেন বল, আমাদের যাওয়া কিছুই ঠিক হয় নাই, কেবল শরৎ বাবু কথায় কথায় কাল বলেছিলেন মাত্র। তা আমাদের কি যাওয়া হবে? সেখানে বিস্তর খরচ।"

স-প। "ছি! দিদি সেখানেও যায়। শুনেছি কলকেতায় গেলে জাত থাকে না, কিছু জাত বিচার নেই, হিঁদু মুচুনমানে বিচার নেই—সে দেশেও যায়। তোমাদের সোণার সংসার এখানে বসে রাজ্জি কর। শরৎ বাবুর কি বল না, ওঁর মাগ নেই ছেলে নেই, উনি কালেজে পড়েন, দিদিঠাকরুণ! কালেজের ছেলে সব কর্‌তে পারে। শুনেছি নাকি কালেজের ছেলে সাগর পার হয়ে বিলেত যায়। ওমা! তারা ত জেন্ত মানু-ষের গলায় ছুরি দিতে পারে! হেঁ দিদি, বিলেত কোথায়, সেই যে গঙ্গা সাগরের গপ্প শুনি, তারও নাকি পার যেতে হয়। শুনেছি নাকি নঙ্কায় যেতে হয়"।

বিন্দু। "হেঁ লো কত সাগর পার হয়ে তবে বিলেত যায়। শুনেছি লঙ্কা পেরিয়েও অনেকদূর যায়।"

স প। "ও বাবা, সে গঙ্গাসাগরের যে ঢেউ শুনেছি তাতে কি আর মানুষ বাঁচে? তা নঙ্কা থেকে কি আর মানুষ ফিরে আসে তারা রাক্কস হয়ে আসে, শুনেছি তারা জেন্ত মানুষের গলায় ছুরি দেয়। না বাবু, তোমাদের বিলেত গিয়েও কায নেই, কলকেতা গিয়েও কাজ নেই—তোমরা ঘরের নক্ষী ঘরে থাক। তবে এখন আমি আসি দিদি।"

বিন্দু দুধ জ্বাল দিতে দিতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন "এস ব'ন।"

স-প। আর দৈখানি কেমন হয়েছে খেয়ে বলো। আর সুধাদিদি কি বলে বলো।"

বিন্দু। "বলবো দিদি, বলবো।"

সনাতন-গৃহিনী কয়েক পা গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আর দেখ দিদি, গরিবের কথাটা যেন মনে থাকে। কোথায় কলকেত্তায় যাবে, ঘরের লক্ষ্মী ঘর আলো করে থেক।"

বিন্দু। "তা দেখা যাবে। আমাদের যাবার এখন কিছুই ঠিক নাই, যদি যাওয়া হয় তবে কয়েক মাসের জন্য, আবার ধান কাটার সময় আসিব। আমাদের গ্রাম ছাড়িয়া জমি ঘর ছাড়িয়া, কোথায় গিয়া থাকিব?"

কৈবর্ত্ত-বধূ কতক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইয়া তখন ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গেলেন। সনাতন অদ্য প্রাতঃকালে উঠিয়া বিস্তীর্ণ শয্যায় পার্শ্বশায়িনী নাই দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছিল। বিরহ-বেদনায় ব্যথিত হইয়াছিল কি অদ্য প্রাতঃকালেই মুখনাড়া খাইতে হয় নাই বলিয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিতে ছিল তাহা আমরা ঠিক জানি না। কিন্তু সেই দুঃখ বা সুখ জগতের অধিকাংশ সুখ দুঃখের ন্যায় ক্ষণকাল স্থায়ী মাত্র, প্রথম সূর্য্যালোকে গৃহিণীর বিশাল ছায়া প্রাঙ্গনে পতিত হইল, গৃহিণীর কণ্ঠস্বরে সনাতন শিহরিয়া উঠিল!

সেই দিন দ্বিপ্রহর বেলার সময় বিন্দুর প্রতিবাসিনী হরিমতি নামে একটী বৃদ্ধা গোয়ালিনী ও তাহার বিধবা পুত্রবধূ বিন্দুকে দেখিতে আসিল। হরিমতির পুত্র জীবিত থাকিতে তাহাদিগের অবস্থা ভাল ছিল, কিছু জমা জমি ছিল, বাড়িতে অনেক গুলি গাভী ছিল, তাহার দুগ্ধ বেচিয়া সচ্ছন্দে সংসার নির্ব্বাহ হইত। পুত্রের মৃত্যুর পর হরিমতি শিশু পুত্রবধূকে লইয়া সে জমা জমি দেখিতে পারিল না, অন্য কাহাকে কোরফা জমা দিল, যাহা খজনা পাইল সে অতি সামান্য। গরুগুলি একে একে বিক্রয় হইল; এক্ষণে দুই একটী আছে মাত্র, তাহার দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া উদর পূর্ত্তি হয় না। শাশুড়ী ও পুত্রবধূ সর্ব্বদাই বিন্দুর বাড়ীতে আসিত ও বিন্দুর ছেলেদের ব্যারামের সময় যথা সাধ্য সংসারের কায করিয়া দিত। বিন্দুর এরূপ অবস্থা নহে যে তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন, তথাপি বৎসরের ফসল পাইলে দরিদ্র প্রতিবাসিনীকে কিছু ধান্য পাঠাইয়া দিতেন, শীতের সময় দুই একখানি কাপড় কিনিয়া দিতেন, বৃদ্ধার অসুখ করিলে কখন সাবু, কখন মিস্রি, কখন দুই একটী সামান্য ঔষধি পাঠাইয়া দিতেন এবং সর্ব্বদা বৃদ্ধার তত্ত্ব

লইতেন। দরিদ্রা এই সামান্য উপকারে এবং সকল বিপদ আপদেই বিন্দুর স্নেহের আশ্বাস বাক্যতে অতিশয় আপ্যায়িত হইত এবং বিন্দুকে বড়ই ভাল বাসিত। বিন্দু গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইবে শুনিয়া আজ আসিয়া অনেক কান্না কাটি করিল। বিন্দু তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া, এবং তাহার পুত্রবধূকে একখানি পুরাতন সাড়ী দিয়া ঘরে পাঠাইলেন।

হরিমতি প্রস্থান করিলে তাঁতিদের একটী বৌ বিন্দুর সহিত দেখা করিতে আসিল। তাঁতি বৌ দেখিতে কাল, তাহার স্বামী তাকে ভাল বাসিত না, এবং অতিশয় কাহিল, কায কর্ম্ম করিতে পারিত না, সে জন্য শাশুড়ীর নিকট সর্ব্বদাই গালি খাইত। গত শীতকালে তাহার পিঠে বেদনা হইয়াছিল, ঘাট থেকে জল আনিতে পারিত না, তজ্জন্য তাহার শাশুড়ী প্রহার করিয়াছিল। তাঁতি বৌ কাহার কাছে যাবে, কাঁদিতে কাঁদিতে বিন্দুর কাছে আসিয়াছিল। বিন্দুর এমন অর্থ নাই যে তাঁতি বৌকে ঔষধি কিনিয়া দেন, তবে বাড়ীতে কেরোসিনের তেল ছিল, প্রত্যহ তাঁতি বৌকে রোদে বসাইয়া নিজে মালিস করিয়া দিতেন। চারি পাঁচ দিনের মধ্যে বেদনা আরাম হইয়া গেল, সেই অবধি তাঁতি বৌ গৃহ কার্য্যে অবসর পাইলেই বিন্দু মাকে দেখিতে আসিতে বড় ভাল বাসিত।

আমাদের লিখিতে লজ্জা করিতেছে, তাঁতি বৌ না যাইতে যাইতে বাউরী পাড়া হইতে হীরা বাউরিনী বিন্দুর নিকট আসিল। হীরার স্বামী পালকী বয়, বেশ রোজকার করে, কিন্তু যথাসর্ব্বস্ব মদ খাইয়া উড়াইয়া দেয়, বাড়ী আসিয়া প্রত্যহ স্ত্রীকে প্রহার করিত। বিন্দু একদিন হেমচন্দ্রকে বলিয়া হীরার স্বামীকে ডাকাইয়া বিশেষ তিরস্কার করিয়া দিলেন, সেই অবধি হেম বাবুর ভয়ে এবং বিন্দুর জেঠামহাশয়ের ভয়ে বাউরীর অত্যাচার কিছু কমিল, হীরা ও প্রাণে বাঁচিল। আজ হীরা আপন শিশুটীকে নূতন একখানি কাপড় পরাইয়া কোলে করিয়া বিন্দুর কাছে আনিয়া বলিল "মাঠাকরুণ, এবার তোমার আশীর্ব্বাদে হাতে ২।৫ টাকা জমেছে, অনেক কাল ঘরের চালে খড় পড়েনি এবার চাল নূতন করে ছাইয়াছি, আর বাছার জন্যে কাটওয়া থেকে এই নূতন কাপড় কিনেছি।" বিন্দু শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন।

তাহার পর গ্রামের শশি ঠাকরুণ, বামা সদ্‌গোপনী, শ্যামা আগুরিনী, মহামায়া গোবানী প্রভৃতি অনেকেই বিন্দুর কলিকাতায় যাইবার কথা শুনিয়া কান্নাকাটি করিতে আসিল। আমরা তাহাদের বিন্দুর নিকট রাখিয়া এক্ষণে বিদায় লই। আমাদের অনেকেরই বিন্দু অপেক্ষা দুপয়সা অধিক আয় আছে, ভরসা করি আমরা যখন একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিব, আমাদের জন্যও কেহ কেহ হৃদয়ের অভ্যন্তরে একটু শোক অনুভব করিবে। ভরসা করি যখন আমরা এ সংসার হইতে প্রস্থান করিব তখন যেন দুই একটি পরোপকারের পরিচয় দিয়া যাইতে পারিব কেবল ঈর্ষা, পরনিন্দা, এবং পরের সর্ব্বনাশ দ্বারা "বড় লোক হইয়াছি, এই আখ্যানটি রাখিয়া যাইব না।

নবম পরিচ্ছেদ।

বাল্যসহচরীগণ।

সন্ধ্যার সময় বিন্দু জেঠাইমার বাড়ীতে গেলেন, এবং অনেক দিনের পর বাল্যসহচরী কালীতারা ও উমাতারাকে দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। তিন জন বাল্যসহচরী এখন তিন সংসারের গৃহিণী হইয়াছেন কিন্তু এখনও বাল্যকালের সৌহৃদ্য একেবারে ভুলেন নাই, অনেক দিন পর তাঁহাদিগের পরস্পরে দেখা হওয়ায় তাঁহারা বাল্যকালের কথা, শ্বশুরবাড়ীর কথা, সংসারের কথা, নিজ নিজ সুখ দুঃখের অনন্ত কথা কহিয়া সন্ধ্যাকাল যাপন করিলেন।

কালীতারা বাল্যকাল হইতেই অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, বিন্দু অপেক্ষাও কালো ছিলেন, কিন্তু তথাপি এককালে তাঁহার মুখে লাবণ্য ছিল, এখনও সেই শান্ত শুষ্ক বদনে ও নয়নদ্বয়ে একটু কমনীয়তা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সে মুখখানি বড় শুষ্ক, চক্ষু দুটী বসিয়া গিয়াছে, কণ্ঠার হাড় দেখা যাইতেছে,

শীর্ণ হস্তে দুইগাছি ফাঁপা বালা আছে, কণ্ঠে একটী মাদুলি। তাঁহার বস্ত্র খানি সামান্য, সম্মুখের চুল অনেক উঠিয়া গিয়াছে, মাথায় ছোট একটী খোঁপা। কালীতারা বাল্যকালে একটু হাবা মেয়ে ছিল, এখনও অতিশয় সরলা, শ্বশুর বাড়ীর কায কর্ম্ম করিত, দুইবেলা দুইপেট খাইত, কেহ কিছু বলিলে চুপ করিয়া থাকিত।

বিন্দু বলিলেন, "কালী, আজ কত দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হইল, তোমাকে কি আর হঠাৎ চেনা যায়?"

কালী। "বিন্দুদিদি, আমাদের দেখা হবে কোথা থেকে, বে হয়ে অবধি প্রায় আমি বর্দ্ধমানে থাকি, বাপের বাড়ী কি আর আসতে পাই?"

উমা। "কেন কালীদিদি, তুমি মধ্যে মধ্যে বাপের বাড়ী আস না কেন? এই আমি ত প্রতিবার পূজার সময় আসি"।

কালী। "তা তোমাদের কি বল বন, তোমাদের ঢের লোকজন আছে, কায কর্ম্মের ঝন্ঝট নেই, পাল্কী করে চলে এলেই হল। আমাদের ত তা নয়, বিস্তর সংসার, অনেক কায কর্ম্ম আছে, আর আমাদের যে ঘর তাতে চাকর দাসী রাখা প্রথা নেই। সুতরাং আমরা কেউ আসিলে কায চল্‌বে কেমন করে বল? এই এবার এসেচি, আমার এক বড় ননদ আছে, তাকে কত মিনতি করে আমার কাযগুলি কত্তে বলে এসেছি। তা দু পাঁচ দিন সে করবে, বরাবর কি আর করে?"

বিন্দু। "তোমাদের জমিদারির শুনেছি অনেক আয়, তোমার স্বামীর অনেক গাড়ী ঘোড়া আছে, তা বাড়ীতে চাকর দাসী রাখেন না কেন?"

কালী। "না দিদি আয় জেয়দা নাই, খরচ শুনেছি বিস্তর হয়, ধারও কিছু হয়েছে শুনেছি,—তা আমি বাড়ীর ভিতর থাকি, ও সব কথা ঠিক জানিনি। আমাদের একখানা বাগান বাড়ী আছে, বাবু সেইখানেই থাকেন, তাঁর শরীরও অসুস্থ, বাড়ীতে প্রায় আসেন না, তা কায কর্ম্মের কি জানবেন্? আমার শাশুড়ীরাই কায কর্ম্ম দেখেন শুনেন। ঝি রাখবেন কেমন করে বল, আমাদের বাড়ীর ত সে রীতি নয়, বাইরের লোকেদের কি কিছু ছুঁতে আছে? সুতরাং বৌয়েদেরই সব কত্তে হয়।"

বিন্দু। "তা তোমাদের ধার টার হয়েছে বন, তা খরচ একটু কমাও

না কেন? শুনেছি তোমার স্বামী অনেক খরচ করে সাহেবদের খানা টানা দেন, অনেক গাড়ী ঘোড়া রাখেন,—তা এ সব গুলো কেন? তোমার স্বামীকে যেমন আয় তেমনি ব্যয় করতে বলতে পার না?"

কালী। "ওমা তাঁকে কি আমি সে কথা বলতে পারি? তিনি বিষয় কর্ম্ম বুঝেন, আমি বৌ মানুষ হয়ে কোন্ লজ্জায় তাঁকে এ কথা বলবো গা? তবে কখন কখন যখন আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসেন, আমার খুড়-শাশুড়ীরা তাঁকে ঐরকম কথা দুই একবার বলেছিলেন শুনিছি।"

বিন্দু। "তা তিনি কি বলেন?"

কালী। "বলেন আমাদের ভারি বংশ, দেশে কুলের যেমন মর্য্যাদা, সাহেবদের কাছে বনিয়াদি বড়মানুষ বংশ বলিয়া তেমনি মর্য্যাদা, তা সাহেব-দের খানা টানা না দিলে কি হয়? শুনেছি সাহেবরাও তাঁকে বড় ভাল বাসেন, এই যে কত "কমিটী" বলে না কি বলে, বর্দ্ধমানে যত আছে, বাবু সবেতেই আছেন। আর এই রোগা শরীর তবু গাড়ী করে প্রত্যহ সাহেবদের বাড়ী দুবেলা যাওয়া আসা আছে, সাহেব মহলে নাকি তাঁর ভারি মান।"

সরলস্বভাব কালীতারার এই স্বামী-গৌরব বর্ণনা শুনিয়া বিন্দু একটু হাসিলেন, অভিমানিনী উমা একটু ঈর্ষায় ভ্রুকুটী করিলেন।

বিন্দু। "আচ্ছা কালী, তোমাদের বাড়ীর মধ্যে এখন গিন্নী কে?"

কালী। "আমার শাশুড়ী ত নেই, সুতরাং আমার তিন জন খুড়শাশুড়ী-রাই গিন্নী। বড় যে সে ভাল মানুষ, প্রায় কোনও কথায় থাকে না, মেজই কিছু রাগী, সকলেই তাকে ভয় করে, বৌরা ত দেখলে কাঁপে। আহা সে দিন আমার খুড়তুতো ছোট জা রান্নাঘর থেকে কড়া করে দুদ আনতে পড়ে গিয়েছিল, গরম দুদে তার গায়ের ছাল চামড়া পুড়ে গিয়েছে। তাতে তার যত কষ্ট না হয়েছিল শাশুড়ির ভয়ে প্রাণ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। আমার মেজ খুড়শাশুড়ি ঘাট থেকে নেয়ে এসে যেই শুনলে যে দুদ অপচয় হ'য়েছে—অমনি মুড়ো খেঙরা নিয়ে তেড়ে এসেছিল, আহা এমনি বকুনি বকলে, বাপ মা তুলে এমনি গাল দিলে, আমার ছোট জা চোকের জলে নাকের জলে হল। আহা কচি মেয়ে দশ বছর মাত্র বয়েস, ভয়ে তিন দিন ভাল করে ভাত খেতে পারে নি।"

উমা। "তা তোমাকেও অমনি করে বকে?"

কালী। 'তা বকবে না, দোষ করলেই বকবে, তা না হলে কি সংসার চলে?'

উমা। "তোমাকে যখন বকে তুমি কি কর?"

কালী। "চুপ করে কাঁদি, আর কি করবো বল?"

অভিমানিনী উমা একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি ত তা পারিনি বাবু, কথা আমার গায়ে সহ্য হয় না।"

কালী। "তা হেঁ বিন্দুদিদি শ্বশুর বাড়ীতে কেউ গাল দিলে আর কি করবে বল? একটী কথার জবাব দিলে আর পাঁচটী কথা শুনতে হয়। তা কায কি বাবু, শাশুড়ীই হউক আর ননদই হউক, কেউ দুট কথা বলে, চুপ করে থাকি, আবার তখনই ভুলে যাই। কথাত আর গায়ে ফোটে না, কি বল বিন্দু দিদি?"

বিন্দু। "তা বেস কর বন, কথা বরদাস্ত কত্তে পারলেই ভাল, তবে সকলের কি আর বরদাস্ত হয়, তা নয়। আচ্ছা, তোমার ছোট খুড়্শাশুড়ীও শুনিছি নাকি রাগী?"

কালী। "হ্যাঁ রাগী বটে, তা মেজোর সঙ্গে ত আর পারে না, রাগ ক'রে দু একটা কথা বলে আপনার ঘরের ভিতর খিল দিয়া থাকে, মেজো এক কথায় পঁচিশ কথা শুনিয়ে দেয়। আবার মেজোর কিছু টাকা আছে কি না, সে ছেলেদের ভাল ভাল খাবার খাওয়ায়, ছেলেদের শিকিয়ে দেয় ছোটর ঘরে বোসে খেগে যা। তারা ছোটর ঘরে বোসে খায়, ছোটর ছেলেরা খেতে পায় না, ফেল ফেল করে চেয়ে থাকে। আবার ছোটর খাবার ঘরের পাশেই এবার একটা নর্দ্দমা তয়ের করেছে। ছোট কত ঝগড়া করলে, আমার ছোট দেওর আপনি বাবুর কাছে নালিশ করতে গেলেন, বাবু ও নিজে এক দিন বাড়ী আসিয়া তাঁর মেজ খুড়ীকে বুঝাইতে গেলেন, তা সে কথা কি সে শুনে? মেজোর বকুনি শুনে বাবু ফের গাড়ী করে বাগানে পালিয়া গেলেন, মেজো আপনি দাঁড়িয়ে মজুরদের দিয়ে সেই নর্দ্দামাটী করালেন তবে সে দিন রাত্রিতে জল গ্রহণ করলেন।"

উমা। "সবাস মেয়ে যা হউক।"

কালী। "বলবো কি উমা, বাড়ীতে যে ঝগড়া কোঁদল হয় তাতে ভূত ছেড়ে পালায়। তবে আমাদের সয়ে গিয়েছে, গায়ে লাগে না। আর আমি কারউ কথায় নেই, যে যা বলে চুপ করে থাকি, আবার ভুলে যাই, আমার কি বল?"

বিন্দু। "কালী, তোমার খুড়্‌শাশুড়ীরা ত সব বিধবা। তাদের বয়েস কত হয়েছে?"

কালী। "বয়েস বড় যেয়াদা নয়, বাবুর বয়স আর আমার বড় খুড়্‌শাশুড়ীর বয়স এক, মেজ আর ছোট বাবুর চেয়ে বয়সে ৫। ৭ বছরের ছোট। আমার শ্বশুর বাপের বড় ছেলে ছিলেন, তিনি আজ যদি থাকতেন তাঁর ৭০ বৎসর বয়স হত। তা তিনি হবার পর প্রায় ১৫। ১৬ বৎসর আর কেউ হয় নাই, তার পর তাঁর তিনটী ভাই হয়। তাই আমার শাশুড়ীর যখন প্রায় ৩০ বৎসর বয়স, তখন আমার খুড়শাশুড়িরা ছোট ছোট বৌ ছিল, নতুন বে হয়েছে। তারই দুই এক বছর পর বাবুর প্রথম বে হয়।"

উমা। আর কালীদিদি, তোমার পিশ্‌শাশুড়ীও ঐ বাড়ীতেই থাকে না?"

কালী। হঁ্যা থাকে বৈকি, দুই পিশ্‌শাশুড়ী, আর একজন মাশ্‌শাশুড়ী আছেন; তাঁরা তিনজনই বিধবা, তাঁদের ছেলে, মেয়ে, বৌ, নাতি সকলেই ঐ বাড়ীতে থাকে। আর একজন মামীশাশুড়ীও আছেন, তিনি সধবা, কিন্তু তাঁর স্বামী পূব দেশে পদ্মাপারে চাকরী কত্তে গিয়েছিল, সেখানে নাকি আর একটা বিয়ে করেছে না কি করেছে, তের বছর বাড়ী আসে নি, বাড়ীতে টাকাও পাঠায় না, সুতরাং মামী দুই ছেলেকে নিয়ে ঐখানেই আছেন, এই বাড়ীতেই সে ছেলেদের বে হয়, আজ তিন চার বছর হল।"

উমা। "সে ছেলে দুটী কেমন. লেখাপড়া শিখেছে?"

কালী। "ছোট ছেলেটী ভাল, ইস্কুলে লেখাপড়া করে, বড়টা লক্ষ্মী ছাড়া হয়ে গিয়েছে। বাবু সাহেবদের বোলে তাকে কি কায করে দিয়াছিলেন, তা সে আবার কতকগুলা টাকা নিয়ে পালায়। সবাই বল্লে ছেলেটাকে সাহেবরা জেলে দেবে, কিন্তু বাবু সাহেবদের অনেক বলে কয়ে ঘর থেকে লোকসান পূরণ করিয়া ছেলেটাকে রক্ষা করেন। ছেলেটা

বাড়ী থাকে না, রোজ মদ খায়, শুনেছি নাকি গাঁজাও খেতে শিখেছে, যখন বাড়ী আসে পয়সার জন্য বৌকে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেয়, বৌয়ের কান্না শুনে আমাদেরও কান্না পায়। তা বৌ পয়সা কোথা থেকে পাবে দুই একখানা গয়না টয়না বাঁধা রেখে দেয়, তা না হলে কি তার প্রাণ থাক্‌তো?"

উমা। "উঃ তবে তোমাদের মস্ত সংসার।"

কালী। "তাইত বল্‌ছিলুম উমা, তোমরা বড় মানুষের ঘরের বৌ, তিনটী জা তিনটী ঘরে থাক, শাশুড়ী রান্না বান্না দেখেন, তোমরা কাযের ঝন্‌ঝট্‌ কি বুঝ্‌বে বল? তোমার দেওর দুজন ত গ্রামেই আছেন, তোমার স্বামী না কলকেতায় গিয়েছেন?"

উমা। "হেঁ তিনি এক বৎসর হইতে কলকেতায় আছেন, আমাকেও কলকেতায় নিয়ে যাবার জন্য তাঁর মার কাছে লোক পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও বলেছেন এই জষ্টি কি আষাঢ় মাসে পাঠিয়ে দিবেন"।

কালী। "হেঁ শরৎ বল্‌ছিল তোমার স্বামী নাকি কোন্ বড় রাস্তার উপর মস্ত বাড়ী নিয়াছেন, অনেক টাকা খরচ করিয়া সাজাইয়াছেন; তাঁর নাকি সুন্দর সাদা ঘোড়ার এক জুড়ি আর কালা ঘোড়ার এক জুড়ি আছে, তেমন গাড়ী ঘোড়া রাজা রাজড়াদেরও নাই। আবার নাকি কলকেতার বাইরে বড় বাগান কিনিবার কথা চলিতেছে, সেই বাগানও নাকি ইন্দ্রপুরী, তেমন ফল, তেমন ফুল, তেমন পুকুর, তেমন মার্ব্বেলের মেজেওলা ঘর কলকেতায়ও কম আছে। উমা তুমি বড় সুখে থাকিবে"।

উমার বিম্ববিনিন্দিত সুন্দর সূক্ষ্ম ওষ্ঠে একটু হাস্য কণা দেখা গেল, উজ্জ্বল নয়ন দ্বয়ে যেন একটু ম্লান ছায়া পড়িল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "কালীদিদি, যদি সাদা জুড়ী আর কাল জুড়ী আর মার্ব্বেলের ঘর হইলে সুখ হয় তাহা হইলে আমি সুখী হইব, কিন্তু কপালের কথা কে বলিতে পারে?" সূক্ষ্মদর্শী বিন্দু দেখিলেন উমা ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ক্ষণেক সকলে মৌন হইয়া রহিলেন, তাহার পর উমা আবার বলিলেন "বিন্দুদিদি! আমাদের ছেলে বেলা এই গ্রামে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিল মনে পড়ে, সে আমাদের হাত দেখিয়াছিল মনে পড়ে"?

বিন্দু। "কৈ মনে পড়ে না"?

উমা। "সে কি দিদি, তুমি আমার চেয়ে বড় তোমার মনে পড়ে না? কালীদিদির বোধ হয় মনে পড়ে"!

কালী। "কৈ না, আমারও মনে নাই"।

উমা। "তবে বুঝি সে কথাটা আমার মনে লেগেছিল তাই আমার মনে আছে। ঠিক বার বৎসর হইল, এই বৈশাখ মাসে এক দিন এমনি সন্ধ্যার সময় এই খানে খেলা করছিলুম, একটু একটু অন্ধকার হয়েছে, আর একটু একটু চাঁদের আলো দেখা দিয়েছে, এমন সময় একজন জটাধারী সন্ন্যাসী ঐ জঙ্গলটার ভিতর হইতে বাহির হয়ে এল। আমরা ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগলুম, কিন্তু সন্ন্যাসীটা কাছে আসিয়া বলিল, "ভয় নেই তোমরা পয়সা নিয়ে এস, আমি তোমাদের হাত দেখ্‌ব"। আমি মার কাছে সেই দিন ৪টা পয়সা পেয়েছিলুম ভয়ে তা সন্ন্যাসীকে দিলুম। তখন সন্ন্যাসী খুসি হয়ে হাত দেখিয়া বল্লে "মা তুমি বড় ধনবানের পত্নী হবে গো, তুমি কিছু ভেবোনা"। তখন কালী ও হাত দেখাইবার জন্য বাড়ী থেকে একটা পয়সা এনে দিলে, সন্ন্যাসী সেটী নিয়ে বল্লে "তোমার ধন টন হবে না, ভাল বংশের বৌ হবে"।

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন "আর জটাধারী মহাশয় আমার কি ব্যবস্থা করিলেন"?

উমা। "তাই বলছি। তোমার মা ঘাটে গিয়াছিল, এবং তাঁর কাছে পয়সা টয়সা বড় থাকিত না, সুতরাং তুমি সুধু হাতে হাত দেখাতে এলে। সন্ন্যাসী রেগে গিয়ে বলিল 'মা তুমি আর কেন ওদের সঙ্গে আস্‌চ, তোমার ধন ও নেই, বংশ ও নেই, গরিবের ঘরে ঘর নিকিয়ে গরিবের ভাত খাবে, আর কি"!

বিন্দু হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ ব্যবস্থা করেছিল ত। সন্ন্যাসীর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক"!

উমা। "বিন্দু দিদি এখন তাই বল্‌ছ, তখন তা বলোনি, তখন তুমি কাঁদ্‌তে লাগিলে। তোমার মা পুখুর হইতে জল আনিয়া জিজ্ঞাসা করায় আমি সব কথা বলিলাম। তখন আঁচল দিয়ে তোমার চোখের জল

মুছিয়া বলিলেন "তা হোক বাছা, বেঁচে থাক্ বে থা হউক, চির-এইস্ত্রী হয়ে থাকিস, যেন গরিবের ঘরে ঘর নিকিয়েই সুখে থাকিস। বাছা ধন কুলে সুখ হয় না, ধন কুলে তোর কায নেই।" বিন্দুদিদির সেই কথাটা আমার কেবল মনে পড়ে, ধন বা কুল হইলেই যদি সুখ হইত তবে পৃথিবীতে আর অভাব থাকিত না"।

বিন্দু। ও কি ও উমা, তুমি ছেলেবেলা কার একটা কথা মনে করে চখের জল ফেলছ কেন? তোমার আবার সুখের অভাব কিসে উমা? তুমি যদি ভাববে, তবে আমরা কি করব"।

উমা। "না দিদি আমার কষ্ট কিছুই নাই, আমার কষ্ট আছে বলিয়া আমি দুঃখু করিতেছি না। কিন্তু জানিনি কেন এই কলিকাতায় যাব বলিয়া কয়েক দিন থেকে মনে অনেক সময় অনেক রূপ ভাবনা উদয় হয়। ভবিষ্যতেব কথা ভগবান্ই জানেন। তা বিন্দুদিদি, তুমিও কলকেতায় যাচ্চ, আর কালীদিদি বর্দ্ধমানে আছেন সেও কলকেতা থেকে শুনেছি ৩।৪ ঘণ্টার পথ; আমরা ছেলে বেলা যেমন তিন বনের মত ছিলুম যেন চির কাল সেইরূপ থাকি, আপদ বিপদের সময় যেন পরস্পরকে ভগ্নীর মত জ্ঞান করিয়া সেইরূপ ব্যবহার করি"।

উমার সহসা মনের বিকার দেখিয়া বিন্দু ও কালীর মনও একটু বিচলিত হইল, তাঁহারা আঁচল দিয়া উমার চক্ষের জল মোচন করিলেন, এবং অনেক সান্ত্বনা করিয়া রাত্রি এক প্রহরের সময় বিদায় লইয়া আপন আপন গৃহে গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় আগমন।

ইহার কয়েক দিন পর হেমচন্দ্র সপরিবারে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্ব্বদিন বিন্দু আপন পরিচিত গ্রামের সকল আত্মীয়া কুটুম্বিনী ও

বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইয়া আসিলেন। তালপুকুরে সেদিন অনেক অশ্রুজল বহিল।

যাইবার দিন অতি প্রত্যূষে বিন্দু আর একবার জেঠাইমার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। বিন্দুর জেঠাইমা বিন্দুকে সত্যই স্নেহ করিতেন, বিন্দুর গমনে প্রকৃত দুঃখিত হইয়াছিলেন। অনেক কান্নাকাটি করিলেন, বলিলেন,

"বাছা, তোরা আমার পেটের ছেলের মত, আমার উমাও যে বিন্দু সুধাও সে, আহা তোদের হাতে করে মানুষ করেছি, তোদের ছেড়ে দিতে আমার প্রাণটা কেঁদে উঠে। তা যা বাছা যা, ভগবান্ করুন, হেমের কলকেতায় একটী চাকুরি হউক, তোরা বেঁচেবর্ত্তে সুখে থাক, শুনেও প্রাণটা জুড়বে। বাছা উমা শ্বশুরবাড়ী গেছে, তাকেও নাকি কলকেতায় নিয়ে যাবে, এই জষ্টিমাসে নিয়ে যাবে বলে আমার জামাই পেড়াপিড়ি কচ্ছে। সে নাকি শুনলুম কলকেতায় নতুন বাড়ী কিনেছে, বাগান কিনেছে, গাড়ী ঘোড়া কিনেছে, ঐ ঘোষেদের বাড়ীর শরৎ সে দিন বলেছিল তেমন গাড়ী ঘোড়া নাকি সহরে নেই। তা ধনপুরের জমিদারের ঝাড় হবে না কেন বল? অমন টাকা, অমন বড়মানুষি চালচোল ত আর কোথাও নেই। ঐ ও মাসে আমি একবার বেনের বাড়ী গিয়েছিলুম, বুঝলে কিনা, তা এই নীচে থেকে আর তেতোলা পর্য্যন্ত সব বেলওয়ারীর ঝাড় টাঙ্গিয়েছে। আর নোক, জন, জিনিস পত্র সে আর কি বলব। সে দিন প্রায় পঞ্চাশজন মেয়ে খাইয়াছিল, বুঝলে কি না, তা সবাইকে রূপর থাল, রূপর রেকাবী, রূপর গেলাস, রূপর বাটী দিয়েছিল! আর আমার বেনের কথাবার্ত্তাই বা কেমন। তারা ভারি বড় মানুষ, তাদের রীতিই আলাদা। এই আমার জামাইও শুনেছি নতুন বাড়ী করে খুব সাজিয়েছে, ঝাড়, লণ্ঠন, দেলগিরি, গালচে, মকমলের চাদর, বুঝলে কিনা, আর কত সোণা, রূপ, সাদা পাথরের সামগ্রী তার গোণাগুস্তি করা যায় না। তা তোমরা চোখে দেখবে বাছা, আমি চখে দেখিনি, তবে কলকেতা থেকে একজন লোক এসেছিল সেই বল্লে যে * * * * ইত্যাদি ইত্যাদি।

"তা বেঁচে থাক বাছা, সুখে থাক, আমার উমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে, দুটি বনের মত থেকো। আহা বাছা তোদের নিয়েই আমার ঘরকন্না,

তোদের না দেখে কেমন করে থাকব।, (রোদন) তা যা বাছা, বাছা উমাও শীগ্‌গির যাবে, তার সঙ্গে দেখা করিস, না হয় তাদের বাড়ীতে গিয়েই দিন কত রইলি। তাদের ত এমন বাড়ী নয়, শুনিছি সে মস্ত বাড়ী, অনেক ঘর দরজা, বুঝলে কি না * * ইত্যাদি ইত্যাদি।”

অনেক অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া জেঠাইমার কাছে বিদায় লইয়া বিন্দু একবার শরতের মার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। শরৎ কলিকাতায় যাইয়া অবধি তাহার মাতা প্রায় একাকী বাড়ীতে থাকিতেন, শরৎ অনেক বলিয়া কহিয়া একটী ঝি রাখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু একটী বামনী রাখিবার কথায় শরতের মাতা কোনও প্রকারে সম্মত হইলেন না। বাড়ীটী প্রশস্ত, বাহির বাটীতে একটী পাকা ঘর ছিল, শরৎ কলিকাতা হইতে আসিলে সেই খানেই আপনার পুস্তকাদি রাখিতেন ও পড়াশুনা করিতেন। বাড়ীর ভিতরও দুই তিনটী পাকা ঘর ছিল আর একটী খোড়ো রান্নাঘর ছিল। তাহার পশ্চাতে একটী মধ্যমাকৃতি পুখুর, শরৎ তাহা প্রতিবৎসর পরিষ্কার করাইতেন।

শরতের মাতা গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি ও ক্ষীণ ছিলেন, বিশেষ স্বামীর মৃত্যুর পর আর শরীরের যত্ন লইতেন না, সুতরাং আরও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিলেন। কি শীতে কি গ্রীষ্মে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করিতেন, এবং একখানি নামাবলি ভিন্ন অন্য উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন না। স্নান সমাপনান্তর প্রত্যহ প্রায় এক প্রহর ধরিয়া আহ্নিক করিতেন, তাহার পর স্বহস্তে রন্ধনাদি করিতেন। স্বামীর মৃত্যুতে, ও কালীতারার কষ্টের চিন্তায় বিধবার শরীর দিন দিন শীর্ণ হইয়া আসিতেছিল এবং মাথার চুল অনেকগুলি শুক্ল হইয়াছিল, এবং অকালে বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছিল। সমস্ত দিন দেব আরাধনায় ও পরমাত্মিক চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন, এবং কালে বাছা শরৎ একজন বিদ্বান ও মাননীয় লোক হইবেন, কেবল সেই আশায় জীবনের গ্রন্থি এখনও শিথিল হয় নাই।

হেমচন্দ্র ও বিন্দু ও সুধাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, “যাও বাছা, ভগবান্ তোমাদের কল্যাণ করুন, তোমরা মানুষ হও, বাছা শরৎ মানুষ হউক, এইটী চক্ষে দেখিয়া যাই, আমার এ বয়সে আর কোনও

বাঞ্ছা নাই। দেখিস বাছা শরৎ, এদের খাওয়া দাওয়ায় কোনও কষ্ট না হয়, বিন্দুর দুটী ছেলের যেন কোনও কষ্ট না হয়, বাছা সুধা কচি মেয়ে, ওর যেন কোন কষ্ট না হয়।"

সুধার কথা কহিতে কহিতে বৃদ্ধার নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, বৃদ্ধা বৈধব্য যাতনা জানিতেন, এই জ্ঞানশূন্যা অল্পবয়স্কা বালিকাকে ভগবান্ কেন সে যন্ত্রণা দিলেন?

অন্যান্য কথা বার্ত্তার পর শরতের মাতা বিন্দু ও সুধাকে অনেক সদুপদেশ দিলেন, হেমকে কলিকাতায় যাইয়া অতি সাবধানে থাকিতে বলিলেন, শরৎকে মনোযোগ পূর্ব্বক লেখা পড়া করিতে বলিলেন। অবশেষে বৃদ্ধা সকলকে পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিলেন, সকলে বৃদ্ধার পদধূলি মাথায় লইয়া বিদায় লইলেন। শরৎও মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "মা, তোমার কথাগুলি আমি মনে রাখিব, যত্নে পালন করিব, যে দিন তোমার কথার অবাধ্য হইব সে দিন যেন আমার জীবন শেষ হয়।"

সকলে চলিয়া গেলেন, বৃদ্ধা সজলনয়নে অনেকক্ষণ অবধি সেই পথ চাহিয়া রহিলেন, শেষে শূন্য হৃদয়ে সেই পথ পানে চাহিয়া চাহিয়া শূন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। হেম বাটী আসিয়া দেখিলেন সনাতন কৈবর্ত্ত আসিয়াছে। বিন্দু গ্রাম হইতে যাইবার পূর্ব্বে আপন জমিখানি তাহাকে ভাগে দিয়াছিলেন, কৃতজ্ঞ সনাতন সজল নয়নে বাবুকে আর একবার দেখিতে আসিয়াছিল। সনাতনের সঙ্গে সনাতনের পত্নীও আসিয়াছিল, সে আর একখানি চিনি পাতা দৈ আনিয়াছিল। বিন্দু অনেক বারণ করিল, কিন্তু কৈবর্ত্ত পত্নী তাহা শুনিল না, বলিল গাড়ীতে যদি জেয়গা না হয় আমি হাতে করে বর্দ্ধমানে ষ্টেশন পর্য্যন্ত দিয়া আসিব। সুতরাং সুধা গাড়ীতে চাপিয়া সেই দৈ কোলে করিয়া লইল। গাড়ীর ভিতর বিন্দু ও সুধা দুই ছেলেকে নিয়া উঠিলেন, শরৎ ও হেম হাঁটিয়া যাইতেই পছন্দ করিলেন। গরুর গাড়ী বড় আস্তে আস্তে যায়, প্রাতঃকালে গ্রাম ত্যাগ করিয়াও বেলা দুই প্রহরের সময় বর্দ্ধমানে পঁহুছিল।

ষ্টেশনের নিকট একটী দোকানে গিয়া সকলে উঠিলেন, এবং তথায় রাঁধা বাড়া করিয়া শীঘ্র শীঘ্র খাওয়া দাওয়া করিয়া লইলেন। বর্দ্ধমানের ষ্টেশনের কাছে কাছে বড় সুন্দর থাজা ও সীতাভোগ পাওয়া যায়, শরৎ

বাবু তাহার কিছু কিছু সংগ্রহ করিলেন, এবং তাহা দিয়া ক্ষুধা শেষবার তালপুকুরের চিনিপাতা দৈ খাইয়া লইলেন।

বেলা দুইটার পর গাড়ী ছাড়ে, দুইটা না বাজিতে বাজিতে ষ্টেশন লোকে পূর্ণ হইল। হেম অনেক দিন রেলওয়ে ষ্টেশনে আসেন নাই, অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত সেই লোকের সমাগম দেখিতে লাগিলেন। নানা দেশ হইতে নানা উদ্দেশ্যে নানা প্রকার লোক ষ্টেশনে জড় হইতেছে, দেখিয়া হেমের মনে একটী অচিন্তনীয় ভাব উদয় হইল। দূর মাড়ওয়ার ও বিকানীর প্রদেশ হইতে বড় বড় গাঁঠরী লইয়া বণিকগণ কলিকাতায় বাণিজ্যার্থে আসিতেছে; ইহারাই ভারতবর্ষের প্রকৃত বণিকসম্প্রদায়, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই এই অল্পব্যয়ী, বহুকষ্টসহ, বহুপথগামী, কঠোরজীবী জাতির সমাগম ও বাণিজ্য আছে। আরা প্রভৃতি জেলা হইতে সবলশরীর বহুশ্রমী কিন্তু দরিদ্র বিহারীগণ চাকুরির জন্য কলিকাতাভিমুখে গমন করিতেছে। কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ হইতে বাঙ্গালী নারী পুত্র বন্ধুদিগের সহিত বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন; বাঙ্গালী নারী সহজে দুর্ব্বলা ও গৃহপ্রিয়, তীর্থ করাই তাঁহাদিগের দেশ ভ্রমণের একমাত্র উপায়, তীর্থ করিবার জন্য তাঁহারা কষ্ট তুচ্ছ করিয়া মথুরা বৃন্দাবন ও পুষ্কর তীর্থ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আইসেন। বালকগণ ছুটীর পর পুনরায় কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে আসিতেছে, যুবকগণ নানা স্বপ্নসম আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য বা উচ্চাভিলাষে আকৃষ্ট হইয়া সেই মহানগরীর দিকে আসিতেছেন। আশা তাহাদিগের সম্মুখে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিতেছে, যুবকগণ সেই কুহকে ভুলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছেন। কলিকাতাবাসী কেহ কেহ বিদেশ হইতে চাকুরি করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, অনেক দিন পর পুত্রকলত্রের মুখ দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করিবেন। কেহ বা প্রণয়িণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, কেহ বা মুমূর্ষু আত্মীয় বন্ধুকে একবার দেখিবার জন্য, কেহ ধন মান, পদ বা যশঃ লিপ্সায়, কেহ বা জীবনের সায়াহ্নে কেবল গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য, সকলেই নানা উদ্দেশ্যে এই বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রের দিকে ধাবমান হইতেছে। এই রাজধানী কর্ম্মদেবীর একটী প্রধান মন্দির, হেমচন্দ্র সেই মন্দির আগমন পথে অসংখ্য যাত্রী দেখিতে লাগিলেন।

দুইটার পর গাড়ী ছাড়িল, পাঁচটার পর গাড়ী কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিল। শরৎ একখানি গাড়ী করিলেন, এবং সকলেই গাড়ীতে উঠিয়া ভবানীপুর শরতের বাটী অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

হুগলীর পোলের উপর হইতে বিন্দু বিশাল গঙ্গাবক্ষে গৃহতুল্য অসংখ্য অর্ণবপোত ও তাহার মাস্তুলের অরণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং অপর পার্শ্বে কলিকাতার ঘাট ও হর্ম্ম্যাদি দেখিয়া পুলকিত হইলেন। গাড়ী বড়বাজার ও চিনাবাজারের ভিতর দিয়া চলিল, তথায় শরতের কিছু কাপড় চোপড় কিনিতে ছিল তাহাতে কিছু বিলম্ব হইল। বিন্দু ও সুধা কখনও তালপুখুর হইতে বাহিরে যান নাই, ভারতবর্ষের মধ্যে এই প্রধান জনাকীর্ণ স্থান দেখিয়া তাঁহারা অধিকতর বিস্মিত হইলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে দোকান, কোন কোন স্থানে সরু সরু গলীর উভয় পার্শ্বে দ্বিতল বা তিনতল দোকানে পথ প্রায় অধিকার করিয়াছে। কত দেশের কত প্রকার বস্ত্রাদি রাশি রাশি হইয়া সজ্জিত রহিয়াছে, বিলাতি থান, দেশী কাপড়, বারাণসী সাটী, বম্বের কাপড়, মসলী-পত্তনের ছিট, ফ্রান্সের সাটীন বস্ত্রাদি, ইউরোপের নানা স্থানের গালিচা চাদর ছিট, পরদা ও সহস্র প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কাপড়। মণিমুক্তার দোকানে মণিমুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে, খেলানার দোকানে রাশি রাশি খেলানা, সারি সারি খাবারের দোকানে এখনও মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইতেছে, পুস্তকের দোকানে পুস্তক শ্রেণী। শিল, যাহা একখানা কিনিলে গৃহস্থের তিনপুরুষ যায়, তাহাই বিন্দু রাশি রাশি দেখিলেন, লোহার কড়া বেড়ী ঝাঁঝরি প্রভৃতি দ্রব্যতে দোকান পরিপূর্ণ, পিত্তল ও কাঁসার দ্রব্যে কোথাও চক্ষু ঝলসাইয়া যাইতেছে। কাঁচের দোকানে ঝাড়, লণ্ঠন, পাত্র, গেলাস, খেলানা, লেম্প প্রভৃতি সুন্দর-রূপে সজ্জিত রহিয়াছে, কাষ্ঠদ্রব্যের দোকানে ছুতারগণ দ্রব্যাদি পালিস করি-তেছে, ছবির দোকানে কড়িকাট ও দেয়াল ছবিপূর্ণ, বাক্সের দোকানে কাঠের বাক্স, টিনের বাক্স, চামড়ার বাক্স, লোহার বাক্স, কত প্রকার দোকানে বিন্দু ও সুধা কত প্রকার দ্রব্য দেখিলেন তাহা সংখ্যা করিতে পারিলেন না। লোক জনাকীর্ণ, গাড়ীর ভিড়ে গাড়ী চলিতে পারে না, মনুষ্যের ভিড়ে মনুষ্য অগ্র পশ্চাৎ দেখিতে পায় না, চারি দিকে লোকের শব্দ, গাড়ীর শব্দ,

খরিদারদিগের কথা, বিক্রেতাদিগের চিৎকার ধ্বনি! বিন্দু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন একি বিশাল মনুষ্য সমুদ্র! এত লোক কি করে, কোথা হইতে আইসে, এত দ্রব্য কে ক্রয় করে, কোথায় চলিয়া যায়। অদ্য তালপুখুর হইতে দরিদ্র বিন্দু এই মনুষ্য-সমুদ্রে বিলীন হইতে আসিয়াছেন, এ মহা-নগরীর কোনও নিভৃত স্থানে কি বিন্দু স্থান পাইবেন?

সন্ধ্যার সময় বিন্দুর গাড়ী চিনাবাজার হইতে বাহির হইয়া লালদিঘির নিকট গিয়া পড়িল, তথায় যাইবার সময় তিনি প্রাসাদ তুল্য ইংরাজী দোকান দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এই সকল দোকান কাপড়-ওয়ালার দোকান বা জুতাওয়ালার দোকান শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। জুতাওয়ালা ও কাপড়ওয়ালা এক্ষণে ভারত-সমাজের নিয়ন্তর, জুতাওয়ালা ও কাপড়ওয়ালাই ইংলণ্ডের গৌরব স্বরূপ, ইংলণ্ডের রাজ্যবিস্তারের প্রধান হেতু!

বিস্মিত নয়নে সুধা ও বিন্দু লাট সাহেবের বাড়ী দেখিতে দেখিতে গড়ের মাঠে বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হইয়া আসি-য়াছে, ইন্দ্রপুরী তুল্য চৌরঙ্গিতে দীপালোক প্রজ্জলিত হইয়াছে, এক্ষণ মর্ত্ত্যে যাঁহারা দেবত্ব করিতেছেন, তাঁহারা বরুশ, ফেটন বা লেণ্ডনেট করিয়া ইডন গার্ডেনে সমাগত হইতেছে। ঐ প্রসিদ্ধ উদ্যান হইতে অপূর্ব্ব বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইতেছে, এবং আকাশের বিদ্যুৎ মনুষ্যের বিজ্ঞান-ক্ষমতার অধীন হইয়া নর নারীর রঞ্জনার্থ আলোক বিতরণ করিতেছে! ভারতবর্ষের আধুনিক অধীশ্বরদিগের গৌরব ও ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও বিলাস দেখিয়া তাল-পুখুরনিবাসিনী দরিদ্রা বিন্দু বিস্মিত হইলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। দিনের পরিশ্রম বশতঃ সুধা হেমের বক্ষে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বিন্দুও পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, ছোট সুপ্ত শিশুটীকে ক্রোড়ে করিয়া তিনিও চক্ষু মুদিত করিয়াছিলেন। শরৎ বড় শিশুকে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন, হেমচন্দ্র সুধার মস্তকটী ধারণ করিয়া নিস্তব্ধে পথ ও হর্ম্ম্যাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে হেমের অন্তঃকরণে চিন্তা আবির্ভূত হইতে লাগিল। তাঁহার উদ্দেশ্য কি সফল হইবে? ভবিষ্যতে কি আছে? শান্ত নিস্তব্ধ তালপুখুর ত্যাগ করিয়া তিনি অদ্য এই মহানগরীতে আসিলেন,—এই সদাচঞ্চল মনুষ্য সমুদ্রের কোনও নিভৃত কন্দরে কি তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান আছে?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার বড় বাজার।

বিন্দু। "ও সুধা, সুধা, একবার এদিকে এসত বন।"

সুধা। "কি দিদি, আমাকে ডাক্‌ছ?

বিন্দু। "হেঁ বন, ঐ কাপড় কখানা কেচে রেখেছি, ছাতের উপর শুকুতে দাও ত। আমি কুয়ো থেকে দু কলসী জল তুলে শিগ্‌গির নেয়ে নি; রোদ উঠেছে, এখনি গয়লানী দুদ আনবে, উনুন ধরাতে হবে। কলকেতার কুয়োর জলে নাইতে সুখ হয় না, এর চেয়ে আমাদের পাড়াগেঁয়ে পুখুর ভাল, বেশ নেবে স্নান করা যায়। আর কুয়োর জলে কেমন একটা গন্ধ।"

সুধা হাসিয়া বলিল "তোমার বুঝি কলকেতার সবই খারাব লাগে? কেন কল্‌কেতার কলের জল কেমন সুন্দর। ঝি খাবার জন্যে এক কলসী ক'রে আনে, সে যেন কাগের চক্ষু, আর কেমন মিষ্টি।"

বিন্দু। "নে বন, তোর কলকেতার সুখ্যেত আর শুনতে পারি নি।"

সুধা। "কেন দিদি, তুমি মন্দ কি দেখ্‌লে বল। কত বড় সহর, কত বাজার, দোকান, ঘর, গাড়ী, ঘোড়া, লোক, জন, এমন কি আমাদের তাল-পুখুরে আছে? এমন দোতলা বাড়ী কি আমাদের তালপুখুরে আছে?"

বিন্দু। "তা না থাকুক বন, আমাদের তালপুখুরের সোণার বাড়ী। চার দিকে নড়বার চড়বার জায়গা আছে, একটু বাতাস আসে, একটু রোদ আসে, দুটা লাউ গাছ আছে, দুটা আঁব গাছ আছে, এখানে কি আছে বল তো? গাড়ী ঘোড়া যাদের আছে তাদের আছে, আর দোতলা পাকা বাড়ী নিয়ে কি ধুয়ে খাব? ঘরে বাতাস আসে না, ছোট অন্ধকার উঠানে রোদ আসে না, পাড়ার লোকের বাড়ী দেখা করতে যাবার যো নেই, পাল্কী না হলে বাড়ীর বাইরে যাবার যো নেই,—ও মা এ কি গো? যেন পিঁজ-রের ভিতর পাখী রেখেছে!"

সুধা। "কেন দিদি, সে দিন আমরা গাড়ী করে কত বেড়িয়ে এলুম, চিড়িয়াখানায় বাগ সিংগি দেখে এলুম, গাড়ী করে বেরুলেই কত কি দেখতে পাই।"

বিন্দু। "না বাবু, আমার গাড়ী করে বেড়াতে ভাল লাগে না। আমাদের তালপুখুর সোণার তালপুখুর, সকালবেলা পুখুরের ঘাটে নেয়ে আসতুম, সেই ভাল। আর সব লোককে চিনতুম, সবার বাড়ী যেতুম, সবাই কত আমাদের ভাল বাসত। এখানে কে কাকে চেনে বল?"

সুধা। "তা দিদি এক দিনেই কি চিনবে, থাকতে ২ সকলকে চিনবে। ঐ সে দিন দেবীপ্রসন্ন বাবুদের বাড়ী থেকে ঝি এসেছিল, আমাদের খেতে বলেছে। আর চন্দ্রনাথ বাবু আমাদের কাল কত খাবার দাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

বিন্দু। "তা আলাপ হবে বৈকি বন, যত দিন থাকব, লোকের সঙ্গে চেনাশুনা হবে। তবে কি জান সুধা, তাঁরা হলেন বড় লোক, আমরা গরিব মানুষ, তাঁদের সঙ্গে কি ততটা মেশা যায়, তা নয়; তাঁরা আমাদের সঙ্গে দুটো কথা কন, এই তাঁদের অনুগ্রহ। তা কলকেতায় যখন এসেছি তখন দুজন চার জনের সঙ্গে কি চেনা শুনা হবে না, তা হবে বৈকি।"

সুধা। "আর শরৎ বাবু রোজ সন্ধ্যার সময় ত আমাদের বাড়ীতে আসেন, কত গল্প করেন, কত লোকের কত কথা কন, কত বইয়ের কথা বলেন,—দিদি, সে গপ্প শুনতে আমার বড় ভাল লাগে।"

বিন্দু। "আহা শরতের মত কি ছেলে আজ কাল আর দেখা যায়? তার একজামিনের জন্যে সমস্ত দিন পড়াশুনা করতে হয়, তবু প্রত্যহ আমরা কেমন আছি জিগ্‌গেস কর্‌তে আসেন, পাছে কলকেতায় এসে আমাদের মন কেমন করে তাই রোজ সন্ধ্যার সময় এখানে আসেন। যত দিন তাঁর বাড়ীতে ছিলুম তত দিন ত তাঁর পড়াশুনা ঘুরে গিয়েছিল, কিসে আমরা ভাল থাকি সেই চেষ্টায় ফিরিতেন। তাঁর টাকার জাঁক নেই, লেখাপড়ার জাঁক নাই, আর শরীরে কত মায়া দয়া। তাঁর মত ছেলে কি আর আছে?"

সুধা। "দিদি, ঐ বুঝি গয়লানী আসচে!"

বিন্দু। "কি লো, আজ একটু ভাল দুদ এনেছিস, না কালকের মত জল দেওযা দুদ এনেছিস? তোদের কলকেতায় বাছা কলের জলের ত অভাব নেই, তোদের দুদের ও অভাব নেই, রংটা রাখতে পরলেই হল!"

গোয়ালিনী। "না মা, তোমাদের বাড়ীতে কি সে রকম দুদ দিলে চলে, এই দেখ না কেন? তোমরা ত খেলেই ভাল মন্দ বুঝতে পারবে।"

বিন্দু। "দেখিছি বাছা দেখিছি; আহা তালপুখুরে আমরা তিন পো, একসের করে দুদ পেতুম, তাই ছেলেরা খেয়ে উঠতে পারত না। তুই বাছা পাঁচ পো করে দুদ দিস তা খেয়ে ছেলেদের পেট ভরে না। আর কড়ায় যখন দুদ ঢালি, সে দুদ ত নয় যেন জল ঢালছি।"

গো। "তা পড়াগাঁয়ে যেমন দুদ পেতে মা, এখানে কি তেমন পাবে। সেখানে গরু চরে খায়, থাকে ভাল, দুদ দেয় ভাল। আমাদের বাঁদা গরু কি তেমন দুদ দেয়?"

বিন্দু। 'আর কাল যে একটু দৈ আনতে বলেছিলুম, তা এনেছিস?"

গো। "হেঁ এই যে এনেছি"

বিন্দু। "ও মা! ঐ চার পয়সার দৈ?"

গো। তা, হেঁ গা, চার পয়সার দৈ আর কত হবে গা। ঐ তোমার ঝিকে বল না বাজার থেকে একখানা কিনে আনতে, যদি এর চেয়ে বড় আনে তবে দাম দিও না। হে মা, তোমাদের পিত্তেশে আমরা আছি, তোমাদের কি আমি ঠকাব গা?"

বিন্দু। "ওলো সুধা, এই দেখ লো, তোর সোণার কলকেতার চার পয়সার দৈ দেখ! একটু জল মেখে খাস বন, তা না হলে ভাতে মাখতে কুলোবে না! কে ও ঝি এসেছিস।"

ঝি। "কেন গা?"

বিন্দু। "বাছা, আজ একটু সকাল সকাল বাজার যাস ত। আজ বাবু দশটার সময় বেরবেন বলেছেন, সকাল সকাল বাজার করে আসিস ত। তুই কি মাছ নিয়ে আসিস তার ঠিক নেই। হেঁ লা বড় বড় কৈ মাছ বাজারে পাওয়া যায় না?"

ঝি। "তা পাওয়া যাবেনা কেন মা, তবে যে দর সে কি ছোঁয়া যায়? বড় বড় কৈ এক একটা দুপয়সা, তিন পয়সা, চার পয়সা চায়"।

বিন্দু। "বলিস্ কিরে? কলকেতায় নোক কি খায় দায় না, কেবল গাড়ী ঘোড়া চড়ে বেড়ায়"?

ঝি। "তা খাবে না কেন মা, যে যেমন খরচ করে সে তেমনি খায়। আমাদের দিন চার পয়সার মাছ আসে তাতে দুবেলা হয়, তাতে কি ভাল মাছ পাওয়া যায়"?

বিন্দু। "আচ্ছা মাগুর মাছ"?

ঝি। "ওমা মাগুর মাছের কথাটি কইও না, একটি বড় মাগুর মাছের দাম চার পয়সা, ছ পয়সা, আট পয়সা। বলব কি মা, কলকেতার বাজার যেন আগুন। আমরাও মা পাড়াগাঁয়ে ঘর করেছি, হাটে মাছ কিনে খেয়েছি, তা কলকেতায় কি তেমনি পাই? কলকেতায় কি আমাদের মত গরিব নোকের থাকবার যো আছে মা,—এই তোমরা দুবেলা দুপেট খেতে দিচ্ছ তাই তোমাদের হিল্লতে আছি, নৈলে কলকেতায় কি আমরা থাকতে পারি"?

বিন্দু। "তা নে বাছা, যা ভাল পাস নিয়াসিস, টেংরা মাছ হয়, পার্শে মাছ হয়, দেখে শুনে ভাল দেখে আনিস। আর এক পয়সার ছোট ছোট মৌরলা মাছ আনিস একটু অম্বল রেঁদে দিব। বাবুকে যে কি দিয়ে ভাত দি তাই ভেবে ঠিক পাইনি। আর দেখ্, সাগ যদি ভাল পাওয়া যায় ত এক পয়সার আনিস ত, নটে সাগ হয়, কি পালম সাগ হয়, না হয় নাউ সাগ হয় ত আরও ভাল। আহা তালপুকুরে আমাদের নাউ সাগের ভাবনা ছিল না, বাড়ীতে যে নাউ সাগ হত তা খেয়ে উঠতে পারতুম না। আলুগুন বড় মাগ্‌গি, আলু জেয়দা আনিস নি, বেগুন হয়, উচ্ছে কি ঝিঙ্গে হয়, কি আর কিছু ভাল তরকারি যা দেখবি নিয়ে আসিস। আর থোড় পাসত নিয়ে আসিসত, একটু ছেঁচকি করে দিব, না হয় মোচা নিয়ে আসিস, একটু ঘন্ট রেঁদে দিব। হা কপাল! থোড়, মোচা আবার পয়সা দিয়ে কিনতে হয়!"

স্নান সমাপন করিয়া গয়লানীকে বিদায় করিয়া ঝিকে পয়সা দিয়া বিন্দু রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং উনান জ্বালাইয়া দুদ জ্বাল দিয়া উপরে

লইয়া গেলেন। ছেলে দুটী উঠিয়াছে, তাহাদের দুধ খাওয়াইয়া বিছানা মাদুর তুলিলেন এবং ঘর পরিষ্কার করিলেন। একটু বেলা হইলে দাসী বাজার হইতে মাছ তরকারি আনিল, তখন বিন্দু ঝির নিকট ছেলে দুটীকে রাখিয়া পুনরায় রন্ধন ঘরে প্রবেশ করিলেন। বাটীতে একটী দাসী ভিন্ন আর লোক ছিল না, রন্ধন কার্য্য দুই ভগিনীই নির্ব্বাহ করিতেন। সুধা নূতন বাড়ীতে আসিয়া ভাঁড়ারী হয়েছেন, বড় অহ্লাদের সহিত ভাঁড়ার হইতে নুন তেল মসলা বাহির করিলেন, চাল ধুয়ে দিলেন, তরকারি কুটলেন, মাছ কুটলেন, এবং আবশ্যকীয় বাটনা বাটিয়া দিলেন। বিন্দু শীঘ্র রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

পাঠক বুঝিয়াছেন যে হেমচন্দ্র কয়েক দিন শরতের বাটীতে থাকিয়া ভবানীপুরে একটী ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটী ভাড়া করিয়াছিলেন। শরৎ এ অপব্যয়ের বিরুদ্ধে অনেক তর্ক করিলেন, আপন বাটীতে হেমকে রাখিবার জন্য অনেক স্তুতি মিনতি করিলেন, কিন্তু তাহাতে শরতের পড়ার হানি হইবে বলিয়া হেমচন্দ্র তথায় কোনও প্রকারে রহিলেন না। শরৎ অগত্যা অনুসন্ধান করিয়া মাসে ১১টাকা ভাড়ার একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন।

ভবানীপুরে শরৎ বাবু অনেক দিন ছিলেন, তাঁহার সহিত অনেকের সঙ্গে আলাপ ছিল, হেমচন্দ্র ও তাঁহাদিগের পরিচিত হইলেন। কেহ হাইকোর্টে ওকালতি করেন, কেহ বড় হৌসের বড় বাবু, কাহার ও বনিয়াদি বিষয় আছে, কাহারও বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ, কিন্তু গাড়ী ঘোড়ার আড়ম্বর আছে। কেহ নবাগত শিষ্টাচারী সদ্বংশজাত হেমচন্দ্রের সহিত প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিলেন, কেহ বা ঝাড় লাণ্ঠান-পরিশোভিত জনাকীর্ণ বৈটক্ খানায় দরিদ্রকে আসিতে দিয়া এবং দুই একটী সগর্ব্ব কথা কহিয়া ভদ্রাচরণ বজায় রাখিলেন, এবং নিজ বড়মানুষি প্রকটিত করিলেন। কেহ হেমচন্দ্রের কথাবার্ত্তা ও সদাচারে তুষ্ট হইয়া শরতের সহিত হেমকে দুই একদিন আহারে নিমন্ত্রণ করিলেন, কেহ বা নব্য সভ্যতার সুন্দর নিয়মানুসারে হেমচন্দ্রর "একোয়েণ্টান্স করন" করিতে "ভেরি হাপি" হইলেন। কোন বিষয় কর্ম্মে ব্যস্ত বড় লোকের কার্পেট মণ্ডিত ঘরে হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও সাক্ষাত-

মৃত লাভ করিতে পারিলেন না, অন্য কোন বড় লোক, তিনিও বিষয় কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত, জুড়ী করিয়া বাহির হইবার সময় ব্রুহমের জানলার ভিতর হইতে সহাস্য মুখচন্দ্র বাহির করিয়া সানুগ্রহ বচনে জানাইলেন যে হেমবাবু কলিকাতায় আসিয়া ভবানীপুরে আছেন শুনিয়া. তিনি (উপরিউক্ত বড় লোক) বড় সুখী হইয়াছেন, অদ্য তিনি (উপরি উক্ত বড় লোক) বড় "বিজি," কিন্তু তিনি "হোপ" করেন শীঘ্র এক দিন বিশেষ আলাপ সালাপ হইবে। আর যদি হেম বাবু তাঁহার (উপরি উক্ত বড় লোকের) বাগান দেখিতে মানস করেন তবে শনিবার অপরাহ্ণে আসিতে পারেন, সেখানে বড় "পার্টি" হইবে, তিনি (উপরি উক্ত বড় লোক) হেম বাবুকে "রিসিভ" করিতে বড় "হ্যাপি" হইবেন। ঘর ঘর শব্দে ব্রুহম বাহির হইয়া গেল, অশ্ব ক্ষুরোদ্গত কর্দ্দম হেমচন্দ্রের বস্ত্রে দুই এক ফোঁটা লাগিল, হেমবাবু সেই অমৃত হাস্য ও অমৃত বচনে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া ধীরে ধীরে বাড়ী গেলেন।

ভবানীপুরের ভবের বাজার দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্র ক্রমে ক্রমে কলিকাতার বিস্তীর্ণতর ভবের বাজারও কিছু কিছু দেখিতে পাইলেন। বাল্যকালে তিনি মনে করিতেন কলিকাতার বড় বাজারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জনাকীর্ণ, কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাইলেন বড় বাজার হইতেও বড় একটী কলিকাতার বাজার আছে, তাহাতে রাশি রাশি মাল গুদমজাৎ আছে, সেই অপূর্ব্ব মাল ক্রয় করিবার জন্য আলোকের দিকে পতঙ্গের ন্যায় বিশ্বসংসার সেই দিকে ধাবিত হইতেছে। বাল্যকালে তিনি শিশুশিক্ষায় পড়িয়াছিলেন যে, গুণ থাকিলে বা বিদ্যা থাকিলেই সম্মান হয়, সে বাল্যোচিত ভ্রম তাঁহার শীঘ্রই তিরোহিত হইল, তিনি এখন দেখিলেন সম্মানামৃত সেরকরা, মনকরা, বাজারে বিক্রয় হইতেছে. কেহ ভারি খানা দিয়া, কেহ সখের গার্ডেন পার্টী দিয়া, কেহ ধন দিয়া, কেহবা পরের ধনে হস্ত প্রসারণ করিয়া, সেই অমৃত ক্রয় করিতেছেন, ও বড় সুখে, নিমীলিতাক্ষে সেই সুধা সেবন করিতেছেন। সুন্দর সুশোভিত বৈঠকখানার ঝাড় লণ্ঠন হইতে সে অমৃতের স্বচ্ছবিন্দু ক্ষরিয়া পড়িতেছে, দর্পণ ও ছবি হইতে সে নির্ম্মল অমৃত প্রতিফলিত হইতেছে, সুবর্ণ বর্ণ সুধার সহিত সে অমৃত মিশ্রিত হইতেছে, নর্ত্তকীর সুললিত কণ্ঠস্বরে

সে অমৃত প্রস্রবণের ঝঙ্কার শব্দিত হইতেছে। মনুষ্য মক্ষিকাগণ ঝাঁকে ঝাঁকে সে অমৃতের দিকে ধাইতেছে! কখন কুকের বাড়ী হইতে ঘর্ঘর শব্দে সেই অমৃত নিসৃত হইতেছে; কখন অসলারের দোকান হইতে সে সুধা প্রতিফলিত হইতেছে, জগৎ তাহার কিরণে আলোকপূর্ণ হইতেছে! আর কখনও বা অবারিত বেগে কর্তৃপক্ষদিগের মহল হইতে সে অমৃতস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, যাবতীয় বড় লোকগণ, সমাজের সমাজপতিগণ, ভারি ভারি দেশের মহামান্যগণ পরম সুখে তাহাতে অবগাহন করিতেছেন, হাবুডুবু খাইতেছেন, আপনাদিগের জীবন সার্থক মনে করিতেছেন! আবার কখনও বা বিলাত হইতে "পেক্" করা, "হর্মেটিকেলীসীল" করা বাক্‌সে বাক্‌সে সে মাল আমদানি করা হইতেছে, দুই এক খানি ফাঁপা বা গিল্‌টী করা দ্রব্যের সহিত রাশি রাশি চাটুকারিতা বিমিশ্রিত করিয়া বিলাতি মহাজনের মন ভুলাইয়া দেশীয় বিজ্ঞগণ সে মাল আমদানি করিতেছেন! এ বাজারে সে মালের দর কত! "আদৎ বিলাতী সম্মানসূচক পত্র!" "আদৎ বিলাতী সম্মানসূচক পদবী!" এই গৌরব ধ্বনিতে বাজার গুলজার হইতেছে!

বিস্তীর্ণ বাজারের অন্য কোথাও "দেশহিতৈষিতা," "সমাজ সংস্কার," প্রভৃতি বিলাতি মাল বিলাতিদরে বিক্রয় হইতেছে, সে হাটে বড়ই গোলমাল, বড়ই লোকের ঠেলাঠেলি, বড়ই লোকের কোলাহল, তাহাতে কলিকাতার টাউনহল, কৌন্সিল হল, মিউনিসিপাল হল প্রভৃতি বড় বড় অট্টালিকা, বিদীর্ণ হইতেছে। হেমচন্দ্র দেখিলেন রাজমিস্তিরি অনবরত মেরামত করিয়াও সে-সব বাড়ী রাখিতে পারিতেছে না, দেয়াল ও ছাদ ফাটিয়া গিয়া সে কোলাহল গগনে উত্থিত হইতেছে, সমস্ত ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আবার সে হাটের ঠিক সম্মুখে অন্যরূপ মাল বিক্রয় হইতেছে, বিক্রেতাগণ বড় বড় জয় ঢাক বাজাইয়া চিৎকার করিতেছে "আমাদের এ খাঁটী দেশী মাল, ইহার নাম "সমাজ সংরক্ষণ," হইতে বিলাতি মালের ভেজাল নাই, সকলে একবার চাকিয়া দেখ।" হেমচন্দ্র একটু চাকিয়া দেখিলেন, দেখিলেন মালটা ষোল আনা বিলাতি, বিলাতি পাত্রে বিক্রিত, বিলাতি মালমসলায় প্রস্তুত, কেবল একটু দেশী ঘিয়ে ভেজে নেওয়া মাত্র। হেমচন্দ্র দরিদ্র হইলেও লোকটা একটু সৌখিন, তাঁহার বোধ হইল ঘিটাও ভাল

খাঁটি দেশী ঘি নহে। ঈষৎ পচা, ও দুর্গন্ধ! সেই ঘিয়ে ভাজা গরম গরম এই "প্রকৃত দেশী" মাল বিক্রয় হইতেছে। রাশি রাশি খরিদ্দার সেই হাটের দিকে ধাইতেছে। সের দরে, মণ দরে, হাঁড়ি করিয়া, জালায় করিয়া সেই মাল বিক্রিত হইতেছে। মুটেরা রাশি রাশি মাল বহিয়া উঠিতেপারিতেছে না, তাহার সৌরভে সহর আমোদিত হইতেছে!

তাহার পর পাণ্ডিত্যের বাজার, বিজ্ঞতার বাজার, পাণ্ডিত্যের বাজার, —হেমচন্দ্র কত দেখিবেন? সে সামান্য পাণ্ডিত্য নহে, অসাধারণ পাণ্ডিত্য; এক শাস্ত্রে নহে, সর্ব্ব শাস্ত্রে; এক ভাষায় নহে, সকল ভাষায়, এক বিষয়ে নহে, সকল বিষয়ে; কম বেশি নহে, সকল বিষয়েই সমান সমান; অল্প পরিমাণে নহে, সের দরে, মণ দরে, জালায় জালায় পাণ্ডিত্য বিকাশিত রহিয়াছে। সে গাঢ় পাণ্ডিত্যের ভারে দুই একটী জালা ফাসিয়া গেল, পথ ঘাট পাণ্ডিত্যের লহরীতে কর্দ্দমময় হইল, পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকার দল ঝাঁকে ঝাঁকে আসিল, হেমচন্দ্র আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, সেই পাণ্ডিত্যের উৎস হইতে নাকে কাপড় দিয়া ছুটিয়া পালাইলেন।

তাহার পর ধর্ম্মের বাজার, যশের বাজার, পরোপকারিতার বাজার, হেমচন্দ্র দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইলেন! কলিকাতার কি মাহাত্ম্য,—এমন জিনিসই নাই যাহা খরিদ বিক্রয় হয় না। যাহাতে দুই পয়সা লাভ আছে তাহারই একখানা দোকান খোলা হইয়াছে, মাল গুদমজাত হইয়াছে, মালের গুণাগুণ যাহাই হউক, একখানি জমকাল "সাইন বোর্ড" সম্মুখে দর্শকদিগের নয়ন ঝলসিত করিতেছে! বাল্যকালে তিনি বড় বাজারের বণিকদিগকে চতুর মনে করিতেন, কিন্তু অদ্য এ বাজারের চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, চতুরতায় জিনিসের কাটতি, চতুরতায় বিশেষ মুনফা, চতুরতায় জগৎ সংসার ধাঁদা লাগিয়া রহিয়াছে!

কলিকাতায় অনেক দিন থাকিতে থাকিতে হেমচন্দ্র সময়ে সময়ে অল্প পরিমাণে খাঁটি মালও দেখিতে পাইলেন। কখন কোন ক্ষুদ্র দোকানে বা অন্ধকার কুটীরে একটু খাঁটি দেশ হিতৈষিতা, একটু খাটি পরোপকারিতা, বা একটু খাঁটি পাণ্ডিত্য পাইলেন, কিন্তু সে মাল কে চায়, কে জিজ্ঞাসা করে? কলিকাতার গৌরবান্বিত বড় বাজারে সে মালের আমদানি

রকতানি বড় অল্প, সুসভ্য মহা সম্রান্ত ক্রেতাদিগের মধ্যে সে মালের আদর অতি অল্প।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ছেলে মুখে বুড়ো কথা।

আষাঢ় মাসে বর্ষাকাল আরম্ভ হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, হেমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ আকাশও মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। তিনি কলিকাতায় কোন কার্য্যের জন্য বিশেষ লালায়িত নহেন, কিছু না হয়, ছয়মাস পরে গ্রামে ফিরিয়া যাইবেন পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন; তথাপি যখন কলিকাতায় কর্ম্মের চেষ্টায় আসিয়াছেন তখন কর্ম্ম পাইবার জন্য যত্নের ত্রুটী করিলেন না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত কোনও উপায় করিতে পারেন নাই। তাঁহার চারিদিকে কলিকাতার অনন্ত লোক-স্রোত অনবরত প্রবাহিত হইতেছে এই অনন্ত জন-সমুদ্রের মধ্যে হেমচন্দ্র একাকী!

সন্ধ্যার সময় তিনি শ্রান্ত হইয়া বাটিতে ফিরিয়া আসিতেন। শান্ত সহিষ্ণু বিন্দু স্বামীর জন্য জলখাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, দুখানি আক্, দুটী পানফল, চারটী মুগের ডাল; এক গেলাস মিশ্রির পানা সযত্নে আনিয়া দিতেন, প্রফুল্ল চিত্তে মিষ্ট বাক্য দ্বারা হেমচন্দ্রের শ্রান্তি দূর করিতেন। পল্লিগ্রামেও যেরূপ ভবানীপুরেও সেইরূপ, স্বামী-সেবাই বিন্দুর একমাত্র ধর্ম্ম, ছেলে দুটীকে মানুষ করাই তাঁহার একমাত্র আনন্দ। সেই কার্য্যে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাকিতেন, সন্ধ্যার সময় শিশু দুইটীকে লইয়া ছাদে গিয়া বসিতেন, কখন কখন দেশের চিন্তা করিতেন, কখন কখন ছাদের প্রাচিরের গবাক্ষের ভিতর দিয়া পথের জনস্রোত দেখিতেন। তাঁহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ক্ষীণ, তাঁহার ম্লান মুখমণ্ডল পূর্ব্বাপেক্ষা একটু অধিক ম্লান।

প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় শরৎ হেমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। বিন্দু শয়ন ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া একটী মাদুর পাতিয়া দিতেন, সকলে সেই স্থানে উপবেশন করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিতেন। হেমচন্দ্র কলিকাতায় যাহা যাহা দেখিতেন তাহাই বলিতেন, শরৎ কলেজের কথা, পুস্তকের কথা, শিক্ষক বা ছাত্রদিগের কথা, কলিকাতার নানা গল্প নানা কথা, সংসারের সুখ দুঃখের কথা, জগতে ধন ও দারিদ্রের কথা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কহিতেন। তাঁহার নবীন বয়সের উৎসাহ, ধর্ম্মপরায়ণতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সেই কথায় দেদীপ্যমান হইত, জগতের প্রকৃত মহৎ লোকের উৎসাহ, মহত্ব ও অবিচলিত প্রতিজ্ঞার গল্প করিতে করিতে শরৎ চন্দ্রের শরীর কণ্টকিত হইত, জগতের প্রতারণা মিথ্যাচরণ বা অত্যাচারের কথা কহিতে কহিতে সেই যুবকের নয়নদ্বয় প্রজ্জ্বলিত হইত।

হেমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহের সহিত সেই উন্নতহৃদয় যুবকের কথা শুনিয়া অতিশয় তুষ্ট ও প্রীত হইতেন, বিন্দু বাল্য সুহৃদের হৃদয়ের এই সমস্ত উৎকৃষ্ট চিন্তা ও ভাব দেখিয়া পুলকিত হইতেন এবং মনে মনে শরতের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন; বালিকা সুধা নিদ্রা ভুলিযা যাইত, একাগ্রচিত্তে সেই যুবকের দীপ্ত মুখ মণ্ডলের দিকে চাহিয়া থাকিত ও তাহার অমৃত ভাষা শ্রবণ করিত। শরতের তেজঃপূর্ণ গল্পগুলি শুনিয়া বালিকার হৃদয় হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইত, শরতের দুঃখ কাঁহিনী শুনিয়া বালিকার চক্ষু জলে ছল্ ছল্ করিত।

হেমচন্দ্র কলিকাতায় যাহা যাহা দেখিতেন সে কথা সর্ব্বদাই সন্ধ্যার সময় গল্প করিতেন। একদিন কলিকাতার "বড় বাজারের" মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "শরৎ! দেশহিতৈষিতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি সদ্গুণগুলি মনুষ্য হৃদয়ের প্রধান গুণ তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সদ্গুণ গুলির নামে তোমাদের কলিকাতায় যে রাশি রাশি প্রতারণা কার্য্য হয় তাহাতে বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের পল্লিগ্রামে প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষিতা বিরল, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু স্বদেশহিতৈষিতার আড়ম্বরও বিরল!"

শরৎ। "আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য, বড় বড় সহরেই বড় বড়

প্রতারণা, কিন্তু আপনি কি প্রকৃত সদ্গুণ কলিকাতায় পান নাই; প্রকৃত দেশ-হিতৈষিতা, সত্যাচরণ, বিদ্যানুরাগ, যশোলিপ্সা প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্গুণ মনুষ্য হৃদয়কে উন্নত করে, সে গুলি কি আপনি দেখেন নাই"?

হেম। শরৎ, তাহা আমি বলি নাই, বরং কলিকাতায় সেরূপ অনেক সদ্গুণ দেখিয়া আমি তৃপ্ত হইয়াছি। কলিকাতায় যে প্রকৃত দেশানুরাগ দেখিয়াছি, স্বদেশীয়দিগের হিত সাধন জন্য অনন্ত চেষ্টা, অনন্ত উদ্যম, জীবন ব্যাপী উৎসাহ দেখিলাম, এরূপ পল্লিগ্রামে কখনও দেখি নাই; পুস্তকে ভিন্ন অন্য স্থানে লক্ষিত করি নাই। বিদ্যানুরাগও সেইরূপ। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে আমি প্রকৃত বিদ্যানুরাগ কাহাকে বলে জানিতাম না, কেবল জ্ঞান আহরণের জন্য, স্বদেশবাসীদিগের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ জন্য, যৌবন হইতে মধ্য বয়স পর্য্যন্ত, মধ্য বয়স হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত অনন্ত অবারিত পরিশ্রম, তাহা কলিকাতায় দেখিলাম। আর প্রকৃত যশে অভিরুচি, জীবন পণ করিয়া সৎকার্য্যের দ্বারা মহত্ত্বলাভ করিতে দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ও অধ্যবসায়, ইহা পল্লিগ্রামে কোথায় দেখিব? ইহাও কলিকাতায় দেখিলাম। শরৎ আমি কলিকাতায় শত শত সদ্গুণ দেখিয়াছি। কিন্তু যেখানে একটী সদ্গুণ আছে, সেইখানে তাহার একশত প্রকার মিথ্যা অনুকরণ আছে,—যদি দশজন প্রকৃত দেশহিতৈষী থাকেন, সহস্রজন দেশহিতৈষিতার নাম লইয়া চিৎকার ও ভণ্ডামি করিতেছেন, দশজন প্রকৃত সমাজ সংরক্ষণে যত্নশীল, শতজন সেই সদ্গুণের নামে শতপ্রকার প্রতারণার দ্বারা পয়সা রোজগার করিতেছে। এইটী প্রকৃত দোষের কথা।"

শরৎ। "সে দোষ তাহাদের না আমাদের? বিন্দুদিদি, তোমার এ মাদুরে ছারপোকা আছে?"

বিন্দু। "সে কি শরৎবাবু কামড়াচ্চে নাকি?"

শরৎ। "না কামড়ায় নি, জিজ্ঞাসা করিতেছি আছে কি না।"

বিন্দু। "না শরৎবাবু আমার বাড়ীতে অমন জিনিসটী নেই। আমি নিজের হাতে প্রত্যহ বিছানা মাদুর রোদে দি, জিনিস পত্র ঝাড়ঝোড় করি। নোংরা আমি দু চক্ষে দেখ্‌তে পারিনি।"

শরৎ। "সে দিন হেমবাবু আর আমি দেবীপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে

গিয়াছিলুম, বাড়ীর ভিতর আমাদের খেতে নিয়ে গিয়াছিল, তা তাদের মাদুরে এমন ছারপোকা যে বসা যায় না। তার কারণ কি বিন্দুদিদি?"

বিন্দ। "কারণ আর কি, নোংরা, অপরিষ্কার। জিনিস পত্র নোংরা রাখিলেই ঐগুলো জন্মে।"

শরৎ। 'বিন্দুদিদি, আমরাও সেইরূপ সমাজ অপরিষ্কার রাখিলেই তাহাতে প্রতারণার কীটগুলা জন্মায়। আমরা যদি পরনিন্দা ইচ্ছা করি, পরনিন্দা বাজারে বিক্রয় হইবে। আমরা যদি পাণ্ডিত্যাভিমানীর মূর্খতায় মুগ্ধ হইয়া হাঁ করিয়া থাকি, সেই মূর্খতাই বিদ্যারূপে বিক্রয় হইবে। ওষ্ঠে বিদ্যমান দেশ-হিতৈষিতায় যদি আমরা পুলকিত হই, সেইরূপ দেশ হিতৈষিতার ছড়াছড়ি হইবে। চিনেবাজারে যেরূপ কাপড় যখন লোকের পছন্দ হয়, সেইরূপ কাপড়ের সেই সময়ে অধিক মূল্য হয়, অধিক আমদানি হয়। আমাদেরও যেরূপ সদ্গুণে পছন্দ ও রুচি সেইরূপ ভূরি ভূরি উৎপন্ন হইতেছে। এটী তাহাদের দোষ না আমাদের দোষ?"

বিন্দু। "আচ্ছা সে কথা বুঝিলাম। কিন্তু মাদুরে ছারপোকা হইলে মাদুর রোদে দিতে পারি, মসারি, বা বিছানায় কীট থাকিলে তাহা ধোপার বাড়ী দিতে পারি। সমাজে এরূপ কীট উৎপন্ন হইলে তাহার কি উপায়? সমাজ কি ধোপার বাড়ী পাঠান যায় না রোদে দেওয়া যায়?"

শরৎ। "বিন্দুদিদি, সমাজ পরিষ্কার করিবারও উপায় আছে। সূর্য্যের আলোকে যেরূপ মাদুরের ছারপোকাগুলো সুড় সুড় করিয়া বাহির হইয়া যায়, প্রকৃত শিক্ষার আলোকে সমাজের অনিষ্টকর সামগ্রিগুলি একে একে সমাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারে বিলীন হয় যদি শিক্ষায় সে ফল না ফলে তাহা হইলে সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নহে। ওষ্ঠস্থ দেশহিতৈষিতায় যদি আমরা মুগ্ধ না হই তবে সেরূপ দ্রব্য কত দিন উৎপন্ন হয়? পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খতা দেখিলে যদি আমরা সাহস্যে তথা হইতে প্রস্থান করি তবে সে অদ্ভুত সামগ্রী কত দিন বিরাজ করে? এ সমস্ত মেকি সামগ্রি যে এখন এত পরিমাণে উৎপন্ন হয় সে আমাদের শিক্ষার দোষে, তাহাদের দোষে নহে।"

হেম। "শরৎ তোমার এ কথাটী আমি স্বীকার করিতে পারি না।

শুনিয়াছি ইউরোপে শিক্ষার অনেক বিস্তার হইয়াছে, শুনিয়াছি তথায় যে পিতা পুত্র কন্যাকে পাঠশালায় প্রেরণ না করে তাহার আইন অনুসারে দণ্ড হয়। কিন্তু তথায় কি বাহ্যাড়ম্বর বা প্রতারণা অল্প?"

শরৎ। "হেমবাবু, আমাদের দেশ অপেক্ষা তথায় অনেক শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এখনও অনেক শ্রেণী, অনেক সম্প্রদায় প্রকৃত শিক্ষা পায় নাই, সুতরাং সামাজিক প্রতারণার এখনও প্রাদুর্ভাব আছে। তথাপি তথাকার শিক্ষিত সম্প্রদায় যে গুণে মুগ্ধ হয়েন, যে লোককে প্রকৃত সম্মান করেন, সেই গুণের উৎকর্ষ, সেই লোকের মাহাত্ম্য একবার আলোচনা করিয়া দেখুন। বিন্দুদিদি, আমি একটী গল্প বলি শুন।

ইংলণ্ডে একজন লোক ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার কাল হইয়াছে। যশই বিদ্যালাভের প্রধান উত্তেজক, কিন্তু এই মহামতির যশের প্রতি এরূপ অনাস্থা ছিল, কেবল বিদ্যালাভের জন্যই এতদূর অনুরাগ ছিল, যে তিনি প্রায় বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত প্রকৃতির জীবজন্তু ও বৃক্ষলতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যে বিস্ময়কর নিয়মগুলি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেগুলি মুদ্রিত করেন নাই, মুখ ফুটিয়া বলেন নাই। জগৎ তাঁহার নাম শুনে নাই, তাঁহার আবিষ্কার জানিত না। তখনও তিনি অনন্ত পরিশ্রম, অনন্ত উৎসাহের সহিত আরও অনুসন্ধান, আরও বিদ্যাহরণ করিতেছিলেন, যশস্বী হইবেন এ চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই! কথাটী শুনিলে কাল্পনিক বোধ হয়, উপন্যাসযোগ্য বোধ হয়; জগতে প্রকৃত এরূপ লোক আছে জানিলে দেবতা বলিয়া ভক্তির সহিত পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। আমরা কি করি, এক ছত্র পদ্য, বা এক অধ্যায় উপন্যাস লিখিয়া যশস্বী হইবার জন্য ভেরী বাজাইতে আরম্ভ করি, অন্নের জন্য একটী দেশী কাপড়ের দোকান খুলিয়া ভারত উদ্ধার করিতেছি বলিয়া ঢাক বাজাই। এ কথাগুলি আমি কাহাকেও বলি না, অন্যে বলিলে আমার চক্ষে জল আসে, কিন্তু এ চিন্তায় আমার হৃদয় ব্যথিত হয়, নিষ্কাম কর্ত্তব্যসাধন আমাদের সমাজে কোথায় পাইব?"

বিন্দু। "তা সে পণ্ডিতের আবিষ্কার শেষে লোকে জানিল কিরূপে?"

শরৎ। "শুনিয়াছি তাঁহার কয়েকজন বন্ধু তাঁহার কার্য্য ও তাঁহার আবিষ্কার জানিতে পারিয়া সেগুলি মুদ্রিত করিবার জন্য অনেক জেদ করিলেন। তিনি অনেক প্রতিবাদ করিলেন, তাঁহার অনুসন্ধান শেষ হয় নাই, প্রকাশ করিবার যোগ্য হয় নাই, বলিয়া অনেক আপত্তি করিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহার বন্ধুগণের নিতান্ত অনুরোধে সেগুলি প্রকাশ করিলেন।"

বিন্দু। "তখন সকলে বোধ হয় তাঁহাকে খুব প্রশংসা করিতে লাগিল?"

শরৎ। "না দিদি, এক দিনে নহে। প্রথমে লোকে তাঁহাকে যেরূপ গালিবর্ষণ করিয়াছিল সেরূপ বোধ হয় শত বৎসরের মধ্যে কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু যে মনুষ্য কেবল বিদ্যালোচনায় জীবন পণ করেন তাঁহার পক্ষে গালিই পুষ্পাঞ্জলি! ক্রমে লোকে তাঁহার আবিষ্কারের মাহাত্ম্য দেখিতে পাইলেন, সম্প্রতি সেই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত মরিয়া গিয়াছেন,—অদ্য সভ্য জগৎ ডারউইনকে এ শতাব্দীর মধ্যে অদ্বিতীয় বিজ্ঞানাবিষ্কারী বলিয়া মানে।"

হেম। "কিন্তু ইউরোপে সকলেই কি ডারউইন?"

শরৎ। "বিদ্যায় ডারউইন অদ্বিতীয়, কিন্তু তাঁহার যে নিষ্কাম কর্ত্তব্য সাধনাভিলাষ ছিল, তাহা ইউরোপীয় সমাজে অনেকটা লক্ষিত হয়,—ইউরোপের উন্নতির তাহাই মূল কারণ। যে মহাধীশক্তিসম্পন্ন বিস্মার্ক এই বিংশ বৎসরের মধ্যে জর্ম্মান সাম্রাজ্য নিজ হস্তে গঠিলেন, যে অদ্বিতীয় দেশানুরাগী গারিবল্ডী অসি হস্তে ইতালী স্বাধীন করিয়া পর দেশের উপকারের জন্য আপনি রাজ্যলোভ ত্যাগ করিয়া সেই রাজ্য অন্যকে দিলেন, ইংলণ্ডে যাঁহারা বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিখ্যাত,—সকলের জীবনচরিত্রে আমি সেই নিষ্কাম কর্ত্তব্যসাধন অনেকটা দেখিতে পাই। সামান্য লোকেও এই শিক্ষাটী শিখিলেই দেশের উন্নতি হয়, যে দেশের মিস্ত্রিরা কর্ত্তব্যানুরোধে মনিব না থাকিলেও একটু ভাল করিয়া কাজ করে, মুটে মজুরদেরও শিক্ষাগুণে একটু কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মে, সেই দেশেরই ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হয়। বিন্দুদিদি, ইউরোপে জর্ম্মান ও ফরাসী বলিয়া দুইটী পরাক্রান্ত জাতি আছে, পঞ্চাশ, ষাট বৎসর পূর্ব্বে ফরাসীরা জর্ম্মানদিগকে বার বার যুদ্ধে হারাইয়া দিয়াছিল, সম্প্রতি জর্ম্মানগণ ফরাসী-

দিগকে বড় হারাইয়া দিয়াছে। উভয় জাতিই সমান সাহসী, কিন্তু আমি একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকে পড়িয়াছি যে জর্ম্মানদিগের বিজয়ের প্রধান কারণ এই যে তথাকার অতি সামান্য সৈন্যগণ ও আধুনিক শিক্ষাবলে কর্ত্তব্যসাধনে সমধিক রত, প্রত্যেক সামান্য সিপাহি কর্ত্তব্যানুরোধে নিজ নিজ স্থানে কলের ন্যায় নিজ নিজ কর্ম্ম করে। যুদ্ধে যেরূপ সমাজেও সেইরূপ, কর্ত্তব্যসাধনই জয়ের হেতু। উপন্যাসে দেখিতে পাই এই কর্ত্তব্যসাধনের একটী সুন্দর প্রাচীন ফরাসী নাম ' Devoir',' ইংরাজেরা উহাকে এক্ষণে "Duty" কহে, কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এই নিষ্কাম কর্ত্তব্যসাধনের যতদূর পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন সেরূপ আর কোনও দেশে লক্ষিত হয় নাই। সংসারে যদি আমরা সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনে এই ধর্ম্মটী অবলম্বন করিতে পারি, কেবল কর্ত্তব্যসাধনের জন্য যদি কার্য্য করিতে শিখি, নিজের বাঞ্ছা, নিজের অভিলাষ যদি একটু দমন করিয়া কর্ত্তব্যসাধনে হৃদয় স্থাপন করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদিগের উন্নতির পথ দিন দিন পরিষ্কার হইবে।"

হেম। "শরৎ, তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম, কিন্তু তথাপি শিক্ষাগুণে সমাজ হইতে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা একেবারে লোপ হইবে এরূপ আমার আশা নাই। শিক্ষিত দেশে যতদূর প্রতারণা আছে, আমাদের দেশে তত নাই, মনুষ্য-হৃদয়ে যতদিন সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি উভয়ই থাকিবে, জগতে তত দিন ধর্ম্মাচরণ ও প্রতারণা উভয়ই থাকিবে। তথাপি প্রকৃত শিক্ষাগুণে সমাজে কর্ত্তব্য-সাধন বাসনা ক্রমে বিস্তৃত হয় তাহা আমাদেরও বোধ হয়"।

বিন্দু। "তা আজ কাল তোমাদের কালেজে যে লেখাপড়া হয় তাহাতে কি এ শিক্ষা দেয় না?"

শরৎ। "বিন্দুদিদি, কলেজের শিক্ষাকে অনেকে অতিশয় নিন্দা করে, আমি তাহা করি না। যে শিক্ষায় আমরা মহৎ জাতিদিগের মহৎ লোক-দিগের জীবনচরিত ও কার্য্য-কলাপ অবগত হইতেছি, ও প্রকৃতির বিস্ময়কর নিয়মাবলী শিখিতেছি তাহা কি মন্দ শিক্ষা? যাঁহারা ইহা হইতে উপকার লাভ করিতে পারেন না,—সে তাঁহাদের হৃদয়ের দোষ, শিক্ষার দোষ নহে। হেমবাবু কলিকাতায় যে প্রকৃত দেশহিতৈষিতা প্রকৃত উন্নতি ইচ্ছার কথা

বলিলেন, তাহা পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল অদ্য তাহা হইতে অধিক লক্ষিত হয়, তাহা কেবল এই কলেজের শিক্ষাগুণে। আবার এই শিক্ষাগুণে এই সদ্গুণগুলি পঞ্চাশৎ বৎসর পর আরও অধিক লক্ষিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বহু শতাব্দিতেও আমরা বোধ হয় ইউরোপীয়জাতিদিগের ঠিক সমকক্ষ হইতে পারিব কি না সন্দেহ; কিন্তু তথাপি আমার ভরসা যে জগদীশ্বরের কৃপায় দিন দিন আমরা অগ্রসর হইতেছি। আত্মবিসর্জ্জন ও কর্ত্তব্যসাধনে অনন্ত উৎসাহ, চেষ্টা, ও অধ্যবসায়ই এই উন্নতির একমাত্র পথ, সেই আত্মবিসর্জ্জন, সেই নিষ্কাম কর্ত্তব্যসাধন আমরা এখনও কতটুকু শিখিয়াছি, চিন্তা করিলে হৃদয় ব্যথিত হয়!"

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইয়া গেল, শরৎ যাইবার জন্য উঠিলেন। হেম তাঁহার সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত যাইলেন, দেখিলেন পথে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে এবং গ্রীষ্মকালের শীতল নৈশ বায়ু বহিয়া যাইতেছে। সুতরাং তিনি এক পা দুই পা করিয়া শরতের সঙ্গে অনেক দূর গেলেন। পথেও এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দেবীপ্রসন্ন বাবুও আজ সন্ধ্যার সময় হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছিলেন, তিনি শরৎ ও হেমকে দেখিয়া শরতের বাটী পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত গেলেন।

হেমচন্দ্র দেবীবাবুর সহিত ফিরিয়া আসিবার সময় বলিলেন "আমি কলেজের অনেক ছেলে দেখিয়াছি অনেকের সহিত কথা কহিয়াছি, কিন্তু শরতের ন্যায় প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়াছে, শরতের ন্যায় উন্নতহৃদয় উন্নতচিত্ত, আনন্দনীয় উদ্যম ও উৎসাহ আছে, এরূপ অল্পই দেখিয়াছি।"

দেবীবাবু বলিলেন, "হেঁ ছেলেটী ভাল, গুণবান বটে, বেঁচে থাকুক, বাপের নাম রাখবে। আর লেখাপড়াও শিখ্‌বে বটে, কিন্তু ছেলে মানুষ হয়ে বুড়োর মত কথা কয় কেন? ছোঁড়াটা শেষে ফাজিল না হয়ে যায় তাই ভাবি।"

কৃষ্ণচরিত্র।

ভীষ্ম কথা সমাপ্ত করিয়া, শিশুপালকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "যদি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।" অর্থাৎ "ভাল না লাগে, উঠিয়া যাও।"

পরে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কৃষ্ণ অর্চ্চিত হইলেন দেখিয়া, সুনীথনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি পূর্ব্বে সেনাপতি ছিলাম, সম্প্রতি যাদব ও পাণ্ডবকুলের সমূলোন্মূলন করিবার নিমিত্ত অদ্যই সমর-সাগরে অবগাহন করিব।' চেদিরাজ শিশুপাল, মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ সন্দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক, এবং কৃষ্ণের পূজা না হয়, তাহা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজারা নির্ব্বেদ প্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন, দেখিয়া কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, যে তাঁহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন।"

"রাজা যুধিষ্ঠির সাগরসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোষপ্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে পিতামহ! এই মহান্ রাজসমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, অনুমতি করুন।"

শিশুপাল বধের ইহাই যথার্থ কারণ; শিশুপালকে বধ না করিলে, তিনি রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতেন।

শিশুপাল আবার ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে কতকগুলা গালি গালাজ করিলেন। কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রচারের প্রথম খণ্ডের ৭৭ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এই সময়ে উক্ত হয়; কিন্তু এইস্থানে

পাঠক ঐ খণ্ডের ৪১৫।৪১৬ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণের বাল্যলীলায় অপ্রামাণিকতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও স্মরণ করুন। এই দুইটি কথা পরস্পর বিরোধী। কোন্ সিদ্ধান্তটি সত্য তাহা মীমাংসা করা কঠিন। পূর্ব্বে বাল্যলীলার কিম্বদন্তী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে ভ্রম থাকা অসম্ভব নহে, ইহা আমাদিগের বোধ হইয়াছে। দুইটি বিরোধী কথা যখন মহাভারতে পাওয়া যাইতেছে, তখন তাহার একটা প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব। যখন দুইটি কথার মধ্যে একটি অনৈসর্গিক ও অপ্রাকৃতিক ঘটনায় পূর্ণ, আর একটি স্বাভাবিক ও সম্ভব বৃত্তান্ত ঘটিত, তখন যেটি স্বাভাবিক ও সম্ভব বৃত্তান্ত ঘটিত সেইটিই বিশ্বাসযোগ্য। পাঠক যদি এ মীমাংসার যাথার্থ্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণের নন্দালয়ে বাস বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না। *

ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে এবারেও শিশুপাল বড় বেশী গালি দিলেন। "দুরাত্মা" "যাহাকে বালকেও ঘৃণা করে," "গোপাল," "দাস" ইত্যাদি। পরম যোগী শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার তাহাকে ক্ষমা করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণ যেমন বলের আদর্শ, ক্ষমার ও তেমনি আদর্শ। ভীষ্ম প্রথমে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে আক্রমণ করিবার জন্য উত্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া শিশুপালের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত অত্যন্ত অসম্ভব, অনৈসর্গিক ও অবিশ্বাসযোগ্য। সে কথা এই—

শিশুপালের জন্মকালে তাঁহার তিনটি চক্ষু ও চারিটি হাত হইয়াছিল, এবং তিনি গর্দ্দভের মত চীৎকার করিয়াছিলেন। এরূপ দুর্লক্ষণযুক্ত পুত্রকে তাঁহার পিতামাতা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিল। এমন সময়ে, দৈববাণী হইল। সে কালে যাহারা আষাঢ়ে গল্প প্রস্তুত করিতেন, দৈববাণীর সাহায্য ভিন্ন তাঁহারা গল্প জমাইতে পারিতেন না। দৈববাণী বলিল, "বেশ ছেলে, ফেলিয়া দিও না, ভাল করিয়া প্রতিপালন কর; যমেও ইহার কিছু

* তিরস্করণ কালে শিশুপাল কৃষ্ণকে কংসের অন্নে প্রতিপালিত বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন দেখা যায়। যদি তাই হয়, তবে কৃষ্ণ মথুরায় প্রতিপালিত, নন্দালয়ে নয়।

করিতে পারিবে না। তবে যিনি ইহাকে মারিবেন, তিনি জন্মিয়াছেন।” কাজেই বাপ মা জিজ্ঞাসা করিল, “বাছা দৈববাণী, কে মারিবে নামটা বলিয়া দাও না?” এখন দৈববাণী যদি এত কথাই বলিলেন, তবে কৃষ্ণের নামটা বলিয়া দিলেই গোল মিটিত। কিন্তু তা হইলে গল্পের plot-interest হয় না। অতএব তিনি কেবল বলিলেন, “যার কোলে দিলে ছেলের বেশী হাত দুইটা খসিয়া যাইবে, আর বেশী চোখটা মিলাইয়া যাইবে, সেই ইহাকে মারিবে।”

কাজে কাজেই শিশুপালের বাপ দেশের লোক ধরিয়া কোলে ছেলে দিতে লাগিলেন। কাহারও কোলে গেলে ছেলের বেশী হাত বা চোখ ঘুচিল না। কৃষ্ণকে শিশুপালের সমবয়স্ক বলিয়াই বোধ হয়, কেন না উভয়েই এক সময়ে রুক্মিণীকে বিবাহ করিবার উমেদার ছিলেন, এবং দৈববাণীর “জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন” কথাতেও ঐরূপ বুঝায়। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে চেদিদেশে গিয়া শিশুপালকে কোলে করিলেন। তখনই শিশুপালের দুইটা হাত খসিয়া গেল, আর একটা চোখ মিলাইয়া গেল।

শিশুপালের মা কৃষ্ণের পিসীমা। পিসী মা কৃষ্ণকে জবরদস্তী করিয়া ধরিলেন, “বাছা! আমার ছেলে মারিতে পারিবে না।” কৃষ্ণ স্বীকার করিলেন, শিশুপালের বধোচিত শত অপরাধ তিনি ক্ষমা করিবেন।

যাহা অনৈসর্গিক, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। বোধ করি পাঠকেরাও করেন না। কোন ইতিহাসে অনৈসর্গিক ব্যাপার পাইলে তাহা লেখকের বা তাঁহার পূর্ব্বগামীদিগের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। ক্ষমা গুণের মাহাত্ম্য বুঝে না, এবং কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য বুঝে না, এমন কোন কবি, কৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমাশীলতা বুঝিতে না পারিয়া, লোককে শিশুপালের প্রতি ক্ষমার কারণ বুঝাইবার জন্য এই অদ্ভুত উপন্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন। কানায় কানাকে বুঝায়, হাতী কুলোর মত। অসুর বধের জন্য যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ তিনি যে অসুরের অপরাধ পাইয়া ক্ষমা করিবেন, ইহা অসঙ্গত বটে। কৃষ্ণকে অসুর বধার্থ অবতীর্ণ মনে করিলে, এই ক্ষমাগুণও বুঝা যায় না, তাঁহার কোন গুণই বুঝা যায় না। কিন্তু তাঁহাকে আদর্শপুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ

ইহা ভাবিলে, তাঁহার সকল কার্য্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্র রূপ রত্ন ভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শপুরুষতত্ত্ব।

শিশুপালের গোটাকত কটূক্তি কৃষ্ণ সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই যে কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রশংসা করিতেছি, এমত নহে। শিশুপাল ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। কৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিলে সে, সময় পাইয়া, দ্বারকা দগ্ধ করিয়া পলাইয়াছিল। কদাচিৎ ভোজরাজ রৈবতক বিহারে গেলে সেই সময়ে আসিয়া শিশুপাল অনেক যাদবকে বিনষ্ট ও বদ্ধ করিয়াছিল। বসুদেবের অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করিয়াছিল। এটা তাৎকালিক ক্ষত্রিয়দিগের নিকট বড় গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য। এ সকলও কৃষ্ণ ক্ষমা করিয়াছিলেন। আর কেবল শিশুপালেরই যে তিনি বৈরাচরণ ক্ষমা করিয়াছিলেন এমত নহে। জরাসন্ধও তাঁহাকে বিশেষরূপে পীড়িত করিয়াছিল। স্বতঃ হৌক পরতঃ হৌক, কৃষ্ণ যে জরাসন্ধের নিপাতসাধনে সক্ষম, তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু যত দিন না জরাসন্ধ রাজমণ্ডলীকে আবদ্ধ করিয়া পশুপতির নিকট বলি দিতে প্রস্তুত হইল, ততদিন তিনি তাহার প্রতি কোন প্রকার বৈরাচরণ করিলেন না। এবং পাছে যুদ্ধ হইয়া লোক ক্ষয় হয় বলিয়া নিজে সরিয়া গিয়া রৈবতকে গড় বাঁধিয়া রহিলেন। সেইরূপ যতদিন শিশুপাল কেবল তাঁহারই শত্রুতা করিয়াছিল, ততদিন কৃষ্ণ তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করেন নাই। তার পর যখন সে পাণ্ডবের যজ্ঞের বিঘ্ন ও ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপনের বিঘ্ন করিতে উদ্যুক্ত হইল, কৃষ্ণ তখন তাহাকে বধ করিলেন। আদর্শ পুরুষের ক্ষমা, ক্ষমাপরায়ণতার আদর্শ, এজন্য কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিলে তিনি তাহার প্রতি কোন প্রকার বৈরসাধন করিতেন না, কিন্তু আদর্শপুরুষ দণ্ডপ্রণেতারও আদর্শ, এজন্য কেহ সমাজের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাকে দণ্ডিত করিতেন।

কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রসঙ্গ উঠিলে কর্ণ দুর্য্যোধন প্রতি তিনি যে ক্ষমা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সে উদ্যোগ পর্ব্বের কথা, এখন বলিবার নয়। কর্ণ দুর্য্যোধন যে অবস্থায় তাঁহাকে বন্ধন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, সে অবস্থায় আর কাহাকে কেহ বন্ধনের উদ্যোগ করিলে বোধ হয় যীশু ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই শত্রুকে মার্জ্জনা

করিতেন না। কৃষ্ণ তাহাদের ক্ষমা করিলেন, পরে বন্ধুভাবে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন করিলেন, এবং মহাভারতের যুদ্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ করিলেন না।

তারপর ভীষ্মে ও শিশুপালে আরও কিছু বকাবকি হইল। ভীষ্ম বলিলেন, "শিশুপাল কৃষ্ণের তেজেই তেজস্বী, তিনি এখনই শিশুপালের তেজোহরণ করিবেন।" শিশুপাল জ্বলিয়া উঠিয়া ভীষ্মকে অনেক গালাগালি দিয়া শেষে বলিল, "তোমার জীবন এই ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইঁহারা মনে করিলেই তোমার প্রাণ সংহার করিতে পারেন।" ভীষ্ম তখনকার ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা—তিনি বলিলেন, "আমি ইহাদিগকে তৃণতুল্য বোধ করি না।" শুনিয়া সমবেত রাজমণ্ডলী গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "এই ভীষ্মকে পশুবৎ বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর।" ভীষ্ম উত্তর করিলেন, "যা হয় কর, আমি এই তোমাদের মস্তকে পদার্পণ করিলাম।"

বুড়াকে জোরেও আঁটিবার যো নাই, বিচারেও আঁটিবার যো নাই। ভীষ্ম তখন রাজাগণকে মীমাংসার সহজ উপায়টা দেখাইয়া দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই;—"ভাল, কৃষ্ণের পূজা করিয়াছি বলিয়া তোমরা গোল করিতেছ; তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিতেছ না। গোলে কাজ কি, তিনি ত সম্মুখেই আছেন—একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ না? যাঁহার মরণ কণ্ডূতি থাকে, তিনি একবার কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া দেখুন না?"

শুনিয়া কি শিশুপাল চুপ করিয়া থাকিতে পারে? শিশুপাল কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিল, "আইস, সংগ্রাম কর, তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।"

এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথা কহিলেন। কিন্তু শিশুপালের সঙ্গে নহে। ক্ষত্রিয় হইয়া কৃষ্ণ যুদ্ধে আহুত হইয়াছেন, আর যুদ্ধে বিমুখ হইবার পথ রহিল না। এবং যুদ্ধেরও ধর্ম্মতঃ প্রয়োজন ছিল। তখন সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া শিশুপাল কৃত পূর্ব্বাপরাধ সকল একটি একটি করিয়া বিবৃত করিলেন। তার পর বলিলেন, "এত দিন ক্ষমা করিয়াছি। আজ ক্ষমা করিব না।"

এই কৃষ্ণোক্তি মধ্যে এমন কথা আছে, যে তিনি পিতৃস্বসার অনুরোধেই তাহার এত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া হয় ত পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, এ কথাটাও প্রক্ষিপ্ত? আমাদের উত্তর এই যে, ইহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। ইহাতে অনৈসর্গিকতা কিছুই নাই; বরং ইহা বিশেষরূপে স্বাভাবিকও সম্ভব। ছেলে দুরন্ত, কৃষ্ণদ্বেষী, কৃষ্ণও বলবান্, মনে করিলে শিশুপালকে মাছির মত টিপিয়া মারিতে পারেন, এমন অবস্থায় পিসী যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুরোধ করিবেন, ইহা খুব সম্ভব। ক্ষমাপরায়ণ কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজ গুণেই ক্ষমা করিলেও পিসীর অনুরোধ স্মরণ রাখিবেন, ইহাও খুব সম্ভব। আর পিতৃস্বস্পুত্রকে বধ করা আপাততঃ নিন্দনীয় কার্য্য, কৃষ্ণ পিসীর খাতির কিছুই করিলেন না, এ কথাটা উঠিতেও পারিত। সে কথার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়াও চাই। এ জন্য কৃষ্ণের এই উক্তি খুব সুসঙ্গত।

তার পরেই আবার একটা অনৈসর্গিক কাণ্ড উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ, শিশুপালের বধ জন্য আপনার চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র চক্র তাঁহার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কৃষ্ণ চক্রের দ্বারা শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

বোধ করি এ অনৈসর্গিক ব্যাপার কোন পাঠকেই ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। যিনি বলিবেন, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, ঈশ্বরে সকলেই সম্ভবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি চক্রের দ্বারা শিশুপালকে বধ করিতে হইবে, তবে সে জন্য কৃষ্ণের মনুষ্য শরীর ধারণের কি প্রয়োজন ছিল। চক্র ত চেতনাবিশিষ্ট জীবের ন্যায় আজ্ঞা মত যাতায়াত করিতে পারে দেখা যাইতেছে, তবে বৈকুণ্ঠ হইতেই বিষ্ণু তাহাকে শিশুপালের শিরশ্ছেদ জন্য পাঠাইতে পারেন নাই কেন? এ সকল কাজের জন্য মনুষ্য-শরীর গ্রহণের প্রয়োজন কি? ঈশ্বর কি আপনার নৈসর্গিক নিয়মে বা কেবল ইচ্ছা মাত্র একটা মনুষ্যের মৃত্যু ঘটাইতে পারেন না, যে তজ্জন্য তাঁহাকে মনুষ্য দেহ ধারণ করিতে হইবে? এবং মনুষ্য-দেহ ধারণ করিলেও কি তিনি এমনই হীনবল হইবেন, যে স্বীয় মানুষী শক্তিতে একটা মানুষের

সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, ঐশী শক্তির দ্বারা দৈব অস্ত্রকে স্মরণ করিয়া আনিতে হইবে? ঈশ্বর যদি এরূপ অল্পশক্তিমান্ হন, তবে মানুষের সঙ্গে তাঁহার তফাৎ বড় অল্প। আমরাও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করি না—কিন্তু আমাদের মতে কৃষ্ণ মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন। এই অনৈসর্গিক চক্রাস্ত্র স্মরণ বৃত্তান্ত যে অলীক ও প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণ যে মানুষ যুদ্ধেই শিশুপালকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। উদ্যোগ পর্ব্বে অর্জ্জুন শিশুপাল বধের ইতিহাস কহিতেছেন, যথা,

"পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞে, চেদিরাজ ও করূষক প্রভৃতি যে সমস্ত ভূপাল সর্ব্বপ্রকার উদ্যোগ বিশিষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক বীর পুরুষ সমভিব্যাহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চেদিরাজতনয় সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী, শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর, ও যুদ্ধে অজেয়। ভগবান্ কৃষ্ণ ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহারে পরাজয় করিয়া ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন। এবং করূষরাজ প্রমুখ নরেন্দ্র বর্গ যে শিশুপালের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সিংহস্বরূপ কৃষ্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া চেদিপতিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় পলায়ন করিলেন, তিনি তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের যশ ও মান বর্দ্ধন করিলেন।" ১২ অধ্যায়।

এখানে ত চক্রের কোন কথা দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই কৃষ্ণকে রথারূঢ় হইয়া রীতিমত মানুষিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এবং তিনি মানুষ যুদ্ধেই শিশুপাল ও তাহার অনুচর বর্গকে পরাভূত করিয়াছিলেন। যেখানে একগ্রন্থে একই ঘটনার দুই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই, একটি নৈসর্গিক, অপরটি অনৈসর্গিক, সেখানে অনৈসর্গিক বর্ণনাকে অগ্রাহ্য করিয়া নৈসর্গিককে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করাই বিধেয়। যিনি পুরাণেতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি যেন এই সোজা কথাটা স্মরণ রাখেন। নহিলে সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে।

শিশুপালবধের আমরা যে সমালোচনা করিলাম, তাহাতে উক্ত ঘটনার স্থূল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমরা এইরূপ দেখিতেছি। রাজসূয়ের মহাসভায় সকল ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। ইহাতে শিশুপাল প্রভৃতি

কতকগুলি ক্ষত্রিয় রুষ্ট হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধে উপস্থিত করে। কৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন এবং শিশুপালকে নিহত করেন। পরে যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপিত হয়।

আমরা দেখিয়াছি কৃষ্ণ যুদ্ধে সচরাচর বিদ্বেষবিশিষ্ট। তবে অর্জ্জুনাদি যুদ্ধক্ষম পাণ্ডবেরা থাকিতে, তিনি যজ্ঞঘ্নদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? রাজসূয়ে যে কার্য্যের ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, তাহা স্মরণ করিলেই পাঠক কথার উত্তর পাইবেন। যজ্ঞ রক্ষার ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে কাজের ভার যাহার উপর থাকে, তাহা তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম (Duty)। আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের সাধন জন্যই কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন।

বেদ।

যদ্ যদা চরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। ৩য় অধ্যায়। ২১ শ্লোক।

শ্রেষ্ঠ লোকেরা যেরূপ আচরণ করেন অন্যান্য লোকেরা তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে এবং এই শ্রেষ্ঠ লোকেরা যাহা প্রমাণ করেন অন্যান্য লোকে তাহারাই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে।'

সমাজের ভাব সকল কিরূপ পরিচালিত হইয়া থাকে ইহা বুঝিতে গেলেই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের সত্যতা বেশ বুঝা যায়। আমরা সাধারণ লোকে যে শ্রেষ্ঠ লোকের মনোভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকি তাহা কোন কোন সময় জ্ঞাতসারে হই এবং অনেক সময় অজ্ঞাত সারে সেই সেই ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকি।

ভারতের আর্য্যসমাজ এক কালে ঋষিগণকে মনুষ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিত এবং জ্ঞাত সারে এবং অজ্ঞাত সারে সেই সেই ঋষিগণের প্রমাণের অনুবর্ত্তী ছিল; কিন্তু এক্ষণে আমরা সেই ঋষিগণকে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য বলিয়া আর বুঝি না; হারবর্টস্পেন্সর্ ডারউইন, ম্যাক্সমূলর, টিণ্ডল ইঁহারাই আজকাল আমাদের কাছে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য তাই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাত-সারে তাঁহারা যাহা প্রমাণ করিতেছেন তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছি।

ঋষিগণ বেদকে মহাবাক্য বলিয়া বুঝিতেন, ভারতের প্রাচীন সমাজ ঋষিগণকে মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতেন, সেই জন্যই বেদ এতকাল ভারতে আদরণীয় হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু আজকাল ঋষিগণের মাহাত্ম্য আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না, আমাদের আধ্যাত্মিক ভাবের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঋষিচিত্তের উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা আর আমাদের নাই; এখন যাঁহাদের চিত্তের উৎকর্ষ আমরা ধারণা করিতে পারি তাঁহাদিগকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছি, ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যাহা বলেন তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু ঋষিগণের কথা মনে লাগে না সেইজন্য এই সকল পণ্ডিতগণ বেদ সম্বন্ধে যাহা প্রমাণ করিতেছেন আমরাও তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছি।

আমরা হার্ব্বাট স্পেন্সর, ডারউইন, কোমৎ ম্যাক্সমূলর প্রভৃতির চিত্তের অবস্থাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া বুঝিতে পারি, কিন্তু ঋষিচিত্ত অবস্থা যে এইরূপ অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থা তাহা বুঝিতে পারি না। সেইজন্য ঋষিগণ বেদকে যে ভাবে দেখিতেন আমরা বেদকে সে ভাবে দেখিতে ভুলিয়া গিয়া, ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে ভাবে দেখেন আমরাও বেদকে সেইভাবে দেখিতে শিখিতেছি।

বেদ সত্যমূলক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান, বেদভিত্তি অবলম্বনেই হিন্দুধর্ম্ম গঠিত হইয়াছে—এইরূপ কথা চিরকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে; এই কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা যদি কেহ পক্ষপাতশূন্য হইয়া অনুসন্ধান করিতে চান তবে বেদপ্রণেতা ঋষিগণ এবং যে সকল ঋষিরা বেদভিত্তি অবলম্বনে হিন্দুধর্ম্ম গড়িয়াছেন তাঁহাদের চিত্ত কতদূর উন্নত ছিল তাহার

আলোচনা প্রথম করা কর্ত্তব্য। কেননা যদি ঋষিদিগের কোন মাহাত্ম্য থাকে তবেই বেদের মাহাত্ম্য আছে। ঋষিদিগকে আধ্যাত্মিক রহস্যবিদ্ মহাত্মা বলিয়া জ্ঞান থাকিলে বেদের যেরূপ অর্থ বুঝিব; তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্যরূপ জ্ঞান থাকিলে সেরূপ অর্থ না বুঝাই সম্ভব।

মনে কর আজকালকার একজন ভক্ত শাক্ত যিনি বিজ্ঞানের কোন ধার ধারেন না, তিনি একটি কথা বলিলেন যে,—যে শক্তি জন্য বৃক্ষস্থ ফল ভূতলে পতিত হয় সেই শক্তি বশতই গ্রহাদি জ্যোতিষ্ক সকল আকাশপথে ঘুরিতেছে; ভক্ত শাক্তের এই কথাতে তিনি যে তাঁহার ইষ্টদেবের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন ইহাই বুঝিব, শক্তি অর্থে এখানে তাঁহার ইষ্টদেবতা এই অর্থই মনে আসিবে। কিন্তু ঐ কথাগুলিই আবার যদি নিউটনের কথা বলিয়া অর্থ করিতে যাই তবে ঐ বাক্যটি যে এক গভীর বৈজ্ঞানিক রহস্যের কথা এইরূপ অর্থই বুঝিব; নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (Gravitation) সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক রহস্য ঐ কয়টি কথায় লিখিত রাখিয়াছেন ইহাই বুঝিব। সেইরূপ বেদবাক্যের যথার্থ অর্থ বুঝিতে গেলে ঋষিরা কিরূপ চিত্তের লোক ছিলেন তাহা অনুসন্ধান করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে ঋষি-চিত্তের অবস্থা যে কতদূর উন্নত তাহা আমরা এক্ষণে অনুভব করিতেও সক্ষম নহি, ঋষিগণ যোগাবস্থায়, চিত্তে প্রতিবিম্বিত সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিতেন সেই সকল সত্য বিষয়ক তথ্য আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ ধারণা করিতেও অসমর্থ। আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ যে বুদ্ধির আলোকের সাহায্যে বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া থাকেন আর প্রাচীন ঋষিগণ যে বুদ্ধির আলোকের সাহায্যে জগৎতত্ত্ব এবং পুরুষতত্ত্ব আলোচনা করিতেন, দীপের আলোকের সহিত সূর্য্যের আলোকের যত প্রভেদ ইহাদের ভিতরও সেইরূপ প্রভেদ।

চিত্ত যত নির্ম্মল হইবে এবং উহাদের একাগ্রতা যত বেশী হইবে মনুষ্যের জ্ঞানও সেই পরিমাণে সূক্ষ্ম হইতে থাকে। একথা সকলেই স্বীকার করেন কিন্তু আজকালকার পণ্ডিতগণ চিত্তের যে অবস্থার উপর দাঁড়াইয়া

সত্য অনুসন্ধান করিতেছেন পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্রমতে উহা চিত্তের নির্ম্মল অবস্থা নহে। সম্পূর্ণ সমলচিত্ত ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল করিবার জন্য যত্ন ও অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত প্রথমেই যে অবস্থায় উপনীত হয় সেই সবিতর্ক যোগাবস্থা * পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের চিত্তের অবস্থা। এই সবিতর্ক অবস্থা অপেক্ষা ঋষিচিত্তের পূর্ণ নির্ম্মলাবস্থা যে কতদূর উন্নত তাহা যিনি বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্র সম্যক আলোচনা করুন। বেদ যে মহাত্মা ঋষিগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম অবস্থার ফল তাহা বুঝিতে পারিবেন।

অনেকে বলিতে পারেন যে যাহারা অগ্নি সূর্য্য ইত্যাদি পদার্থের আরাধনা করিত তাহারা যে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ সীমায় উঠিয়াছিল একথা কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে; আমরা যাহাকে অগ্নি বা যাহাকে বায়ু বা যাহাকে সূর্য্য বলি সেই অগ্নি, সেই বায়ু, এবং সেই সূর্য্য যে বেদের দেবতা তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; আমরা আজকাল দেখিতে পাই যে, অসভ্যেরা অগ্নি আদির ভয় ভীত, তাহারাই অগ্নি আদির উপাসক; কিন্তু যাহারা সভ্যতার সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন তাঁহারা আর কেহই অগ্নি বা বায়ু বা কোন জড়ের উপাসক নহেন; প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ যে অগ্নির উপাসনা করিতেন অগ্নিভীতিই তাহার কারণ ইহাতে সন্দেহ নাই, কেননা অন্য কোন কারণ ত দেখা যায় না—ইত্যাদি।

কিন্তু অগ্নি সূর্য্যাদি সম্বন্ধীয় মন্ত্র সকলের প্রকৃত অর্থ যোগশাস্ত্রের সাহায্য বিনা কখনই সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে না। এবং যোগশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিলেই বৈদিক ঋষিগণের অগ্নি উপাসনা বা সূর্য্যোপাসনার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারা যায়। বৈদিক ঋষিগণ ভয়ে বা উল্লাসে অগ্নি আদির স্তব করিতেন না তাঁহারা কেন যে অগ্নি বায়ুর উপাসনা করিতেন, পাতঞ্জল শাস্ত্র হইতে তাহার কারণ পাওয়া যায়।

---

* শব্দার্থ জ্ঞান বিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা॥ সমাধিপাদ ৪২ সূত্র। বাক্যের সাহায্য ভিন্ন চিন্তা করা যায় কি না এই সম্বন্ধে ইউরোপে এখনও মতভেদ আছে। কিন্তু যোগীরা ইহা বুঝিতেন যে নির্বিতর্ক অবস্থাগ্রস্ত চিত্ত বাক্যের সাহায্য ব্যতীত চিন্তা করিতে সক্ষম। এইরূপ অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা।

পাতঞ্জলি বলেন যে সত্য অনুসন্ধান করিবার জন্য চিত্ত নির্ম্মল করা প্রয়োজন।

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহিতৃ গ্রহণ গ্রাহ্যেষু
তৎস্থ তদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ। সমাধিপাদ ৪১।

চিত্তের পূর্ব্ব সংস্কার সকল ক্ষীণ হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইলে, নির্ম্মল মণিতে কোন দ্রব্য যেমন যথাবৎ প্রতিবিম্বিত হয়, সেই নির্ম্মল চিত্তের গ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধেও সেইরূপ হইয়া থাকে। গ্রহিতা তৎস্থ গ্রহণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলে তন্ময়ত্ব এবং গ্রাহ্যে সমাপত্তি উপস্থিত হয়। অর্থাৎ চিত্ত নির্ম্মল হইলে পর যে বিষয় অবলম্বনে চিন্তা করুক না তাহাতেই তাহার একাগ্রতা জন্মে, ইন্দ্রিয় সকল তন্ময় হয় এবং সেই বিষয় সম্বন্ধীয় প্রকৃত সত্য যথাবৎ প্রতীয়মান হয়।

মনে কর সূর্য্য সম্বন্ধীয় সত্য একজন অনুসন্ধান করিতে চান, কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত সাধারণ লোকের চিত্তের ন্যায় সমল, সূর্য্য সম্বন্ধীয় প্রকৃত সত্য বিষয়ক প্রত্যয় তাঁহার চিত্তে যথাবৎ প্রতিফলিত হইবে না, কিন্তু যোগীর নির্ম্মল চিত্তে সেই সত্য বিষয়ক প্রত্যয় যথাবৎ জন্মিয়া থাকে। বেদে বাহ্যজগতীয় পদার্থ সকল যোগীর নির্ম্মল চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া যেরূপ প্রত্যয় জন্মায়, তাহারই বাচকমাত্র।

এই মন্ত্র সকলই বেদের দেবতা; বৈদিক দেবতার আরাধনা আর বেদ মন্ত্রের আরাধনা এই দুইটিই এক কথা। চিত্ত নির্ম্মল করিবার জন্য যোগ শাস্ত্রে যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহা হইতে এই দেখা যায় যে সাধকের পক্ষে প্রথমতঃ বাহ্য স্থূল পদার্থে চিত্ত সংযম করিতে শিখিয়া ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মবিষয় অবলম্বনে চিত্ত সংযম করিতে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। বেদের অগ্নির আরাধনা অর্থ অগ্নি সম্বন্ধে চিত্ত সংযম করা, সূর্য্য আরাধনার অর্থ সূর্য্য সম্বন্ধে চিত্তসংযম করা। যাঁহারা চিত্ত সংযম করিতে শিখেন নাই তাঁহারা বেদের প্রকৃত অর্থ কখনও বুঝিতে পারিবেন না। চিত্ত সংযম কথাটির অর্থ পরিষ্কার করা চাই।

দেশবন্ধ চিত্তস্য ধারণা ॥ যোগশাস্ত্র বিভূতিপাদ ১
তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং ॥২
তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥৩
ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥৪

কোন বিশেষ অবলম্বনে চিত্ত বদ্ধ হইলে চিত্তের সেই অবস্থার নাম ধারণা।১

অর্থাৎ চিন্তাকালে যে বিষয় লইয়া চিন্তা করিতেছি সেই বিষয়ক প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কোন ভাব চিত্তে যখন আসিতে পায় না চিত্তের সেই অবস্থার নাম ধারণা।

তাহার পর ধারণা কালীন প্রত্যয় সকলের একতানতা বুঝিবার ক্ষমতা যখন জন্মে সেই অবস্থার নাম ধ্যান।২

এই ধ্যান এবং ধারণার সময় বাক্য আদির সাহায্যে, দ্রব্যের রূপরসাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণ সকল আশ্রয় করিয়া চিন্তাস্রোত চলিতে থাকে কিন্তু সমাধি অবস্থায় চিত্তের অবস্থা ভিন্নরূপ।

ধ্যেয় বিষয় স্বরূপ শূন্যাবস্থায় যখন কেবল অর্থমাত্র রূপে চিত্তে প্রকাশ পায় চিত্তের সেই অবস্থার নাম সমাধি অবস্থা।৪

স্বরূপশূন্যাবস্থা এবং অর্থমাত্ররূপ এই কথা দুইটির অর্থ একটু পরিষ্কার করা চাই। ভৌতিক পদার্থ সকল আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইয়া যে রূপে প্রতীয়মান হয় তাহাই তাহাদের স্বরূপ কিন্তু পদার্থের অর্থমাত্ররূপ আমাদের চিত্তের বিষয়, ইন্দ্রিয় সকলের নহে। ইংরাজীতে যাহাকে concrete idea বলিতে পারা যায় তাহাই দ্রব্যের স্বরূপ এবং যাহাকে abstract idea বলিতে পারা যয় তাহাই দ্রব্যের অর্থমাত্ররূপ। চিত্ত যেরূপ উন্নতাবস্থা পাইলে ধ্যেয় বিষয় সম্বন্ধীয় abstract idea লইয়া চিন্তা করিবার ক্ষমতা জন্মে তাহাই সমাধি অবস্থা।

যে অবস্থায় ধারণা ধ্যান এবং সমাধির একত্র যোগ হয় তাহার নাম সংযম অবস্থা। সমাধি অবস্থায় দ্রব্যের অর্থ মাত্ররূপ বিষয়ক যে প্রত্যয় জন্মে তাহার সহিত ধ্যানাবস্থা এবং ধারণাবস্থার জ্ঞানের একতানতা এই সংযম অবস্থায় জন্মে।

ঋষিরা সূর্য্য বায়ু ইত্যাদি পদার্থে চিত্তসংযম করিয়া উক্ত পদার্থ সকলের অর্থমাত্ররূপ চিত্তে প্রতিবিম্বিত করিয়া তজ্জনিত চিত্তের প্রত্যয় সকল আলোচনা করিয়া যে সকল বাক্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহাই বেদবাক্য। আমরা যাহাকে অগ্নি বলি, বেদের অগ্নিদেবতার লক্ষ্য তাহাই বটে কিন্তু

প্রভেদ এই যে ঋষিদের সূর্য্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান একরূপ নহে। চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সূর্য্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া সূর্য্য বিষয়ে আমাদের প্রত্যয় যেরূপ ঋষিদের কাছে তাহা সত্যমূলক নহে। এইরূপ প্রত্যক্ষজনিত প্রত্যয় ঋষিদের কাছে চিত্তের মলাস্বরূপ; যোগী এই সকল মলা পরিষ্কার করিয়া তবে যোগাবস্থায় উপনীত হন, এবং তখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত কেবল অন্তরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পদার্থ বিষয়ক সত্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

বৈদিক ঋষিরা ধীশক্তিলাভের জন্য সূর্য্যারাধনা করিতেন; যোগশাস্ত্র আলোচনা ভিন্ন তাঁহাদের জড়ারাধনার প্রকৃত মর্ম্ম কেহই বুঝিতে পারিবেন না। পাতঞ্জলি বলেন যে সূর্য্য সম্বন্ধে চিত্তসংযম করিলে ভুবন জ্ঞান জন্মায়।

ভুবন জ্ঞানম্ সূর্য্যে সংযমাৎ।

এই কথাটি যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই গায়ত্রী মন্ত্রের "ধীযোয়োনঃ প্রচোদয়াৎ" কথাটির প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন; অন্যে উহাতে একটু কবিত্ব বই আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্মিন্ জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্মিন জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ॥

সর্ব্বভূতের পক্ষে যাহা রাত্রি সংযমীর কাছে তাহা দিবা; এবং সর্ব্বভূতে যাহাকে জাগ্রত্তাবস্থা বলে মুনিগণ তাহাকে রাত্রি স্বরূপ দেখেন।

সাধারণ লোকে যে জ্ঞান লইয়া জাগ্রত থাকেন সংযমীর কাছে তাহা ভ্রমজ্ঞান, সাধারণের কাছে যে সত্যজ্ঞান প্রকাশ পায় না সংযমীর নিকট সেই জ্ঞান প্রকাশ পায়। আর্য্যঋষিগণ যে জ্ঞান অবলম্বনে জাগরিত থাকিতেন পশ্চাত্যগণ সেইখানে অন্ধকার বই আর কিছুই দেখিতে পান না সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংযমী ঋষিগণকে যে চিনিতে পারেন নাই ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। চিত্তের সংযমাবস্থা কাহাকে বলে ইহা যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ধারণা করিতে পারিবেন তখনই তাঁহারা ঋষি বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন।

চিত্ত সংযম অভ্যাস দ্বারা মনুষ্য কতদূর উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন

জ্ঞান কতদূর সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত হয়, পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্র আলোচনার দ্বারা যিনি তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছেন ঋষি নামে আর তাঁহার অশ্রদ্ধা কখনই সম্ভবিবে না। ভারতে ঋষিগণই সকল সময়ে শ্রেষ্ঠ পুরুষ স্বরূপ মান্য পাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু ঋষি মহাত্মা আজকালকার লোকে ভুলিয়া যাইতেছে, কিন্তু সেই ঋষিদিগের আসনে আজকালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে বসাইলে ভারতের অবনতি ব্যতীত উন্নতির সম্ভাবনা দেখি না।

বেদমন্ত্র এবং মন্ত্রগত দেবতা সম্বন্ধে চিত্ত সংযম দ্বারা বেদের অর্থ বুঝিতে হয়। বেদের অগ্নি দেবতা বলিলে অগ্নি কথাটিতে যে অর্থ মাত্র রূপ (abstract idea) নিহিত আছে তাহাই অন্তরে ধারণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অগ্নি বিষয়ে চিত্ত সমাহিত লইলে অগ্নি যেমন স্বরূপ শূন্যাবস্থায় অর্থ মাত্ররূপ চিত্তে প্রকাশিত হইবে তখন অগ্নি সাক্ষাৎকার হইয়াছে জানিও, ইহার পূর্ব্বে বেদের অগ্নি কথায় কি ভাব নিহিত আছে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিবে না। সমাহিত অবস্থায় চিত্তপটে অগ্নির অর্থ যথাবৎ প্রতিবিম্বিত হইলে পর চিত্তের ধ্যান শক্তির সাহায্যে উহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিবে। অর্থাৎ সেই abstract ideaর সহিত কোন কোন concrete ideaর একতানতা আছে তাহাই বিচার করিবে, পরে সেই জ্ঞান বাক্যে প্রকাশিত হইতে পারে, কিরূপ ছন্দে অগ্নির পরিণাম ক্রম-চক্র শৃঙ্খলাবদ্ধ এই সকল আলোচনা করিতে শিখিলে তবে বেদ মন্ত্রের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বনের চেষ্টা দ্বারা বেদের মন্ত্রার্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে বেদের অগ্নি দেবতায় যে concrete idea বুঝায় তাহার লক্ষ্য যে কেবল মাত্র-কাঠের আগুণ, তাহা নহে। জঠরাগ্নি কামাগ্নি জ্ঞানাগ্নি ইহারাও বেদের অগ্নি কথাটির লক্ষ্য।

কর্ম্ম করিতে গেলেই অগ্নির সহায়তা প্রয়োজন বেদের কর্ম্মকাণ্ড হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায়। কর্ম্ম কথাটিতে শারীরিক মানসিক ইত্যাদি সকল প্রকার কর্ম্মই বুঝায়। এই কর্ম্ম কথাটির অর্থের সহিত অগ্নি কথাটির অর্থের একতানতা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে আমাদের শারীরিক তাপাগ্নি, মনের কামাগ্নি ইহারাও অগ্নি কথার লক্ষ্য। যে শক্তির সাহায্যে

কর্ম্ম করা যায় তাহারই নাম অগ্নি। আজকালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন "Heat is transformed into work" কিন্তু তাঁহারা এই Work কথাটিতে স্থূল পদার্থের গতি ভিন্ন অন্য অর্থযোজন করেন নাই; কিন্তু বেদে যখন অগ্নিকে কর্ম্মের মূল বলিয়া বুঝিতেন তখন কর্ম্ম কথাটিতে শারীরিক মানসিক সকল প্রকার কর্ম্মই বুঝিতেন। যে শক্তি কর্ম্মে পরিণত করা যায় তাহারই নাম অগ্নি। যে অগ্নি শক্তি সকলের গাড়ী চালায় তাহাও অগ্নি, যে শক্তি শারীরিক কর্ম্মে পরিণত হয় তাহা ও অগ্নি এবং যে শক্তি মানসিক চিন্তা আদি কর্ম্মে পরিণত হয় তাহাও অগ্নি। ইহাই বেদের অগ্নির অর্থমাত্রভাব (abstract idea)

বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে অগ্নি সম্বন্ধে যতগুলি মন্ত্র আছে তাহার এক একটি মন্ত্র, অগ্নি সম্বন্ধীয় এক একটি concrete ideaর অভিব্যঞ্জক; কিরূপ অগ্নি কোন মন্ত্রের লক্ষ্য তাহা যিনি বুঝিতে চান তিনি সেই মন্ত্রের বিনিয়োগ আলোচনা দ্বারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। বিনিয়োগ অর্থাৎ কিরূপ কর্ম্মে সেই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে সেই সমস্ত কথা বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে বর্ণিত আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ হইতে শিখিবার কিছুই পান নাই কিন্তু বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ বুঝিতে না পারিলে মন্ত্র ভাগও বুঝিতে কেহ সক্ষম হইবেন না।

বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন এবং তাহাই তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয়। বেদ মন্ত্র সকল ব্যাসদেব কর্ত্তৃক যেরূপ সাজান হইয়াছে, যেরূপ অধ্যায়, খণ্ড, প্রপাঠক এবং দশতি, ইত্যাদিতে বিভক্ত হইয়াছে তাহারও একটা কারণ আছে। কোন গ্রন্থ ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে সেই গ্রন্থে ক্রমে ক্রমে যে সকল কথা বলা আছে সেই সকলের মধ্যে কিরূপ ক্রমানুযায়ী সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বেদমন্ত্র সকলে একটির পর অন্যটি যেরূপ সাজান হইয়াছে সেইরূপ সাজানর প্রকৃত অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যোগ অবলম্বন ভিন্ন পাশ্চাত্যগণ যে, অর্থ কখনও বুঝিতে পারিবেন না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদ আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন; সে জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য বটে কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে ঋষিরা যেরূপ চিন্তাপ্রণালী অবলম্বনে জগংতত্ত্ব আলোচনা করিতেন সেই প্রণালী অবলম্বন ভিন্ন বেদের প্রকৃত অর্থ কেহই বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। মনে কর, আধুনিক পাশ্চাত্য গণিতবেত্তা পণ্ডিতগণ যখন এই কথা বলেন যে দুইটি বৃত্তের পরস্পর সঙ্গতিস্থল চারিটি বিন্দু,* তখন তাঁহাদের একেবারে পাগল না বলিয়া তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী অবলম্বনে প্রথমে তাঁহাদের কথার অর্থটি বুঝিতে যাওয়া কর্ত্তব্য। বাস্তবিক দুইটী বৃত্তের পরস্পর সঙ্গতিস্থল কখনই দুইটি বিন্দু অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না, অথচ কনিক সেক্সনের (Conic Section) চিন্তাপ্রণালী অবলম্বনে "দুইটি বৃত্ত চারিটি বিন্দুতে কাটিয়া থাকে" এ কথার যে একটা অর্থ আছে, ইহা বুঝিতে না পারিলে, কোন ক্রমেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

এই সমস্ত কারণে উপসংহারে বক্তব্য এই যে যিনি বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে ইচ্ছুক তিনি প্রথমে হিন্দু দর্শনশাস্ত্র সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে শিখুন; পাতঞ্জলি যাহাকে চিত্তসংযম বলিয়াছেন সেই চিত্তসংযম করিতে শিখুন, তবেই তিনি ঋষিবাক্য সমূহের প্রকৃত অর্থের আভাস পাইবেন।

হিন্দু।

একটি ঘরের কথা।

মুকুন্দ ঘোষ খুব বড় ঘরের ছেলে। বহুপূর্ব্বে তাহার পূর্ব্বপুরুষেরা খুব মান্য গন্য ধনাঢ্য ও প্রতাপশালী ছিল। কিন্তু ইদানীং পাঁচ সাত পুরুষ

---

* Two circles cut each other at four points, two of which are imaginary (Analytical Conic Section.)

বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তালুক মুলুক যাহা ছিল সব গিয়াছে। ক্রমে বাগ্‌বাগিচা নাখেরাজ জোত জমাও বিক্রয় হইয়াছে। ভদ্রাসন টুকুও কয়েক বৎসর নাই। মুকুন্দরা একখানি ছোট খড়ো ঘরে থাকে। সে ঘরের চালেও আবার খড় নাই। চালখানা স্থানে স্থানে শুকনা পাতা ঢাকা। মুকুন্দর মা ভাই বোন প্রভৃতি পাঁচ ছয়টি পরিবার। তাহাদের দুবেলা অন্ন জুটে না। প্রায়ই ভিক্ষার উপর নির্ভর। কাহারো পরিধানের রীতিমত বস্ত্র নাই, সকলেই ছেঁড়া নেকড়া কোন রকমে গুছাইয়া পরিয়া লজ্জা রক্ষা করে। ১০।১২ বৎসরের ভাই দুটো ত ন্যাংটোই বেড়াইয়া বেড়ায়। মাসে দুই চারি আনা পয়সা হইলে তাহারা গ্রামস্থ পাঠশালায় দুই অক্ষর শিখিতে পারে, তাহাও জুটে না, দিবারাত্রি হো হো করিয়াই বেড়ায়। মুকুন্দর এক বৎসরের একটি ছোট ভাই দুধ খেতে পায় না যৎসামান্য স্তনাপান করিয়া পেটের জ্বালায় দিবারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়াই কাটায়। এইত গেল মুকুন্দের ঘরের অবস্থা, কিন্তু মুকুন্দ কলিকাতায় উন্নতি-বিধায়িনী সভার সভ্য হইয়া কেবল বড় বড় বক্তৃতা করে।

ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বাঙ্গালি মেম্বর হওয়াও কি ঠিক্ সেইরূপ নয়? বাঙ্গালি জাতি অতি অধম, অতি দরিদ্র, অতি অসার। বঙ্গালির ঘরে অন্ন নাই। যা এক আধ মুঠা অন্ন আছে তাহা কেবল পরে অনুগ্রহ করিয়া লয় না বলিয়া আছে, নতুবা তাহাও থাকিবার কথা নয়। বাঙ্গালির পরিধানের বস্ত্র নাই। যতক্ষণ না পরে একখানি বস্ত্র আনিয়া দিবে ততক্ষণ লজ্জা রক্ষা হওয়া ভার। একদিন বাঙ্গালি সমস্ত জগতকে কাপড় পরাইয়াছে। আজ বাঙ্গালি এতটুকু সূতার জন্যও পরের মুখাপেক্ষী। বাঙ্গালির বিদ্যা নাই, বাঙ্গালি মূর্খ। বাঙ্গালির সাহিত্য সবে সুরু হইয়াছে। সে সাহিত্যের শক্তি নাই, বিস্তার নাই, প্রকৃত সারবত্তা নাই, প্রকৃত সৌন্দর্য্য নাই, তেজ নাই, প্রতাপ নাই, মহিমা নাই। বাঙ্গালির দেহ দুর্ব্বল, মনও দুর্ব্বল। বাঙ্গালির শৌর্য্য নাই, বীর্য্য নাই, সাহস নাই, শক্তি নাই, অধ্যবসায় নাই, উৎসাহ নাই, আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই। যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ হয় বাঙ্গালির তাহা নাই; যাহা থাকিলে জাতি জাতি হয়, বাঙ্গালি জাতির তাহা নাই। তবে কেন বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বসিতে চায়?

বাঙ্গালির যাহা নাই বলিয়া বাঙ্গালি মানুষ নয় ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বসিলে বাঙ্গালি কি তাহা পাইবে? বাঙ্গালির যাহা নাই বলিয়া বাঙ্গালি জাতি জাতি নয় বাঙ্গালি কি তাহা পাইবে? তবে কেন বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বসিতে চায়? গরিবের ছেলে মুকুন্দের উন্নতি বিধায়িনী সভার সভ্য হওয়াও যা বাঙ্গালির ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হওয়াও কি তাই নয়? ঘরে এত কাজ থাকিতে, আপনাকে মানুষ করিবার এত বাকি থাকিতে, আপনাদিগকে জাতি করিয়া তুলিবার এত বাকি থাকিতে, ব্রিটীশ পার্লে-মেণ্টের মেম্বর হওয়া কেন? মানুষকে মানুষ করিতে কত শক্তি, কত সামর্থ্য, কত পরিশ্রম, কত যত্ন, কত একাগ্রতা, কত স্থিরলক্ষ্য লাগে বল দেখি? এত শক্তি সামর্থ্য প্রভৃতি প্রয়োগ করিলেও মানুষকে মানুষ করিতে কত পুরুষ লাগে বল দেখি? আমাদের শক্তি সামর্থ্যের কি এতই বাহুল্য হইয়াছে যে আমাদের ঘরের কাজ করিয়াও বাহিরের কাজের জন্য এত উদ্বৃত্ত থাকে? তবে কেন ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হওয়া বল দেখি? ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইতেও কিছু শক্তির প্রয়োজন স্বীকার করি। কিন্তু যখন আমরা এখনও মানুষই হই নাই, জাতিই হই নাই, তখন যদি আমাদের কিছু শক্তি থাকে তবে সে শক্তিটুকু আপনাদিগকে মানুষ করিবার কাজে ব্যয় না করিয়া ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হওয়া প্রভৃতি মিছে কাজে ব্যয় করা কি বিজ্ঞের কাজ না দেশহিতৈষীর কাজ? আমরা মানুষ হই নাই, ইহা না বুঝিবার দরুনই আমরা ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইতে চাই। আমাদের ঘরের অবস্থা কি শোচনীয়, আমাদের মানুষ হইতে কতই বাকি, ইহাও আমরা বুঝি নাই—ইহা কি বিষম কথা! বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইতে যাওয়াতেই ত এই বিষম কথাটা এত বিকট ভাবে মনে উদয় হইল।

ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট ইংরাজ জাতির জাতিত্বের অভিব্যক্তি। যে সকল শক্তির গুণে ইংরাজ ইংরাজ, যে সকল শক্তি সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া সহস্র রকমে ইংরাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, আজিকার ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট সেই সমস্ত শক্তির অভিব্যক্তি বা অধিষ্ঠানস্থল। সে শক্তি বাঙ্গালিতে নাই, বাঙ্গালি সে শক্তিতে গঠিত হয় নাই। তবে ব্রিটিশ

পার্লেমেণ্টে বাঙ্গালির স্থান কোথায়? বাঙ্গালিতে যে প্রকার শক্তি এবং যে সামান্য একটু শক্তি আছে, তাহা ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টস্থিত শক্তির সহিত মিশ্ খাইবেই বা কেমন করিয়া, পারিয়া উঠিবেই বা কেমন করিয়া? কোরিন্থিয় প্রণালীতে নির্ম্মিত যে গৃহ, তাহাতে গথিক প্রণালীতে নির্ম্মিত যে স্তম্ভ তাহা কেমন করিয়া খাটিবে? ইংরাজের শক্তিতে ইংরাজের পার্লেমেণ্ট গঠিত। অতএব সে পার্লেমেণ্ট ইংরাজকেই বুঝে, ইংরাজের আশা এবং আকাঙ্ক্ষাই মিটাইতে পারে। ভারতকে সে পার্লেমেণ্ট বুঝে না, বুঝিতে পারেনা এবং পারিবে ও না। সে পার্লেমেণ্ট কেমন করিয়া ভারতের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা মিটাইবে? সেই জন্যইত ব্রাইট ফসেটের ন্যায় সে পার্লেমেণ্টের মহা প্রতাপশালী ইংরাজ সভ্যেরাও ভারতের জন্য কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না? তবে ক্ষুদ্র বাঙ্গালি সে পার্লেমেণ্টে গিয়া ভারতের জন্য কি করিবে? বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের ধাত্ বুঝেনা বলিয়া সে পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করিবার জন্য এত ব্যাকুল। সে ব্যাকুলতা বাঙ্গালির অসারতার প্রমাণ মাত্র!

বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে বসিয়া ভারতের কিছু কাজ করিতে পারুক আর নাই পারুক, ভারতের এবং সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালির মান বৃদ্ধি করিবে ও নাম উজ্জ্বল করিবে ইহা ও কি কথা? বাঙ্গালি বিজিত, ইংরাজ বিজেতা। বিজেতার পার্লেমেণ্টে বসিয়া বাঙ্গালি যদি এমন মনে করেন যে তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি হইল তবে ত তিনি তাঁহার বিজিত বা পরাধীন অবস্থাকেই শ্রেয় বা সম্মানসূচক অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাহা হইলে তিনি তাঁহার বিজেতার গোলামি করিয়াই বা সম্মানিত মনে করিবেন না কেন? বিজেতা ভাল হইলে তাঁহার অধীনে থাকায় লাভও আছে এবং কিছু সুখও আছে এবং সেই জন্য বিজেতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু বিজেতা যতই ভাল হউন, বিজিত অবস্থাকে সম্মানের অবস্থা মনে করিলে বিজিতেরা কখনই মানুষ হইতে পারিবে না, জাতি ও হইতে পারিবে না।

আর একটু ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে বাঙ্গালি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইলে বাঙ্গালির মান বৃদ্ধি হইবে না, ইংরাজেরই মান বৃদ্ধি হইবে। বাঙ্গালি যদি পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইতে

পারে তবে জর্ম্মাণ প্রভৃতি স্বাধীন এবং সুসভ্য জাতীয় লোকে তাঁহাকে প্রকৃত পক্ষে সম্মানার্হ বলিয়া মনে করিবে না বরং ঘৃণা করিবে এরূপ সম্ভব। আর পার্লেমেণ্টের মেম্বর হওয়া বিশেষ সম্মানের কথাই বা কিসে তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইতে গেলে যে বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন তাহাও বোধ হয় না। সামান্য একটু বুদ্ধি এবং একটু বাক্‌শক্তি থাকিলেই পার্লেমেণ্টে প্রতিপত্তি লাভ করা যায়। কিন্তু সেরূপ একটু ক্ষমতা থাকিলে মানুষ যে বিশেষ সম্মানার্হ হয় তা নয়। তবে বাঙ্গালি পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইলে যাহারা প্রকৃত মানুষ তাহাদের কাছে কিসে যে সম্মানার্হ হইবে বুঝিতে পারি না। ফলতঃ বাঙ্গালি পার্লেমেণ্টের মেম্বর হইলে বাঙ্গালির মান বাড়িবে না, ইংরাজেরই মান বাড়িবে। বিজিতকে আপনার সর্ব্বোচ্চ অসীম-মহিমা-মণ্ডিত স্বাধীন-শক্তি-সম্পন্ন শাসন সমিতিতে বসিতে দিলে প্রকৃত মানুষের কাছে ইংরাজেরই মান বাড়িবে, বাঙ্গালির মান বাড়িবে না। তবে সে সমিতিতে বসিবার জন্য বাঙ্গালি এত ব্যাকুল কেন? বাঙ্গালির দুর্বুদ্ধি কি ঘুচিবে না? বাঙ্গালির সুদিনের সূত্রপাত কি হইবে না?

শ্রীসঃ—

একটি পরের কথা।

পরের কথা কহিতে নাই। তবে পরকে লইয়া ঘর করিতে হইতেছে, তাই পরের কথা না কহিলেও চলে না। ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরাজ কেন যুদ্ধ করিলেন এ পর্য্যন্ত ভাল বুঝা গেল না। কেহ বলেন ব্রহ্মরাজ বড় অত্যাচারী ছিলেন বলিয়া যুদ্ধ হইল, কেহ বলেন ব্রহ্মরাজ্যের ধন রাশির জন্য যুদ্ধ হইল। কোন্‌টা ঠিক কথা তাহা এখন বলা যায় না এবং

বলা ও উচিত নয়। কোন্ কথাটা ঠিক যুক্তি ও অনুমানের দ্বারা তাহা এক রকম স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা আমরা বলিব না। ধনলোভ যদি যুদ্ধের প্রকৃত কারণ হয় ইংরাজ তাহা মানিবেন না। মানিলে বিশেষ হানি কিছু নাই, বরং কিছু লাভ আছে। ধনলোভে পরের রাজ্য লইলাম, এ কথাটা বড় লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই যদি ঠিক হয় তবে স্পষ্ট করিয়া সে কথাটা বলিলে ইংরাজের উপর বাস্তবিক তত অভক্তি হয় না। বরং সে কথাটা ছাপাইয়া, ব্রহ্মবাসীদিগের উপকার কি এমনি কোন একটা লম্বা চৌড়া কারণ নির্দ্দেশ করিলে ইংরাজের উপর বেশি অভক্তি হয়। কিন্তু ধনলোভ যুদ্ধের প্রকৃত কারণ হইলেও ইংরাজ তাহা মানিবেন না। ব্রহ্মরাজের অত্যাচারই যুদ্ধের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। ষ্টেট্সমান সংবাদপত্রের সুযোগ্য এবং সবলমতি সম্পাদক মহাশয় ও সেই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরাও সেই কারণটিকে প্রকৃত কারণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া দুই একটি কথা বলিব।

ব্রহ্মরাজ থিব যে অত্যাচারী ছিল তাহার প্রমাণ কই? তাহার অত্যাচার যদি প্রমাণীকৃত হয় তবে সে কি জন্য অত্যাচার করিয়াছিল তাহা ত বুঝিয়া দেখা চাই। অত্যাচার করিয়া থাকিলেই যে থিব রাজচ্যুত হইবে এমন ত কথা নাই। যাহাদিগকে থিব মারিয়া ফেলিয়াছিল তাহারা যদি থিবর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে, থিবকে এবং তাহার পরিবারকে মারিয়া ফেলিয়া তাহার সিংহাসন অধিকার করিবার অভিসন্ধি করিয়া থাকে, তবে তাহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকিলেও থিব ব্রাহ্মরাজ্যের রাজনীতি অনুসারে অন্যায় কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে। এবং যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে থিবকে রাজ্যচ্যুত করিবার বিশিষ্ট কারণও জন্মে নাই। এ রকম কথা ও ত লোকে বলিতে পারে। এ কথার উত্তর কি?

বিশিষ্ট কারণেই হউক অথবা বিনা কারণেই হউক থিব যদি লোক হত্যা করিয়া থাকে, ইংরাজের তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার কারণ কি? থিব আপনার রাজ্যে আপনার প্রজাকে মারিয়াছে, ইংরাজ তাহাতে কথা কহিবেন কেন? কাহাকে একটা অন্যায় কাজ করিতে দেখিলে পাঁচজনে তাহার বিরুদ্ধে অথবা তাহা নিবারণার্থ পাঁচ কথা কয় বটে; কিন্তু সে

যদি তাহাদের কথা না শুনে তবে তাহারা নাচার, তাহাদের আর কথা কহিবার অধিকার থাকে না। বিশেষ সে ব্যক্তি যদি স্বতন্ত্র সম্রাজ্য হয় তবে ত কাহারো কোন কথা চলে না। শ্যাম রামকে মারিতেছে। হরি শ্যামকে নিষেধ করিল। শ্যাম নিষেধ বাক্য শুনিল না। হরি শ্যামকে মারিবে না কি? শ্যামের অত্যাচার নিবারণের প্রকৃত উপায় রামের হাতে। রাম কেন শ্যামকে মারিয়া হউক কি অন্য যে প্রকারে হউক নিরস্ত করুক না। থিব স্বাধীন রাজা ছিল। সে অত্যাচার করিয়া থাকিলে ইংরাজ তাহাতে কথা কহিবেন কেন? সে অত্যাচার নিবারণের উপায় তাহার প্রজাদের হাতে ছিল। কিন্তু তাহারা ত কিছু করে নাই—আপনারা ও কিছু করে নাই এবং ইংরাজকে কি অপর কাহাকেও কিছু করিতে বলে নাই। তবে ইংরাজ কথা কন ই বা কেন, আর থিবকে মারেন ই বা কেন? যদিও ইংরাজ দয়াধিক্য বশতঃ কথা কন, তাঁহার কথা থিব না শুনিলে, থিবকে তিনি কোন্ স্বত্বে রাজ্যচ্যুত করেন? ষ্টেট্স্‌মান সম্পাদক মহাশয় একটা international police-এর কথা কহিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে, কোন রাজা যদি তাঁহার প্রজার উপর বেশী অত্যাচার করেন অথবা প্রজাকে মারিয়া ফেলেন, তবে অন্য রাজার তাঁহার সেই অত্যাচার নিবারণ করিবার অধিকার আছে, এবং সেই জন্য অন্য রাজা তাঁহার সহিত যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে পারে। এ নিয়মটা কোথাও সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে প্রচলিত আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইউরোপে কেবল তুর্কের সম্বন্ধে চলে, আর কাহারো সম্বন্ধে চলে না। এসিয়াতে এ নিয়ম কখনই চলে নাই, এবং চলিতে পারে এসিয়ার এখনও সে রকম অবস্থা হয় নাই। ইংরাজ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, ইংরাজ এ নিয়মের অর্থ বা উপকারিতা বুঝিতে পারে; ব্রহ্মদেশবাসী তেমন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান নয়, ব্রহ্মদেশবাসী এ নিয়মের অর্থ বা উপকারিতা বুঝিতে পারে না। অতএব international police-এর নিয়ম এসিয়াতে কেমন করিয়া খাটিতে পারে বুঝিতে পারি না। যে নিয়ম international হইবে, তাহা সকল জাতির বুঝিয়া স্বীকার করা চাই, নহিলে সে নিয়ম কেমন করিয়া *international* হইবে? আর একটা কথা এই। মনে কর এসিয়াতে international police-এর নিয়মটা

যুক্তিযুক্তরূপেই হউক আর অযৌক্তিকরূপেই হউক খাটান গেল। তার পর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। একজন বড় রাজার যদি একজন ছোট রাজার অত্যাচার বা অন্যায় নিবারণ করিবার অধিকার থাকে তবে একজন ছোট রাজারও একজন বড় রাজার অত্যাচার বা অন্যায় নিবারণ করিবার অধিকার থাকিবে। ক্ষুদ্র ব্রহ্মরাজের অত্যাচার বা অন্যায় বৃহৎ ইংরাজ-রাজ নিবারণ করিতে পারিবেন। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্রহ্মরাজ যদি বৃহৎ ইংরাজ-রাজের অত্যাচার বা অন্যায় নিবারণ করিতে চাহেন তাহাতে বৃহৎ ইংরাজরাজ কি কোন কথা কহিবেন না? এই যে ইংরাজরাজ্যে প্রতি-বৎসর ম্যালেরিয়া জ্বরে কত লোক মরিয়া যাইতেছে, ইংরাজরাজ তাহা নিবারণের বিশেষ কিছু উপায় করিতেছেন না। ইহাও ত একরকম প্রজা মারা বটে! এই সে বৎসর দুর্ভিক্ষে মান্দ্রাজে যে কত লোক মরিল; সেও ত ইংরাজরাজের দোষে এবং সেও ত এক রকম প্রজা মারা বটে। সে রকম মারা যে একেবারে গলা কাটিয়া মারিয়া ফেলার অপেক্ষা ভয়ানক মারা। কিন্তু ব্রহ্মরাজ কি অপর কোন ক্ষুদ্র রাজা যদি সেই জন্য ইংরাজকে কোন কথা বলিতেন বা ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেন তাহা হইলে ইংরাজ-রাজ কি বড় সন্তুষ্ট হইতেন, না তাহাকে ন্যায় যুদ্ধ বলিয়া আপনার শাসন-প্রণালী সংশোধন করিতেন? কখনই নয়। তবে কেন এই লম্বাচৌড়া international police-এর দোহাই দিয়া একটা অন্যায় যুদ্ধের পোষকতা কর? আরো এক কথা। বড় রাজা ক্ষুদ্র রাজাকে দমন করিতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র রাজা বড় রাজাকে দমন করিতে পারে না। তবে বড় রাজা এবং ক্ষুদ্র রাজার মধ্যে কেমন করিয়া international police এর নিয়ম খাটিতে পারে? যে নিয়ম সকলের প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা নাই, সে নিয়ম সকলের প্রতি কেমন করিয়া খাটিতে পারে বুঝিতে পারি না। ফল কথা, international police-এর কোন অর্থ নাই। ও কথাটা না তোলাই ভাল।

শেষ বলিবে যে অত্যাচার বা অন্যায় দেখিলে যাহার তাহা নিবারণ করিবার ক্ষমতা আছে তাহার তাহা নিবারণ করা কর্ত্তব্য। মানিলাম, তাহাই ঠিক। কিন্তু অত্যাচার, অন্যায় ও নৃশংসতা ত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে। প্রশান্ত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে ভয়ানক

মারামারি কাটাকাটি অত্যাচার অবিচার হইয়া থাকে, দয়ালু ইংরাজ ত সেখানে গিয়া অত্যাচার নিবারণ করিয়া সুশাসন স্থাপন করেন না। তাহা করিবার ত ইংরাজের ক্ষমতা আছে। তবে কি দয়া ধর্ম্মের কথাটাও মিথ্যা ?

এই সকল কারণে বাঙ্গালি ব্রহ্মযুদ্ধের বিরোধী। বাঙ্গালিকে বুঝাইয়া দেও যে ব্রহ্মযুদ্ধটা ন্যায় যুদ্ধ হইয়াছে, সে অবশ্যই ভুল স্বীকার করিবে।

শ্রীসঃ——

NEW YEARS DAY.

DRAMATIS PERSONAE.

রাম বাবু
শ্যাম বাবু
রাম বাবুর স্ত্রী (পাড়াগেঁয়ে মেয়ে)

রাম বাবু ও শ্যাম বাবুর প্রবেশ।

(রাম বাবুর স্ত্রী অন্তরালে)

শ্যাম বাবু। গুড্ মর্ণিং রাম বাবু—হা ডু ডু ?

রাম বাবু। গুড্ মর্ণিং শ্যাম বাবু—হা ডু ডু ?

[উভয়ে প্রগাঢ় করমর্দ্দন]

শ্যাম বাবু। I wish you a happy new year, and many many returns of the same.

রাম বাবু। The same to you.

[শ্যাম বাবুর তথাবিধ কথাবার্ত্তার জন্য অন্যত্র প্রস্থান। ও রাম বাবুর অন্তঃপুর প্রবেশ]

রাম বাবুর স্ত্রী। ও কে এসেছিল ?

রাম বাবু। ঐ ও বাড়ীর শ্যাম বাবু।

স্ত্রী। তা, তোমাদের হাতাহাতি হচ্ছিল কেন ?

রাম বাবু। সে কি ? হাতাহাতি কখন হ'লো ?

স্ত্রী। ঐ যে তুমি তার হাত ধ'রে ঝেঁক্‌রে দিলে, সে তোমার হাত ধ'রে ঝেঁক্‌রে দিলে ? তোমায় লাগেনি ত ?

রাম। তাই হাতাহাতি! কি পাপ! ওকে বলে Shaking hands ওটা আদরের চিহ্ন।

স্ত্রী। বটে! ভাগ্যে, আমি তোমার আদরের পরিবার নই! তা, তোমায় লাগেনি ত ?

রাম। একটু নোক্‌সা লেগেছে; তা কি ধরতে আছে ?

স্ত্রী। আহা তাইত! ছ'ড়ে গেছে যে ? অধঃপেতে ডাকরা মিন্‌সে! সকাল বেলা মরতে আমার বাড়ীতে হাত কাড়াকাড়ি করতে এয়েছেন! আবার নাকি ছুটোছুটি খেলা হবে ? অধঃপেতে মিন্‌সের সঙ্গে ও সব খেলা খেলিতে পাবে না।

রাম। সে কি ? খেলার কথা কখন হ'লো ?

স্ত্রী। ঐ যে সেও ব'ল্লে "হাঁডু ডু ডু !" তুমিও ব'ল্লে "হাঁডু ডু ডু !" তা, হাঁ ডু ডু ডু খেল্‌বার কি আর তোমাদের বয়স আছে ?

রাম। আঃ পাড়াগেঁয়ের হাতে প'ড়ে প্রাণটা গেল! ওগো, হাঁ ডু ডু ডু নয়; হা ডু ডু—অর্থাৎ How do ye do ? উচ্চারণ করিতে হয়, "হা ডু ডু !"

স্ত্রী। তার অর্থ কি ?

রাম। তার মানে, "তুমি কেমন আছ ?"

স্ত্রী। তা কেমন ক'রে হবে ? সে তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌লে "তুমি কেমন আছ," তুমি ত কৈ তার কোন উত্তর দিলে না,—তুমি সেই কথাই পালটিয়া বলিলে!

রাম। সেইটাই হইতেছে এখনকার সভ্য রীতি।

স্ত্রী। পাল্‌টে বলাই সভ্য রীতি? তুমি যদি আমার ছেলেকে বল, "লেখাপড়া করিস্‌নে কেনরে ছুঁচো?" সেও কি তোমাকে পালটে বল্‌বে, "লেখাপড়া করিসনে কেনরে ছুঁচো?" এইটা সভ্য রীতি?

রাম। তা নয় গো, তা নয়। কেমন আছ জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর না দিয়া পালটে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কেমন আছ। এইটা সভ্য রীতি।

স্ত্রী। (যোড়হাতে) আমার একটি ভিক্ষা আছে। তোমার ছুবেলা অসুখ—আমায় দিনে পাঁচবার তোমার কাছে খবর নিতে হয় তুমি কেমন আছ; আমায় যেন তখন হা ডু ডু বলিয়া তাড়াইয়া দিও না। আমার কাছে সভ্য নাই হইলে।

রাম। না, না, তাও কি হয়? তবে এ সব তোমার জেনে রাখা ভাল।

স্ত্রী। তা ব'লে দিলেই জান্‌তে পারি। বুঝিয়ে দাও না? আচ্ছা শ্যাম বাবু এলো আর কি কিচির মিচির ক'রে ব'লে আর চলে গেল; যদি হাঁডু ডু ডু খেলার কথা বল্‌তে আসেনি, তবে কি কর্‌তে এয়েছিল?

রাম। আজ নূতন বৎসরের প্রথম দিন, তাই সম্বৎসরের আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এয়েছিল।

স্ত্রী। আজ নূতন বৎসরের প্রথম দিন? আমার শ্বশুর শাশুড়ী ত ১ লা বৈশাখ থেকে নূতন বৎসর ধবিতেন।

রাম। আজ ১ লা জানুয়ারী—আমরা আজ থেকে নূতন বৎসর ধরি।

স্ত্রী। শ্বশুর ধরিতেন ১ লা বৈশাখ থেকে, তুমি ধর ১ লা জানুয়ারী থেকে, আমার ছেলে বোধ করি ধরিবে ১ লা শ্রাবণ থেকে?

রাম। তাও কি হয়? এ যে ইংরেজের মুলুক—এখন ইংরেজি নূতন বৎসরে আমাদের নূতন বৎসর ধরিতে হয়।

স্ত্রী। তা, ভালই ত। তা, নূতন বৎসর ব'লে এত গুলা মদের বোতল আনিয়েছ কেন?

রাম বাবু। সুখের দিন, বন্ধু বান্ধব নিয়ে ভাল ক'রে খেতে দেতে হয়।

স্ত্রী। তবু ভাল। আমি পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আমি মনে করিয়াছিলাম,

তোমাদের বৎসর কাবারে বুঝি এই রকম কলসী উৎসর্গ করতে হয়। ভাবছিলাম, বলি বারণ কর্‌ব, যে আমার শ্বশুর শাশুড়ীর উদ্দেশে ও সব দিও না।

রাম। তুমি বড় নির্ব্বোধ!

স্ত্রী। তা ত বটে। তাই আরও কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভয় পাই।

রাম। আবার কি জিজ্ঞাসা করিবে?

স্ত্রী। এত কপি সালগম গাজর বেদানা পেস্তা আঙ্গুর ভেটকি মাছ সব আনিয়েছ কেন? খেতে কি এত লাগবে?

রাম। না। ও সব সাহেবদের ডালি সাজিয়ে দিতে হবে।

স্ত্রী। ছি, ছি, এমন কর্ম্ম করো না। লোকে বড় কুকথা বল্‌বে।

রাম। কি কথা বলিবে?

স্ত্রী। বলবে এদের বৎসর কাবারে কলসী উৎসর্গও আছে, চোদ্দ পুরুষকে ভুজ্যি উৎসর্গ করাও আছে।

[ইতি প্রহার ভয়ে গৃহিণীর বেগে প্রস্থান। রামবাবুর উকীলের বাড়ী গমন এবং হিন্দুর Divorce হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।]